যাত্রা

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

নাটক

প্লাবন ৪র্থ সং। নাট্যভারতীতে অভিনীত। 'নাটকের সংবেদনশীলতা ও লিপি-চাতুর্য রসপিপাসুদের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে'—যুগান্তর। দেড় টাকা।

রাখিবন্ধন 'নূতন প্রভাত'-স্রষ্টার অগ্নিক্ষরা নবীন নাট্যসৃষ্টি। 'বিদেশী শাসকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দুর্বার জাতীয় প্রতিরোধের কণ্ঠরুদ্ধ করিবার জন্য দেশীয় তাঁবেদারদের সহায়তায় শাসকগোষ্টির বর্বর অত্যাচার এবং জাতির সন্তানদের নিঃশব্দ দুঃখবরণ ও মর্মচেরা আত্মদানের কাহিনীকেই মূলত উপজীব্য করিয়া এই নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। আন্দোলনের গতিপথে উদয়াচলে নব সূর্যোদয়ের যুগান্তকারী ঘটনাকেও এই নাটকে সুকৌশলে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাক্তন পদলেহীদের ভোল-পরিবর্তনের উপভোগ্য চিত্রটির অপরূপ বিন্যাস নাটকখানিকে আরও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সময়ের ব্যবধানে দুইখানি নাটককে একই নাটকে গ্রথিত করিবার যোগ্যতা অনস্বীকার্য। কুমুদ, সুশীল, আজিজ, উমা, প্রিয়নাথ, ভবদেব, যজ্ঞেশ্বর, টমসন প্রমুখ চেনা-মুখগুলি তাজা ফুলের হাসির মতই চোখের উপর ভাসিতে থাকে।' —যুগান্তর। দেড় টাকা।

বিপর্যয় রঙমহলে অভিনীত। 'কোন নাটকের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হইবার জন্য যে গুণ থাকা দরকার, আলোচ্য নাটকে তাহার সব কিছুই আছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে নাটকের গতি হইয়াছে দ্রুততর। ডায়ালোগ জোরালো ও স্বচ্ছন্দ-গতি। বিষয়বিন্যাসে বৈচিত্র্য আছে'—আনন্দবাজার। দুই টাকা।

নূতন প্রভাত ৪র্থ সং। 'এই প্রকার সমস্যা লইয়া ও এই ভাবের সত্যদিদৃক্ষা ও সাহসের সঙ্গে লেখা নাটক বাংলায় পড়ি নাই'—সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। 'মনোজ বাবু যে নূতনত্ব করেছেন, তা গতানুগতিক নাটকীয় প্রথা নয়'—অহীন্দ্র চৌধুরী। 'এই ধরণের নাটকেরই আমরা কতকাল ধরে প্রত্যাশা করছি'—নরেশ মিত্র। 'আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারি না—সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে'—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। দেড় টাকা।

উৎসর্গ

ছ'বছর বয়সে জীবনের প্রথম রচনা—

'প্রহ্লাদ আমার গুরু
এমন গুরু আর নয় কারু—'

সেকালে ডোঙাঘাটা-পাঠশালার গুরু

প্রহ্লাদচন্দ্র বসুর স্মৃতিতে
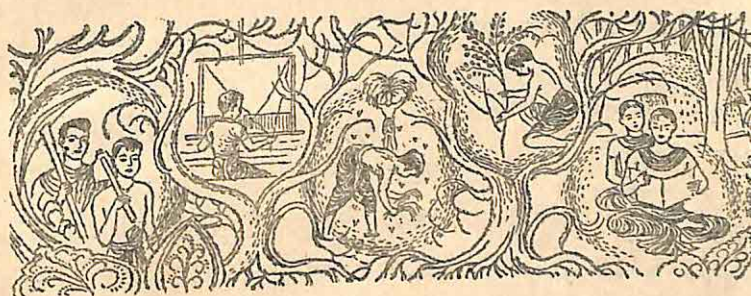
দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৯
প্রথম সংস্করণ—মাঘ, ১৩৫৭
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স,
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২
মুদ্রাকর—শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত
পূর্ব্বাশা লিমিটেড,
পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রারম্ভ-চিত্র—
কল্যাণ সেন
তিন টাকা

১

লক্ষ্মণ-যাত্রার দল।

সে আবার কি? খিল-খিল করে হেসে অমলা বলে, কেষ্ট-যাত্রা রাম-যাত্রার নাম শুনেছি, লক্ষ্মণ-যাত্রা কাকে বলে? রাম বাদ দিয়ে লক্ষ্মণের কথাই হবে নাকি শুধু?

প্রসন্ন পণ্ডিত ফোকলা মুখে হেসে বলেন, তাই—তাই বটে দিদিমণি! লক্ষ্মণেরই বৃত্তান্ত। দলের অধিকারী লক্ষ্মণ হাজরা। নিজের নামে দল বেঁধেছে।

দেউড়ির লাগোয়া পেট-কাটা দো-চালা ঘর। বিয়েথাওয়া ও নানা ক্রিয়াকর্মে সেকালে বেহারা-বাজনদার থাকত। যাত্রাওয়ালাদের এইখানে বাসা দিয়েছে।

এসে পৌঁছেছে প্রহর খানেকের সময়। দশ মিনিটের মধ্যে এমন জমিয়ে নিল, মনে হবে পুরুষ-পুরুষানুক্রমে এরা তাঁতিহাটে বসবাস করে। ডেরা ফেলে বেড়িয়ে বেড়িয়ে অভ্যস্ত হয়েছে এই রকম।

লক্ষ্মণ এখনো আসে নি। আগের রাত্রে দু-ক্রোশ দূরের এক গ্রামে গাওনা হয়েছে—টাকাকড়ি মিটিয়ে নিয়ে সাজের গাড়ির সঙ্গে সে আসছে। এসে পৌঁছতে দেরি হবে। ইতিমধ্যে সিধে এসে গেছে, রান্নাও চেপেছে। রান্না করে সীতানাথ চক্রবর্তী। দলে সে বেহালা বাজায়—জাতে ব্রাহ্মণ হওয়ায় অতিরিক্ত এই ভার পেয়েছে। মাহিনার উপর দু-টাকা ভাতা বরাদ্দ রান্নার কাজের জন্য। আরও এক বিশেষ লভ্য—লক্ষ্মণ প্রভৃতির সঙ্গে একত্র খাওয়ার ব্যবস্থা তারও।

ঘরের মধ্যে লোক গিজ-গিজ করছে—অনতিদূরে জামরুল-তলায় তাই উনুন খুঁড়ে নিয়েছে। শীতকালে বৃষ্টি-বাদলার ভয় নেই—রাঁধা-খাওয়ার হাঙ্গামা বাইরে চুকিয়ে ফেলা সুবিধা।

কাঁধের বোঁচকা-বিড়ে নামিয়েই ক-জনে গ্রাম-পরিভ্রমণে বেরিয়েছে। স্বভাবের শোভা দেখতে নয়—কলাটা-মূলোটা হাতড়ে আনা যায় যদি। এখন দিনের বেলা না-ই যদি সম্ভব হয়, নিরিখ করে আসবে—রাত্রে গান ভাঙবার পরে হানা দেবে সেই সব জায়গায়।

যারা বেরোয় নি, স্নান করে এল একে দুয়ে। ভাতের হাঁড়ি নামলেই বসে পড়বে। যাত্রাদলের ব্যাপার—ভাত-তরকারি শেষ অবধি কদ্দূর কি থাকবে সঠিক বলা যায় না, তাড়াতাড়ি বখেড়া মিটিয়ে ফেলা ভাল। সতর্ক হয়ে আছে, নজর রয়েছে জামরুল-তলার দিকে। তবে সময়ের অপব্যয় সকলের ধাতে সয় না—চার জন ওরই মধ্যে দশ-পঁচিশের ছক পেতে নিয়েছে, তাদের চতুষ্পার্শ্বে জুত দিচ্ছে জন আষ্টেক। উচ্চৈঃস্বরে একজন জটিলার পাঠ মুখস্থ করছে। ডুগি-তবলা ও হারমোনিয়াম সহযোগে বোল তুলবার ফিকিরে আছে একটা দল।

ধপ্‌পাস—

পৈঠার ধারে যে লোকটা বসে ছিল, এক লাফে সে উঠানের উপর। অর্থাৎ ভাতের হাঁড়ি নেমেছে। ঠেলাঠেলি পড়ল, দশ-পঁচিশের কড়ি ও ছক-গুঁটি পায়ে পায়ে ছড়িয়ে গেল। একখানা কলাপাত নিয়ে চক্ষের পলকে সকলে জামরুল-তলায় বসে পড়েছে।

কেবল অমূল্য ছেলেটির দৃক্‌পাত নেই। দাওয়ার প্রান্তে হাত-আয়না ধরে পরম যত্নে সে টেড়ি বাগাচ্ছে। টেড়ি বাগানোর চুলই বটে! কপালে দু-পাশ দিয়ে থরে থরে কাঁধ অবধি নেমেছে। সকলের আগে সে স্নান করে এসেছে, তখন থেকেই চুলের পরিচর্যায় লেগে আছে। ব্যাপার সোজা নয়—প্রতিদিন অন্ততপক্ষে তিন-চার ঘণ্টা ব্যয়িত হয় এই কর্মে।

হরিপদ অমূল্যর চেয়ে বয়সে অনেক বড়; কিন্তু দু-জনে বড় ভাব। একটানে সে আয়না কেড়ে নিল।

থাকুক ঐ অবধি। খেয়ে-দেয়ে আবার এসে লাগিস। খোক্কসগুলো ক্ষিধেয় শান দিতে পাড়ায় বেরিয়েছে। এসে পড়লে সমস্ত সাবাড় করবে। কপালে জুটবে তখন ফুলো-ডুমুর। চলে আয়—

সীতানাথ ভাত দিয়ে যাচ্ছে। আসিদ্ধ ভাত—নরম হয় না। মেখে কায়দা করতে গেলে ছিটকে পড়ে।

হরিপদ বলে, করেছ কি চক্কোত্তি! ভাত যেন পাথরের কুচি—আওয়াজ করে পাতে পড়ছে।

অমূল্য হেসে বলে, ভালোই তো! আস্তে আস্তে হজম হবে, পেটে ভর থাকবে। রাত্তির বেলা জোটে কি না জোটে—

সীতানাথ বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলে, আশা কম নয় তো! এই এক যজ্ঞির ব্যাপার—আবার রাত্তিরে সাটতে চাস এর উপর? ডাল, ডালনা, টক—তিন দফা হল। আলু-মূলো-সিম-পালং সমস্ত পাচ্ছিস এক ডালনার মধ্যে।

গামলা থেকে এক হাতা দু-হাতা করে ডাল দিয়ে যাচ্ছে পাতে পাতে। বলে, ভাজা-মুগ। কি বাস বেরুচ্ছে—শুঁকে দেখ্। তিন দিন ঢেকুরের সঙ্গে গন্ধ বেরুবে।

হরিপদ বলে, গরম জলে মুগ ছেড়ে দিতে তুমি ভুলে গেছ সীতানাথ। না দাও না-ই দেবে—নুনও যদি দিতে!

সীতানাথ ভ্রূকুটি করে নুনের জায়গা দেখিয়ে দিল।

হাতে কুড়িকুষ্ঠ মহাব্যাধি হয় নি তো! যত খুশি নিয়ে খাও।

অমূল্যই উঠে নুন নিয়ে এল। নিজে নিল, হরিপদ ও আর ক-জনকে দিল।

হরিপদ পুনশ্চ মন্তব্য করে, স্রেফ গরম জল—দিব্যি ডাল বলে চালিয়ে যাচ্ছ। মাংসের কালিয়া কি আলুবখরার চাটনিও বলতে পারতে। ঠেকায় কে? সবই হতে পারে এ জিনিস।…কাঁচা-লঙ্কা দিতে পার একটা-দুটো?

রান্নার নিন্দেয় সীতানাথ ক্ষেপে গেছে। মুখ বেঁকিয়ে বলে, আ মরে যাই, নবাব সিরাজদ্দৌলা এলো তক্তাউশ চেপে। নুন চাই, লঙ্কা চাই—তারপর? থামলি কেন, বলে যা—দধি চাই, নবনী চাই—

কলঙ্কভঞ্জন পালায় হরিপদ গোপ সাজে, অমূল্য গোপিনী। 'দধি চাই—নবনী চাই'—ফিরি করতে করতে আসরে ঢুকতে হয়। তারই খোঁটা দেওয়া হল আর কি!

অমূল্য বলে, মাছ পাঠিয়েছে না বাবুর বাড়ি থেকে ?

সীতানাথ ঘাড় নাড়ল।

হুঁ, মাছ-ভাজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

উঠল অমূল্য। কয়েকটা মাঝপাতার উপর স্তূপাকার ভাত ঢেলে রেখেছে ; অনতিদূরে গাছের গুড়ির আড়ালে মালসার উপর সরা-চাপা দেওয়া।

সীতানাথ হাঁ-হাঁ করে ওঠে।

ওদিকে কি ? কর্তাদের দেরি আছে বলে তরকারি কিছু আলাদা তুলে রেখেছি। শনির দৃষ্টি ও-ধারে কেন রে ?

ততক্ষণে সরা তুলে ফেলেছে অমূল্য।

মাছ নয়—কি তবে ? নাকে স্পষ্ট পেলাম মাছ-ভাজার গন্ধ—

হাতা উঁচিয়ে সীতানাথ রুখে এল।

ঘাটিস নে। পিটিয়ে মাথা ফাটাব। খান দশ-বারো মাত্তোর দাগা—হাজরা মশাই, মা-যশোদা, কেষ্ট, আয়ান ঘোষ এদের জন্য রয়েছে।

হরিপদ টিপ্পনী কাটে, তুমি বাদ ? তেমনি পাত্তোর বটে তুমি !

অমূল্য বলে, হাজরা মশায়রা খাবে—আমরা খেতে পারি নে ? দলের নই আমরা ?

সীতানাথ বলে, শোন কথা ! ফড়িং হলেন পশু, আরশুলা হলেন পাখী। গোপ-গোপিনী, দূত-সখী, মৃত-সৈনিক আর কেষ্ট, মা-যশোদা, আয়ান-কংস এক হবে নাকি ?···ইয়ার্কি করিস নে—খেয়ে নিগে যা পেয়েছিস।

ধাক্কা মেরে সে অমূল্যকে সরিয়ে দিল। টাল সামলাতে না পেরে অমূল্য পড়ে গেল। রাগে কাণ্ডজ্ঞান রইল না। উঠে ধুলো-মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, কাউকে খেতে দিচ্ছি নে ও-মাছ—

পাত্রের সমস্ত নুন সে মাছের তরকারিতে ঢেলে দিল।

এই গণ্ডগোলের মধ্যে লক্ষ্মণ হাজরার আবির্ভাব। মেজাজ উষ্ণ। কাল যে বাড়ি গেয়েছে, গৃহস্থটি অতি ছ্যাচড়া। কংসের পাঠ ভুলে যাওয়ার দরুন আসরে হাসাহাসি হয়েছিল,—সেই অপরাধে আড়াই টাকা জরিমানা কেটে

নিয়েছে। বিস্তর বাগবিতণ্ডা হয়েছে এই নিয়ে, লাভ কিছু হয় নি—উল্টে আরও গালি খেতে হয়েছে। ক্ষিধেও পেয়েছে নিদারুণ। সাজের গাড়ি পিছনে ফেলে দ্রুত পায়ে লক্ষ্মণ চলে এসেছে।

লক্ষ্মণকে দেখতে পেয়ে সীতানাথ চেঁচিয়ে ওঠে, শয়তানি দেখ কর্তা। মাছ দেওয়া হয় নি বলে নুন ঢেলে দিয়েছে। তোমাদের খেতে দেবে না।

লক্ষ্মণের ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলে ওঠে। ছুটে গিয়ে সে অমূল্যর কান টেনে ধরল।

বটে!

গলাধাক্কা দিয়ে সদর-দেউড়ি পার করে তাকে একেবারে রাস্তায় তুলে দিয়ে এল।

ফিরে এসে হাঁপাচ্ছে তখনো। এবার হরিপদর পালা। সীতানাথ বলে, এই—এরই আস্কারা। নুন দাও, লঙ্কা আনো, স্রেফ গরম জল—এমনি চুকলি কেটে কেটেই অমূল্যকে চেতিয়ে দিল। নইলে—হক কথা বলব—ছোঁড়াটা তেমন ঘোরপ্যাঁচের নয়।

লক্ষ্মণ চোখ পাকাল হরিপদর দিকে।

হরিপদ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ঘাট হয়েছে কর্তা—আর করব না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। হতচ্ছাড়াটা তাইতে এদ্দূর করে বসবে, বুঝতে পারি নি।

লক্ষ্মণ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, ভাত বন্ধ তোর এ বেলা। ওঠ্—

হরিপদ মুখ গুঁজে রইল পাতের ওপর। লক্ষ্মণ হাত ধরে টান দেয়, উঠে যা বলছি—

উঠবে না সে কিছুতে। বরঞ্চ কাছে পেয়ে সে লক্ষ্মণের দুই পা জড়িয়ে ধরল।

নাক মলছি, কান মলছি। আর এমন হবে না, কোন দিনও না।

কাকুতি-মিনতিতে নরম হয়ে অবশেষে লক্ষ্মণ বলল, আচ্ছা—যা পাতে পড়েছে, খেয়ে নিক। ঐ ক'টা মাত্তোর—একটা ভাতও নয় ওর উপর। আমার আদেশ—

লক্ষ্মণ কংস-রাজার পাঠ করে। সেই রাজকীয় আদেশ দান করে মাথায় এক পলা তেল থাবড়ে দ্রুত সে স্নান করতে চলল।

২

দোল নয়, দুর্গোৎসবও নয়—শ্রীপঞ্চমী।

অন্যান্য বছর প্রসন্ন পণ্ডিত বিনা প্রতিমায় কেবলমাত্র ফুল-বাতাসা ও গুড়ের নাড়ুর উপচারে রীত রক্ষা করেন। এবারে সমারোহ ব্যাপার। ঢোল, কাঁসি, শানাই কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে—কাল দুপুরবেলা ফরমাস-দেওয়া প্রতিমা এসে পৌছেছে—সেই তখন থেকেই।

ভবতারণ চাটুজ্জে খাটছেন খুব। পুরানো কর্মচারী—খাটতেই হবে। বিশেষত কর্ত্রী ঠাকরুন স্বয়ং উপস্থিত। তাঁর উদ্যোগেই পূজা। তবে টিপ্পনী কাটতেও ছাড়েন না। সেটা স্বভাব-দোষ।

দেড়খানা ছেলের পাঠশালা, তার পিরতিমের ঠাট দেখ! ঘরের চালে খড় পড়ে না, ঝাড়লণ্ঠনের ঘটা!

প্রতিমাখানি মানুষ-জন আহ্বান করে দেখানোরই মতো। ঘর-বাড়ি আলো-করা সুবিশাল মূর্তি। কাছারি-দালানের পাশে এক ফালি বারান্দা। উপরে টিনের ছাউনি। ঐখানে প্রসন্নর পাঠশালা বসে। বারান্দায় দেয়াল ঘেঁষে প্রতিমা স্থাপিত হল। ইতর-ভদ্র তাজ্জব হয়ে গেছে। চারিদিকে আনন্দ-কলরব।

ইন্দ্রাণী বেরিয়ে এলেন বাড়ির ভিতর থেকে। তিনিও মেতে গেলেন পূজোর ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

একবার ভবতারণকে ডেকে বললেন, পুরুত-ঠাকুরমশায়কে বলে আসুন, ঠিক সাড়ে-সাতটায় পূজোয় বসতে হবে কিন্তু। পুষ্পাঞ্জলি দেবার পর ছেলেরা খাবে, পূজো সকাল সকাল সারতে হবে।

ভবতারণ বললেন, ইদিককার গোছগাছ হয়ে উঠবে অত সকালে?

সেজন্য ভাববেন না।

ছেলেপুলেদের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করেন, কি রে? পারবি নে তোরা? সমস্ত কিন্তু নিজেদের করতে হবে, অন্যের উপর ভরসা করলে হবে না।

তারা তখনই কাজে বসতে চায়।

ইন্দ্রাণী বললেন, বস্তার শাঁক-আলু ঢেলে খোসা ছাড়িয়ে কুটে ধুয়ে রাখতে হবে। কমলালেবুও ধুতে হবে। ধূলোমাটি-মাখা জিনিসে ঠাকুরের ভোগ দিতে নাই। চন্দন ঘষতে কে পারবি? মস্ত বড় চন্দন-পাটা ঐ দেখ—

একটি ছেলে বলে, ফুল তুলতে হবে কখন গিন্নি-মা?

ভোরবেলা। আজকের তোলা ফুল বাসি হয়ে যাবে। অনেকে তোমরা অঞ্জলি দেবে—ফুল কিছু বেশিই লাগবে।

আমি যাব ফুল তুলতে—

আমি যাব—

আমি—

সকলেই যেতে চায়। সামলানো মুশকিল। ইন্দ্রাণী বললেন, ওরে বাস্‌রে! এতজনে গিয়ে গাঁয়ের সমস্ত ফুল মুড়িয়ে আনবে। পূজো তো অনেক বাড়ি—তারা ফুল পাবে কোথায়?

আমরা দেবো। আমাদের কাছে এসে চেয়ে-চিন্তে নিয়ে যাবে।

ইন্দ্রাণী হেসে বললে, এ বেশ ভাল যুক্তি। যারা সকাল সকাল উঠতে পারে না, পূজোর দিনও বেলা অবধি ঘুমোয়, তাদের শিক্ষা হবে। ফুল চেয়ে নিয়ে পূজো করতে হবে।

ভবতারণ রাগে গর-গর করছেন। ছেলেপুলে নিয়ে মাতামাতি—এ যে কুকুরকে মাথায় তোলার সামিল। কিন্তু মুখ ফুটে বলা চলে না তো! বললেন, পুরুত-বাড়ি চললাম তবে। নির্মল মাস্টারের নেমন্তন্নটা সেরে আসব অমনি। কি বলেন—করা হবে তাকে নেমন্তন্ন?

ইন্দ্রাণী বললেন, সবাইকে করবেন—কেউ বাদ নয়। মাস্টার বলে তার দোষ হল নাকি ?

না, তাই বলছিলাম। আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইস্কুল বসিয়েছে কিনা!

গ্রামের শেষ প্রান্তে কুঠির জঙ্গল। নির্মলের ইস্কুল সেইখানে। ভবতারণের বাড়িও ঐ পথে পড়বে। স্ত্রী শঙ্করীবালা প্রতিমা দেখতে এসেছিলেন। ভবতারণ ডাকলেন, যাবে তো চলো। এর পরে কিন্তু সাথী পাবে না। আবার কাল সকালে এসে কাজকর্মে লেগো।

শঙ্করীবালা চুপচাপ বেরিয়ে এলেন, কিছু বললেন না মুখে। আজ এই প্রথম তিনি ইন্দ্রাণীকে দেখলেন। ভবতারণের স্ত্রী—অতএব আলাপও করতে হয়েছে তাঁর সঙ্গে।

ভবতারণ বললেন; দেখলে তো ? ইন্দ্রাণী নাম—বলে দিতে হয় না। এতখানি বয়স—চেহারায় তা ধরতে পার ?

শঙ্করীবালা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, বড্ড দেমাক—

গলবস্ত্রে তোমায় প্রণাম করলেন। তুমিই বরঞ্চ মুখ বেঁকিয়ে রইলে, ভাল-মন্দ একটা কথা বললে না।

প্রণাম না কচু। শুনেছে, সিদ্ধান্ত-ঘরের মেয়ে। মাথা না নুইয়ে উপায় নেই—তাই দায় সারল। পায়ের ধূলোটাও তো নিল না!

যা-তা বোলো না। গাছের শত্তুর লতা, মানুষের শত্তুর কথা।

ভবতারণ সন্ত্রস্ত ভাবে পথের এদিক-ওদিক তাকান। স্ত্রীর কথা ঘুণাক্ষরে কারো কানে গেল কিনা! কিন্তু শঙ্করীবালা রায়-সেরেস্তার কর্মচারী নন, ত্রিসংসারে কাউকে . চুকে কথা বলবার মানুষ নন তিনি। বললেন, শান-বাঁধানো অমন বারান্দা—দেখলে না, ধূলোর ভয়ে কেমন ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটছে। পিরথিম জুড়ে গদি-পাতা থাকলে ওদের জুত হত বোধ হয়।

ভবতারণ এ নিয়েও জাঁক করেন।

রীত-ব্যাভার আলাদা তো হবেই। আমরা ছেঁড়া চটি ফটফটিয়ে

বৈড়াই, লক্ষ্মী পা রাখেন শতদল-পদ্মের উপরে। এতে রাগ করলে চলে না।

আর খানিক দূর নিঃশব্দে এসে শঙ্করীবালা মোক্ষম মন্তব্য করলেন, বড়-মানুষদের বছর বছর ছেলে মরে এই রকম!

ভবতারণ দু-কানে আঙুল দিলেন।

ছি ছি! বাঁজা মানুষ—ছেলেপুলে নাড়াচাড়া করলে না তো কখনো, তাই এমন কথা মুখ দিয়ে বেরুল।

শঙ্করী লজ্জা পান না। কি ক্ষণে দেখা—বিষ-নজরে দেখেছেন তিনি ইন্দ্রাণীকে। বললেন, ছেলে মারা গেছে বলেই তো তাঁতিহাটে এসে পড়ে এত মচ্ছব। কই, এ্যাদ্দিন তো ঝিঙে-নাড়া করেন নি। বেকায়দায় না পড়লে কি বড়লোকদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে?

হুড়কো তুলে শঙ্করীবালা বাড়ির উঠানে ঢুকে পড়লেন। ভবতারণ হন-হন করে চললেন নির্মলের কাছে। ফিরতি মুখে চক্রবর্তী-পাড়া হয়ে পুরুত ঠাকুরকে বলে আসবেন। অনেক কাজ। নন্দ ঘোষ গোয়ালাকেও একবার তাগিদ দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন—সকাল সকাল যাতে সের পনেরো ছানা পৌঁছে দিয়ে আসে।

কুঠির জঙ্গলে গিয়ে বিস্ময়ের পারাপার রইল না। কর্ত্রী ঠাকরুন আসবার পর কাজে কর্মে এই মাসখানেক এদিকে আসা হয় নি, ইতিমধ্যে এ কি অঘটন ঘটিয়েছে ছোঁড়ারা! মহাভারতে ময়-দানবের কথা পড়া গেছে—এ যে সেই বৃত্তান্ত! যত ব্যস্ততা থাক, ঐ কাণ্ড দেখে কোন মতে চুপচাপ চলে যাওয়া যায় না। সামনের দিককার জঙ্গল প্রায় নিশ্চিহ্ন—চিনবার জো নাই। নীলকর-আমলের পর এই প্রথম বোধ হয় সূর্যালোক পড়েছে এখানে। চরের উলুখড় কাটছে পাঁচ-সাতটা ছেলে, আঁটি বেঁধে এনে এনে ফেলছে জঙ্গল-কাটা ফাঁকা জমির উপর। বাঁশ কেটে গাদা করছে সঙ্কীর্ণ পথের ধারে, কুড়াল দিয়ে চিরছে। গিরা ফাটছে ফট-ফট আওয়াজে।

ধৈর্য রাখা যায় না এ অবস্থায়। ভবতারণ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, বাপের

ঝাড়ের বাঁশ কাটছিস ছোঁড়ারা? ফৌজদারি-ফারাক্কার দায়ে পড়বি—তখন ঠেকাবে কে?

একটা ঘর হয়ে গেছে—তাতে কুলোচ্ছে না, আরও তুলবে। মাপজোপ করে জমিতে নিশান পুঁতছিল নির্মল। ভবতারণের চেঁচামেচিতে এদিকে এল।

কি বলছেন চাটুজ্জে মশায়?

নির্মলের সামনে ভবতারণ স্বর বদলে নেন। কারণ আছে। ম্যানেজার বিশেষ অনুগ্রহ করেন তাকে। কতটা কি বন্দোবস্ত হয়েছে সঠিক জানা নেই, অতএব সাবধানে এগোনো উচিত।

জিজ্ঞাসা করছিলাম—এই যে বাবলা-সোমরালি-নাটাবন কেটে বেছাপ্পর করছ—

সহাস্যে নির্মল বলে, বুনোশূয়োর বসতি করত, এখন মানুষ জন্মাবে। ম্যানেজার মশায় জানেন।

তা তো বটেই। কিন্তু এস্টেটের যাবতীয় বাঁশ-খড়ও কি তিনি দাতব্য করেছেন?

তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন—

তিনি তো কলকাতায় গিয়ে বসে আছেন আজ বিশ দিন—

তারপর ঘাড় নেড়ে সায় দেবার ভাবে বললেন, আমিও তাই বলছিলাম মাকে। ম্যানেজার না বললে কিসে এত সাহস পায় তোমার ভূতপ্রেতের দল?

নির্মল বলে, ভূতপ্রেত বলছেন কেন? গ্রামেরই সব ছেলে।

কথার স্বরে উত্তাপের আভাস পেয়ে ভবতারণ পুনশ্চ সামলে নেন।

তুমি বাবা সদাশিব—তোমারই সাঙ্গোপাঙ্গ কিনা! তাই উপমা দিয়ে বললাম।

হা-হা করে হাসতে লাগলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ প্রখরতর হল। জমির উপর ঘর বাঁধবার অনুমতি, তার উপর বাঁশ-খড়—শুধুমাত্র মুখের প্রার্থনায় এত খয়রাতি? পাপ কলিযুগে শোনা যায় না তো এ রকম! নির্মলও যে ভাঁওতা দিতে পারে না, এমন নয়। ম্যানেজারের অনুপস্থিতিতে ঘরের পর ঘর তুলে

জমিতে বেড়া দিয়ে দখলি স্বত্ব সাব্যস্ত করে রাখছে। নির্মল পাত্রটি সোজা নয়—সে তো তার এতটুকু বয়স থেকে দেখে আসছেন।

প্রহর খানেক রাত্রি। ছেলেমেয়েরা খাটাখাটনি করছিল, তাদের খাবার ডাক এল। দলবল নিয়ে ইন্দ্রাণী রান্নাঘরের দাওয়ায় সকলের মাঝখানে বসলেন। তারা খাচ্ছে—তিনি তদারক করছেন। কে কি পাচ্ছে না পাচ্ছে, দেখে ঠাকুরকে হুকুম করছেন তদনুযায়ী।

অমলা এসে ডাকল, মা, শরীর খারাপ তোমার। ঘরে চলো।

অনেকবার বলল। মেয়ের কথা ইন্দ্রাণী কানে নেন না। অমলা চলে গেলে সহাস্যে এদের দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললেন, হিংসে—বুঝতে পারলি? ওকে ভাঁড়ার আগলাতে দিয়েছি, এক পা বেরুতে পারছে না—আমাকেও তাই শোবার ঘরে আটকে ফেলতে চায়। সেটি হচ্ছে না।

বিস্ময় লাগে অমলার। রাশভারী ইন্দ্রাণী কি মন্ত্রে হঠাৎ ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন! মুকুল মারা যাবার পর এমন উচ্ছ্বসিত হাসি হাসেন নি তিনি কোনদিন।

খাওয়া শেষ হলে ইন্দ্রাণী বললেন, এইবারে গুটিগুটি তোমরা বাড়ি চলে যাও। আলো ধরে পৌঁছে দেবে। ভোরবেলা চলে আসবে। কেমন?

একটি ছেলে আবদার করে, আমি যাব না। যদি তখন ঘুম না ভাঙে!··· বাবা কিছু বলবেন না, টেরই পাবেন না। ঠাকুর-পাহারাও তো দিতে হবে। আমি এইখানে থেকে যাই গিন্নি-মা।

ইন্দ্রাণী রাগ করে ওঠেন।

বার বার গিন্নি-মা বলছিস কেন রে?

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি বলব তবে?

কিচ্ছু না—আপনি-উনি করে বলবি। নয় তো শুধু মা বলবি। গিন্নি শুনলে গা ঘিনঘিন করে।

একা সে নয়—নাছোড়বান্দা দশ-বারোটি রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। কাছারি-

দালানের ফরাস জুড়ে বিছানা। হাই উঠলেই শুয়ে পড়তে হবে এই কড়ারে ইন্দ্রাণী গল্প বলতে রাজি হয়েছেন। হাই না ওঠে, সেজন্য সতর্ক সকলে।

জোরালো পাঞ্চ-আলো জ্বলছে। ইন্দ্রাণী তাঁর দেখা নানা জায়গার কথা বলছেন। পুরীর সমুদ্র-বেলার কথা, দার্জিলিং থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা। এরোপ্লেনে একবার মেঘপুঞ্জের মধ্য দিয়ে যাবার সময় হু-হু করে প্লেন অতি-দ্রুত মাটির দিকে নামতে লাগল—সেই রোমাঞ্চকর গল্পও করলেন। তারপর বললেন, আমি একা বক-বক করছি, আর যে কেউ কিছু বলছিস নে?

ভূতের গল্প বলতে পারি। শুনবেন? এখানে এক নীলখোলা আছে। সাহেব-ভূত ঘুরে বেড়ায় সেখানে···

সকাল হল। ইন্দ্রাণী ঐখানেই একটু গড়িয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ক্লান্তির চিহ্ন-মাত্র নেই মুখে। যে ক-জন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাদের ডেকে তুললেন। খিড়কি-পুকুরে দুটো ডুব দিয়ে গরদের কাপড় পরে পূজা-স্থানে এসে বসেছেন আবার।

কি কাজে এসে প্রসন্ন মুগ্ধ-চোখে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন। নিমন্ত্রিতবর্গকে আহ্বান করে তিনি বলছেন, লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিরোধ শুনে থাকেন—মিথ্যে কথা। স্বয়ং মা-লক্ষ্মী মা-সরস্বতীর পূজো সাজাচ্ছেন, দেখুন গে যান মশাইরা।

ভবতারণ পণ্ডিতের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে ইন্দ্রাণীর শ্রুতিগম্য করে বললেন, লক্ষ্মী তো বটেই—ষষ্ঠী ঠাকরুনও। ছেলেমেয়েদের দঙ্গল নিয়ে কাল থেকে যে ঝক্কিটা পোয়াচ্ছেন, আমাদের হলে মাথা খারাপ হয়ে একটা খুন-খারাপি ঘটে যেত।

কাছারি-দালান থেকে প্রসাদ-বিতরণ হচ্ছে। দক্ষিণের বারান্দায় একে একে উঠে কাগজের ঠোঙায় ফলমূল ও পদ্মপাতায় বাঁধা মিষ্টান্ন নিয়ে পশ্চিম কোণের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবে, এই ব্যবস্থা। কিন্তু অতিরিক্ত ভিড় হওয়ার দরুন হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। গোলমাল হচ্ছে বিষম।

পুরুতের দক্ষিণান্ত সেরে ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি কাছারি-দালানের দরজায় এলেন।

ঝুড়ি আমার হাতে দিন চাটুজ্জে মশায়। আপনি ওদিকে দাঁড়ান। তোমার এখানে কি বলবস্ত ? লাঠি এনেছ যাদুমণিদের ভয় দেখাতে ? যাও, তফাৎ যাও—

ইন্দ্রাণী হাসতে লাগলেন। গোলযোগ মুহূর্তে নিস্তব্ধ।

মলয়, তুই বাবা মিষ্টিগুলো তুলে দে আমার হাতে। পারবি নে ?

ইন্দ্রাণী ও জন পাঁচেক মাত্র দালানে রইলেন। একের পর এক সুশৃঙ্খলায় প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছে, যন্ত্রের মতো কাজ হচ্ছে। লেবুর খোসা দেখতে দেখতে স্তূপীকৃত হয়ে উঠল উঠানে। সন্দেশ ছোড়াছুড়ি করছে ছেলেরা। কত খাবে ?

৩

অমূল্যর কথা হচ্ছিল।

দুপুর গড়িয়ে এল। ঘাটের রানার উপর সে বসে। হরিপদ সেই থেকে খোঁজাখুঁজি করছে। অবশেষে আবিষ্কার করল এখানে। পাশে বসে আস্তে সে পিঠের উপর হাত রাখল।

অমূল্য মুখ ফিরিয়ে দেখে। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, ক্ষিধেয় নাড়ি পটপট করছে হরিপদ-দা—

মুখ দেখেই সেটা বোঝা যায়। হরিপদর কষ্ট হচ্ছে। দলের মধ্যে সত্যিই ভালবাসে সে ছোঁড়াটাকে। কি বলবে, সহসা ভেবে পায় না। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করল।

খা—

বিড়িটা অমূল্যর মুখে গুঁজে দিয়ে দেশলাই জ্বেলে সযত্নে ধরিয়ে দেয়। সান্ত্বনা দিয়ে বলে, রাগ করে কি করবি ? আমরা গোপ-গোপিনী সাজি, রাজা-উজির হলে খাতির করত। মাছের দাগা সামান্য কথা—বেঁকে বসলে ঐ লক্ষ্মণই পায়ের তলায় মাথা খুঁড়ত। চোখেই তো দেখলি, পেট কামড়াচ্ছে বলে আয়ান ঘোষ এক কথায় কি রকম মাইনে বাড়িয়ে নিল।

অমূল্য গর্জে ওঠে, চেনে নি আমায় লক্ষ্মণ হারামজাদা। অন্ধকারে ইট [illegible] ওর মাথা ফাটাব—ওর সাজের বাক্সে আগুন জ্বালিয়ে দেবো।

হরিপদ বোঝাতে লাগল। তাতে লাভটা কি? একটা তবু হিল্লেয় আছি, তখন আবার টো-টো করে বেড়াও। যাত্রার দল সমস্ত উঠে যাচ্ছে, নতুন দল জোটানো সোজা নয়।

একটু থেমে নিশ্বাস ফেলে বলল, কিছু টাকা পেলে নিজেরাই দল খুলতাম। আমি কেষ্টর পাঠ নিতাম, তুই ছি-রাধিকা। হৈ-হৈ পড়ে যেত। লক্ষ্মণ হাজরা চিনল না আমাদের।

কয়েক টান টেনে আধপোড়া বিড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়ে অমূল্য এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

কি রে?

ধোঁয়ায় পেট ভরে না হরিপদ-দা। মাথা ঘুরছে।

হরিপদ প্রস্তাব করে, জল খেয়ে নে খানিক।

জলই তো খাচ্ছি তখন থেকে।

আবার অমূল্য উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

উঃ, বেটারা মাছের দাগা ওড়াচ্ছে! আমাদের কপালে জল আর ধোঁয়া—দৌড় দিল সে।

হরিপদ ডাকে, শোন্—কোথা চললি? পালাস নে ভাই। তোকে হাজির না পেলে আমাকে আসরে নামতে দেবে না। পাঁচু-অধর মুকিয়ে আছে—তাদের তখন পোয়াবারো।

জবাব না দিয়ে অমূল্য ছুটেছে।

ভাঁড়ারের ভার চাপিয়ে সত্যি কি মুশকিলে ফেলেছেন ইন্দ্রাণী—অমলা গলদ্‌ঘর্ম হয়ে যাচ্ছে। প্রসাদ-বিতরণ চুকে গেলে রাগে রাগে সে দরজায় তালা দিল। চারটের আগে খুলছে না তালা। মা হুকুম করলেও না। মারা যাবে নাকি খেটে খেটে?

আবার নূতন করে সঙ্কল্প করল, অশোক এসে পড়লেই চলে যাবে তার সঙ্গে। যাবেই। মা'র দেরি থাকে, পড়ে থাকুন এখানে যতদিন খুশি। জেঠা বাবু অর্থাৎ হরিতোষ রয়েছেন—কলকাতায় থাকবার কোন অসুবিধা নেই। আসি-আসি করছে অশোক—আসে না কেন? বাবা রে বাবা—কথা বলবার একটা দোসর নেই? দম আটকে আসে মন খুলে কথা বলতে না পেরে। মা'র মনোভাব বোঝা দায়। পৃথিবীর এত জায়গার ভিতর তাঁতিহাট ভাল লেগে গেল কিসে হঠাৎ?

কাল বিকালে দেখে এসেছে গাছ-ভরা ডাঁশা কুল। দেশি কুল—বিষম টক যদিচ, কিন্তু নুন-লঙ্কা সহযোগে পরম উপাদেয়। আঁকুশিও পেয়েছিল একটা, ঠিক সেই সময় মা এসে ভাঁড়ারের চাবি গছিয়ে দিলেন; যেন শিকলে বেঁধে ফেললেন হাত-পা।

এতক্ষণে একটু ফাঁক পাওয়া গেল। ইন্দ্রাণী দরজা বন্ধ করে বিশ্রাম করছেন, টের পাবেন না। কালকের সেই আঁকুশি হাতে নিয়ে এখন মনে হচ্ছে, অত্যন্ত খাটো—যেখানে কুল আছে, ততদূর পৌছবে না। বড়-একটার চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করছে।

বলবন্ত জিজ্ঞাসা করে, কি খুঁজছ দিদিমণি?

বলবন্ত দু-দফায় আঠারোটা পানতুয়া খেয়েছে চেয়ে চেয়ে। অমলার উপর সে পরম তুষ্ট। তার কাছে লুকোবার কিছু নেই।

মহোৎসাহে বলবন্ত বলে, কুল খাবে—তা মুখের কথা বললেই তো হয়। যার গাছে থাকে, পেড়ে আনছি। না—বলবার তাকৎ হবে না কোন শালার।

অমলা সভয়ে বলে, উঁহু—মাকে চেনো না। অন্যের জিনিষ এনেছ, টের পেলে মা আস্ত রাখবে না। তার দরকার নেই। বাগানের গাছে আমি দেখতে এসেছি, বিস্তর আছে। ডাল ভেঙে পড়বার অবস্থা। অন্য জায়গায় যেতে হবে কেন?

রোয়াকের প্রান্ত থেকে একটা খালি ঝুড়ি তুলে নিয়ে বলবন্ত বলে, চলো।

আগে আগে অমলা প্রায় ছুটে চলেছে। এ কি? আঁঠি ছুড়ে মারে কে? চারিদিকে তাকায়। কাউকে দেখা যায় না।

দো-ডালায় আরাম করে পা ঝুলিয়ে বসে অমূল্য কুল খাচ্ছিল, আঁঠি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছিল ইতস্তত। কোঁচড়-ভরতি কুল পেড়েছে, মনে দুঃখের লেশমাত্র নেই আর। অমলাদের গোড়ায় দেখতে পায় নি। তাড়াতাড়ি আরও খানিকটা উঁচুতে উঠে ঘনপত্র কয়েকটা ডালের আড়ালে সে লুকাল।

অমলা স্তম্ভিত। চোখে জল আসবার মতো হল।

টোপা-টোপা এত কুল কাল দেখে গেলাম, একটাও তো নেই।

বলবন্ত বলে, গাছ ভুল করেছ দিদিমণি।

সবেগে ঘাড় নেড়ে অমলা বলে, কক্ষণো না। তলায় এই আনারসের চারা। ভুল হতেই পারে না।

তবে হনুমানে সাবাড় করে গেছে।

প্রত্যয় হয় না অমলার। বলে, বিকেলবেলা নিজের চোখে দেখে গেছি—

তা হয় দিদিমণি। একটা রাত্তির তো মাঝে গেছে—ওর মধ্যে ডালপাতা-শিকড়সুদ্ধ খেয়ে ফেলতে পারত। জায়গাটা বড় খারাপ—গাছে হোক, কি ঘরে হোক, জিনিসপত্র কোথাও রেখে সোয়াস্তি নাই—পলকে লোপাট হয়ে যায়।

গাছের দিকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে বলবন্ত। এত আশা করে বাগানে এসেছে কলকাতার মেয়ে—দু-দশটাও যদি অন্তত পাওয়া যায়। অমূল্যর বিষম বিপদ—ডালে নাড়া না লাগে এমনি সন্তর্পণে নিবিড়তর অংশে লুকোচ্ছে। একেবারে মগডালে গিয়ে উঠেছে।

সহসা অঘটন ঘটল। ডাল ভেঙে হুড়মুড় করে অমূল্য পড়ল মাটিতে। কোঁচড়ের কুল ছড়িয়ে পড়ল।

ঝুড়ি ফেলে বলবন্ত সগর্জনে ছুটে যায়।

তবে রে বেটাচ্ছেলে!

অমূল্য সামলে নিয়েছে। হাঁটু গেড়ে বসল। আর কিছু না হোক—এত কুল রয়েছে হাতের কাছে। সহজে আত্মসমর্পণ করবে না।

হাতে অবিরাম ছুড়ছে। লড়াইয়ে মেশিন-গানের গুলির কথা শোনা যায়—এ-ও প্রায় সেই বস্তু। একটা গিয়ে লাগে অমলার চোখের কোণে। অন্ধকার দেখে সে 'মা-গো'—বলে মাটিতে বসে পড়ে। গতিক বুঝে বলবন্ত আর এগোয় না। পরিত্রাহি চিৎকার করছে, মেরে ফেলেছে দিদিমণিকে—

হৈ-হৈ করে অনেকে এসে পড়ল। পালানোর মতলবে ছিল অমূল্য—কিন্তু এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বুঝল, বৃথা চেষ্টা। এ ব্যূহ ভেদ করা যাবে না।

অসহায় কাতর কণ্ঠে বলে, আমি মারি নি, মাইরি বলছি। আচ্ছা বলুন আপনারা—কুলের ঘায়ে মানষের কতটুকু লাগে? ছুতো ধরেছে।

৪

চুল ধরে অমূল্যকে হিড়-হিড় করে টানছে বলবন্ত। চুল লম্বা থাকায় টানবার সুবিধা। কাছারি-দালানের সামনে নিয়ে এল। কাছারি বন্ধ—একলা ভরতারণ বাজারের জমাখরচ টুকছিলেন। খাতা বন্ধ করে তিনি বেরিয়ে এলেন।

অমূল্য চুলের উপর ঘন-ঘন হাত বুলাচ্ছে, আর কাঁদছে হাপুস-নয়নে। ভবতারণ হি-হি করে হাসেন।

চুল ছেড়ে দে বলবন্ত। সর্বনাশ করিস নে। কিল-চড় যদ্দূর পারিস মার—টেড়ি ভেঙে না যায়। টেড়ির শোকে ছোকরা তা হলে মারা পড়বে।

ভিড়ের সঙ্গে মলয় আছে। সে বলে, মেরে কি হবে? মারে এরা জব্দ হয় না। জানলার সঙ্গে বেঁধে মাকে খবর দিয়ে আয়। তিনি এসে যা করবার করবেন।

ভবতারণ তারিফ করে ওঠেন।

তাই কর্ বলবন্ত, যে রকম বলছেন। বনেদি পাকা কথা। চক্ষু বুজে শুধু যদি কেবল কথা শোনা যায়—কে বলবে, ছোটবাবু আমাদের ছোট্ট মানুষ?

গোয়াল থেকে গরুর দড়ি এনে অমূল্যর দু-হাত জানলার গরাদের সঙ্গে কষে বাঁধা হল।

ইন্দ্রাণীর একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল। বলবন্তর ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠলেন। বৃত্তান্ত শুনে মুখ শুকাল।

কোথায় আছে সে? বাগানে পড়ে আছে, না তোমরা ধরে তুলে নিয়ে এসেছ?

বলবন্ত বলে, ব্যস্ত হবেন না মা। তুলে আনতে হয় নি, হেঁটেই এসেছে দিদিমণি। অল্পের জন্য চোখটা বেঁচে গেছে। এই—সুপারির মতো ফুলে উঠেছে কপালের এখানটা।

মাকে দেখে অমলা মুখ ফেরাল। বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করছে ভয়ে।

ইন্দ্রাণী কাছে গিয়ে বললেন, দেখি—

কিছু হয় নি মা। জলপটি দিয়েছি।

ইন্দ্রাণী পটি তুলে ফেললেন। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কুল না ছুঁড়ে ইট মেরে মাথা ভেঙে দিল না কেন? ধাড়ি মেয়ে—পেত্নীর মতো বাগানে বাগানে ঘুরছেন। কুল খেয়ে বেড়াচ্ছেন, বাড়ির ষোড়শোপচারে কুলোয় না। বের করছি তোমার হ্যাংলাপনা। তালা-চাবি দিয়ে আটকাব, তবে শিক্ষা হবে।

রাগের সময় ইন্দ্রাণীর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। রাগ অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। মাকে অমলা খুব জানে। সভয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—গালিগালাজ আর কারও কানে না পৌঁছয়।

একি রে? কি হয়েছে?

সচকিত হয়ে অমূল্য নির্মলের দিকে তাকাল। এতক্ষণের মধ্যে একটি মানুষের কণ্ঠে দরদ পেয়েছে। দু-চোখ জলে ভরে গেল। বলে, দুপুরে খাওয়া হয় নি—তাই বাবু গাছে উঠে দুটো কুল পেড়ে খাচ্ছিলাম।

কে তুই?

যাত্রাদলের ছেলে—বাবুর বাড়ির পার্বণে গাওনা করতে এসেছি। তাই ভাবলাম, গাছের ফল বই তো নয়! কাগায় বগায় ফল খেয়ে যাচ্ছে—

তিক্তকণ্ঠে নির্মল বলে, কাকের বকেরই পার্বণ বাবুর বাড়ি। হুকুম না নিয়ে কেন ভাই ওদের গাছে উঠলি?

পদশব্দে সে পিছন ফিরে চাইল। ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী একনজর তাকালেন নির্মলের দিকে। ভাল মন্দ কিছু না বলে এগিয়ে অমূল্যের কাছে গেলেন।

খাওয়া হয় নি কেন রে?

লক্ষ্মণের হাতে নিগ্রহের কথা বাইরে বলা চলে না। অমূল্য বলে, খাই কি দিয়ে? ডাল কিম্বা ঘাটের জল—তফাৎ বোঝা যায় না। তার উপরে ধরা গন্ধ। মুখে তুললে অন্নপ্রাশনের অন্ন অবধি উঠে আসে। আমরা হলাম ধরুন গে সুখের পায়রা, বড়মানষের উঠোনে বায়না গাই, বড়-দালানে বকম-বকম করি। ছেঁড়া চটে শুতে পারি ঠাকরুন, কিন্তু খাওয়ার দুঃখ ধাতে সয় না।

ইন্দ্রাণী রুষ্ট চোখে বলবন্তর দিকে তাকালেন।

বলবন্ত বলে, মিছে কথা মা। সিধেয় মাছ অবধি গেছে। আমি নিজে দিয়ে এসেছি।

অমূল্য ঘাড় নেড়ে বলে, তা দিয়েছে বটে! কয় কুটি মাছ, সেইটে জিজ্ঞাসা করুন না। সাকুল্যে দু-গণ্ডা। বত্রিশ জন প্রাণী আমরা—সীতানাথ তাই বলছিল, গুঁড়ো করে ভাতের উপর ছড়িয়ে দেওয়া যাক—সকলের আঁশ-মুখ হবে।

ইন্দ্রাণীর ফর্সা মুখ রক্তাভ হল।

নির্মল বলল, উৎসবের দিন ছেলেটা শুকনো মুখে হাত-বাঁধা অবস্থায় রয়েছে। এটা ঠিক নয়। ছেড়ে দিতে বলুন।

ইন্দ্রাণী বলবন্তকে নির্দেশ করলেন, বাঁধন খুলে একে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যা। কোন কাণ্ড-জ্ঞান নেই তোদের। সদরে বারোজনের চোখের উপর রাখতে হয়?

নির্মল অনুনয় করে বলে, আমার সঙ্গে চলুক। দুটো খেতে দিইগে। যাত্রা বসবার সময় পৌঁছে দিয়ে যাব। আমি দায়িত্ব নিচ্ছি।
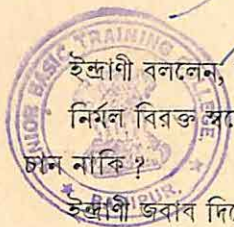
ইন্দ্রাণী বললেন, না—থানায় পাঠানো হবে।

নির্মল বিরক্ত স্বরে বলে, এর পরেও থানা? কুল-চুরির দায়ে ফাঁসি দিতে চান নাকি?

ইন্দ্রাণী জবাব দিলেন না। বলবন্ত বলে, তা ফাঁসিরই বৃত্তান্ত। ছোঁড়াটা খুনে। এখন ভিজে-বেড়াল হয়ে মিউ-মিউ করছে। কুল ছুঁড়ে খুন করে ফেলছিল দিদিমণিকে আর একটু হলে।

বলবন্ত হাতের বাঁধন খুলছে, ইন্দ্রাণী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নিতান্ত কুদর্শন বয়াটে ছেলেটার দিকে। সে দৃষ্টির সামনে অমূল্য বিচলিত হয়ে উঠল।

হুকুম দিলেন, সোনা-কুঠুরিতে নিয়ে আটকে রাখ। না পালায়।

ভবতারণ ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। নির্মলকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগিয়ে এলেন।

এসে গেছ মাস্টার? বড্ড বেলা করে ফেললে। ইদিকে—ইদিকে। প্রসাদ পেয়ে যাও।

নির্মল বলে, না—

যজ্ঞি-বাড়ি থেকে শুধু-মুখে ফিরে যাবে? সে কখনো হতে পারে না।

শুধু-মুখে একলা আমি নই চাটুজ্জে মশাই। হাত ছেড়ে দিন। খাওয়ার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

জোর করে হাত ছাড়িয়ে নির্মল বেরিয়ে পড়ল। ইন্দ্রাণী অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালেন শুধু।

৫

নববধূ রূপে ইন্দ্রাণী এই বাড়ি উঠেছিলেন। অমলার জন্মের পর তাঁরা কলকাতা চলে যান। বকিশোরের খেয়াল হল, এখানকার নদীতে স্টিমলঞ্চ চালাবেন। গাল-ভরা নাম দিয়ে এক কোম্পানি খুললেন কয়েকজন বন্ধুর সহযোগে। কলকাতায় তার হেড-অফিস। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন কোম্পানির কাজে।

সে কোম্পানি অনেক কাল উঠে গেছে। নদী শেওলায় সমাচ্ছন্ন—ডিঙি-নৌকা চালানোই দুষ্কর এখন। নবকিশোর গত হয়েছেন, সে আমলের বন্ধুরাও কে কোথায় ছিটকে পড়েছেন এক হরিতোষ ছাড়া। সরকারি চাকরিতে পেন্সন পাবার পর হরিতোষ বন্ধুকৃত্য করছেন—প্রবীণ বয়সে শহরের আরামের বসবাস ছেড়ে প্রায়ই এই অঞ্চলে পড়ে থাকেন। রায়-এস্টেটের ম্যানেজার তিনি।

সেকালের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে পুরাণো বাড়ির সর্বত্র! দীর্ঘ রোয়াক পার হয়ে বড় কামরা। দেয়ালে সোনার কষ ধরিয়ে ফুল-লতা-পাতা আঁকানো। অযত্নে ও কালের প্রকোপে এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন—ঠাহর করে দেখলে একটু-আধটু নজরে আসে। এই হল সোনা-কুঠুরি।

সোনা-কুঠুরিতে নবকিশোর ওঠা-বসা করতেন, দুপুরের দিবানিদ্রা দিতেন এখানে। হাতীর শুঁড়-তোলা মেহগ্নিকাঠের পালঙ্ক, একদিকে দেয়াল ঘেঁষে প্রকাণ্ড আলমারি, ভারী চেয়ার খানকয়েক, দেয়ালে পূর্বপুরুষদের তৈলচিত্র। সাবেক দিনের মতোই সমস্ত সাজানো রয়েছে। সম্প্রতি কেবল বৃহদাকার এক ফোটোগ্রাফ টাঙানো হয়েছে দরজার সামনে। সকলের একত্র তোলা ছবি—কলকাতা থেকে ইন্দ্রাণী সঙ্গে করে এনেছেন। নবকিশোর হাসছেন ছবির মাঝখানটিতে চেয়ারে বসে। মুকুলও আছে।

অমূল্যকে নিয়ে এসেছে এই ঘরে।

সঠিক নির্দেশ না পাওয়ায় হাত বাঁধে নি—দরজার সামনে বলবন্ত লাঠি হাতে সতর্ক পাহারায় আছে। ইন্দ্রাণী এখানে আসেন নি—থানায় এত্তেলা দেওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত আছেন সম্ভবত। সকালে কার মুখ দেখে উঠেছে অমূল্য—দুর্গতির আর অন্ত নেই। দেয়াল ঠেস নিয়ে বলির পাঁঠার মতো সে প্রতীক্ষা করছে।

অবশেষে ইন্দ্রাণী এলেন। মিলিটারি মেজাজ—অমূল্যর দিকে তাকিয়ে হুকুম করলেন, বোস্—

আঙুল দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু ও-জায়গায় বসতে ভরসায় কুলোয় না। মেঝের উপর উবু হয়ে অমূল্য বসে পড়ল।

ইন্দ্রাণী তাড়া দিয়ে উঠলেন, ধুলোর মধ্যে?

অগত্যা সে জানলার উপর উঠে বসল।

রসুই-বামুন লুচি এবং নানা তরকারি সাজিয়ে নিয়ে এল। পিছনে অমলা—সে দই-মিষ্টি এনেছে। ঝি শৈল ঠাঁই করে দিল তাড়াতাড়ি। গালিচার আসন—সামনে ঝকঝকে কাঁসার থালায় লুচি, গেলাসে জল, বাটিতে বাটিতে তরকারি, প্লেটে স জ নো রকম-বেরকমের মিষ্টিমিঠাই—

অমূল্য কি করে ভাববে, এ সমস্ত তারই জন্য? ইন্দ্রাণী হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, হাঁ করে দেখিস কি? বসে পড়—

মেয়েকে বললেন, সব রকম এনেছিস তো? কিছু বিশ্বাস নেই—যেটা না দেখতে পারব, তোরা একটা গোলমাল ঘটিয়ে বসবি।

বলবন্তর আর সহ্য হয় না। বলে ওঠে, মার যেমন কথা! যা-সব পাতে পড়েছে—হা-ঘরে যাত্রা ওয়ালা ওরা, বাপের জন্মে চোখে দেখেছে?

ইন্দ্রাণী তাকাতে থতমত খেয়ে বলবন্ত চুপ করল। কিন্তু নিজেই তিনি বাগড়া দিলেন। বড় গলদা-চিংড়িটা দেখিয়ে ঠাকুরকে বললেন, এ দিয়েছ কেন? নিয়ে যাও বাটিসুদ্ধ।

যাত্রাওয়ালার পাতে এ বস্তু সত্যিই পড়ে না কখনো। যদিই বা পড়ল, কর্ত্রীর আদেশে ঠাকুর মুখের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায়। ইন্দ্রাণী পুনশ্চ বললেন, খোসা লাল হয়ে গিয়েছিল—ও মাছ রান্নাই বা করেছ কেন? নর্দামায় ফেলে দাও, নয় তো আবার কাকে দিয়ে দেবে তোমরা—

অমূল্যর সব দুঃখ জল হয়ে গেছে। কপালক্রমে কোন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এসে পড়েছে! খাচ্ছে, তবু বিশ্বাস হতে চায় না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে না তো?

গোগ্রাসে গিলছে সে ক্ষিধের জ্বালায়। পালঙ্কে বসে ইন্দ্রাণী এক-নজরে দেখছেন। মুকুলের বয়সি হবে ছেলেটা। মুকুলের সঙ্গে অবশ্য তুলনা চলে না কোনদিক দিয়ে। মুকুল কত সুন্দর দেখতে, কেমন নিটোল গড়ন, রং কত উজ্জ্বল! ঐ মুকুল দাঁড়িয়ে—নবকিশোর ডান হাত রেখেছেন তার কাঁধে; ইন্দ্রাণী বাঁ-দিকে, কোলে মলয়; অমলা কাত হয়ে সামনে ভূমির

উপর বসেছে। সব ঠিক আছে, সবাই আছে—দু-জনই শুধু নেই। কোথায় চলে গেল মুকুল—ও-পারে গিয়ে বাপের স্নেহস্পর্শ পেয়েছে আবার অমনি?

অলক্ষ্যে ইন্দ্রাণী একবার আঁচলে চক্ষু মার্জনা করলেন।

খাওয়া শেষ করে অমূল্য উঠছিল। ইন্দ্রাণী বললেন, সন্দেশ পড়ে রইল যে?

সন্দেশ খেতে পারি নে। গন্ধ লাগে।

ইন্দ্রাণী রেগে ওঠেন।

কুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মানুষ খুন করিস, আর সন্দেশ খেতে পারিস নে? খেতেই হবে।

অমূল্য হতভম্ভ হয়ে গেল। অপরাধ করেছে সে গুরুতর, কিন্তু শাস্তির ব্যাপারেও জুলুমবাজি কম হচ্ছে না।

ইন্দ্রাণী বললেন, সন্দেশ না খেলে রক্ষে নেই। নিশ্চয় থানায় পাঠাব। আর যদি কথা শুনিস, এবারটা মাপ করলেও করতে পারি।

থানা-পুলিশের আশঙ্কায় অমূল্যকে বসে পড়তে হল আবার। কষ্ট সংক্ষেপ করার মানসে তিনটে সন্দেশ এক সঙ্গে গালে ফেলে দিল।

খাওয়া দেখে ইন্দ্রাণী খুশি হয়েছেন, মুখের ভাব ও কণ্ঠস্বরে বোঝা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলেন, নাম কি তোর? বাড়ি কোথায়?

অমূল্যর মুখ ভরতি, কথা বলে কি করে?

ইন্দ্রাণী অতিশয় কোমল কণ্ঠে—যেন ক্ষণপূর্বের সে মানুষ নন—পুনরায় বললেন, জবাব দিস নে কেন? কাদের ছেলে তুই বাবা?

অমূল্য চমকে তাকাল ইন্দ্রাণীর দিকে। দলের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘোরে—এ ধরনের বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। গৃহস্থ-বাড়ির বউগিন্নিদের গান শুনিয়ে 'অ্যাক্টো' করে খাতির জমিয়েছে, পরিবর্তে জুটেছে আনিটা-দুয়ানিটা কখন-বা আমসত্ত, পাতিলেবু, কাসুন্দি—এমনি সব উপহার। খালি হাতে ফিরতে হয় নি কোন ক্ষেত্রেই। তবে গুণ জাহির হয়ে পড়ে গাঁয়ের ভিতর একদিন দু-দিন

গাওনা হয়ে যাবার পর। কিন্তু এ তো দেখা যাচ্ছে, গাওনার আগেই গিন্নি তার কদর বুঝে ফেলেছেন।

কাদের ছেলে রে তুই ?

সন্দেশ গলাধঃকরণ করে এক ঢোক জল খেয়ে সগর্ব ভঙ্গিতে অমূল্য বলে, আমি যাত্রাদলের ছেলে—

সে তো জানি। নইলে এমন বারো-ঘাটের জল-খাওয়া চেহারা! চোখের কোণে কালি পড়েছে—

অমূল্য বলে, কালি না হয়ে আলতা হয় কেমন করে বলুন ? চোখের পাতা এক হয় না তো বড় একটা!

সে কি ?

ঘুমোবার সময় কখন ? পালা শেষ হতে অর্ধেক রাত্রি। তারপর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে শুতে শুতে কাক ডেকে ওঠে।

ইন্দ্রাণী বললেন, খেয়ে ঘুমোবি এখন—

আজ্ঞে ?

দালানে বিছানা করা আছে। ঘুমোতে হবে।

ভবতারণ ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, ক'টা টাকা দিতে হবে মা। যাত্রার আসরে থালা পাতবে—সে থালায় গৃহস্থকে সকলের আগে দিতে হয়।

আলমারির দেরাজ থেকে নোটের তাড়া বের করে ইন্দ্রাণী একখানি দিলেন।

ভবতারণ বলেন, নোটে হবে না। তা হলে খাজাঞ্চিবাবুই দিতে পারতেন। রূপোর টাকা লাগবে। ও জিনিস তো বাঘের দুধের মতো অমিল হয়ে উঠেছে।

নোট রেখে দিয়ে ইন্দ্রাণী আর এক দেরাজ থেকে খেরোর থলি বের করলেন। রেজগিতে বোঝাই। কতকগুলো ঢেলে ফেললেন, তার থেকে রূপোর টাকা বাছাই করবার উদ্দেশ্যে।

অমূল্যর দিকে নজর পড়ল। বলবন্তকে বললেন, দালানে খাটের উপর শোবে। নিয়ে যাও।

অমূল্য ঘাড় নাড়ে।

সে কি করে হবে? আসর বসবে এখন। প্যালার টাকা নিয়ে নিচ্ছেন, তা হলে ঘট-পাতা তো হয়ে গেছে। কি বলেন সরকার মশায়, ঢোল-কত্তাল নেমেছে? আমার এখন শুয়ে ঘুমোলে চলবে না।

ইন্দ্রাণী সক্রোধে ডাক দিলেন, বলবন্ত!

বলবন্ত মুখ বাড়াল।

পুরো দু-ঘণ্টা ঘুমোবে। ঘড়ি ধরা। বেলা পড়লে তারপর একে ছেড়ে দেবে।

বলবন্ত লাঠি ঠুকে অমূল্যকে ডাকে, চলো—

মুখ বেজার করে অমূল্য চলল। আপন মনে গজর-গজর করছে, কথার ঠিক হইল তবে কোথায়? বলা হল, মাপ করা হবে। মরি-মরি করে সন্দেশ গিললাম। কলির ধর্ম এইরকম!

কি বিড়-বিড় করছ? বলবন্ত প্রশ্ন করে।

থতমত খেয়ে অমূল্য বলে, পাঠ আওড়াচ্ছি দাদা। আসরে হেরফের হয়ে গেলে তোমরাই তখন তেরিয়া হয়ে উঠবে।

অমূল্যকে নিয়ে বলবন্ত রোয়াক পার হয়ে গেল। ভবতারণ হেসে বলেন, জোর-জবরদস্তি হচ্ছে—দয়ার নিধি নির্মল থাকলে আবার এক ঝুড়ি কথা শোনাত।

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হলেন।

কে বলুন তো ঐ নির্মলটা?

নতুন পাঠশালা খুলেছে। প্রসন্নর পাঠশালা এত জখম হয়েছে তো ওরই জন্যে।

পাঠশালার পণ্ডিত? আমি বলি কোন লাটসাহেবই বা হবে!

ভবতারণ বলেন, মতলব ছিল তাই বটে। এখন বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া।

সুযোগ পেয়ে নালিশটা পেশ করে রাখলেন।

নীলখোলার জঙ্গল কেটে বাংলা-ঘর বেঁধেছে। আমাদেরই এলেকাভুক্ত। মানা করছি, কিন্তু কানে নেয় না।

অমলা বলে, নীলখোলা তো শুনে থাকি ভূতের রাজ্যি।

নিজে হল এক বেহ্মদত্যি। কি রকম ষণ্ডামর্ক তুমি দেখ নি দিদিমণি। মেজাজ দেখিয়ে ফিরে চলে গেল। প্রসাদ নেবার জন্য হাত জড়িয়ে ধরলাম, তা ঝাঁকি মেরে ছাড়িয়ে নিল।

৬

দালানে গদি-পাতা শয্যায় অমূল্য—ঘুমোয় নি, ছটফট করছে। এক-একবার উঠে বসে, লোকের সাড়া পেলে শুয়ে পড়ে আবার তখনই।

অমলা এসে ঢুকল।

কাঁদো-কাঁদো হয়ে অমূল্য বলে, এখন যেতে পারি?

তুমি আমার মাথা কাটিয়েছ, আবার আমার কাছে দরবার করছ?

অমূল্য ব্যাকুল স্বরে বলে, কি আপনারা বলুন দিকি? ননী দিয়ে গড়া? আমার মাথায় আস্ত খান-ইঁট মারেন—কিচ্ছু হবে না। দেখেন, এই দেখেন—

ইঁটের অভাবে পাকা দেয়ালে মাথা ঠুকল কয়েক বার। রাগ করে থাকা চলে না আর এ অবস্থায়। মজা লাগে।

থামো, থামো। পাগলামি কোরো না। মা হুকুম দিয়েছেন দু-ঘণ্টা ঘুমোতে হবে। আমি তো কিছু বলি নি!

দু-ঘণ্টা হয়ে যায় নি? আপনাদের ঘড়ির ঘণ্টা কত লম্বা গো?

হাসি চেপে অমলা বলে, দু-ঘণ্টা হতে পারে—কিন্তু ঘুমোও নি তুমি একটুও। জানলা দিয়ে দেখে দেখে গেছি। বেশ, ঘুমোও এবারে সত্যি সত্যি। যেই এক শ' কুড়ি মিনিট হয়ে যাবে, তোমায় ডেকে তুলে বলবন্তর সঙ্গে আসরে পাঠিয়ে দেবো। ঘুমোও—

অমূল্য বলে, এত নরম বিছানায় ঘুমানো যায়? কত চেষ্টা করলাম, গায়ে মোটে সাড় লাগে না। জলের মধ্যে ভেসে আছি—এমনিধারা মনে হয়।

অমলা হেসে ওঠে।

সহসা অমূল্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিচ্ছি, ঘুম এ জায়গায় হবে না—আমি ঘুমোতে পারব না। থানায় চালান দেবার কথা হচ্ছিল—তাই বরঞ্চ দিন গে যান—

থানা ভাল হবে এখানকার চেয়ে?

দ্বিধাহীন কণ্ঠে অমূল্য জবাব দেয়, অনেক ভাল। না হয় দু-দশটা কিল-ঘুষি দেবে—আর কি করবে?

অমলার আবার মনে হল, এ কি একটা মানুষ যে ক্ষুণ্ণ হবে এর কথায়?

কিল-ঘুষিতে কিছু হয় না বুঝি তোমার?

না—

সহসা গদির উপর পিঠ-টান করে বসে অমূল্য একটা নাচন দিল। সাড় পাওয়া যায় কিনা, নানাভাবে এমনি মাঝে মাঝে পরীক্ষা করছে।

অমলা ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে মজার কথা শোনে।

মারলে লাগে না—তাই কখনো হয়ে থাকে? তুমি চাল দিচ্ছ।

অমূল্য অসহিষ্ণু হয়ে বলে, আপনাদের বলবন্ত না হনুমন্ত—জিজ্ঞাসা করেন গে তার কাছে। কতই তো মারল—তার হাতে লেগেছে, আমার এই কলা! গুতোন খেয়ে খেয়ে গা-হাত পা সমস্ত লোহার। দেখেন, টিপে দেখেন।

হাত বাড়িয়ে দেয় সামনে, অমলা এসে টিপে দেখবে বলে। বলে, ঐ যে ডাল ভেঙে অত উঁচু থেকে পড়ে গেলাম, চোখেই তো দেখতে পেলেন—হল কি তাতে?

অমলা ঘাড় নেড়ে বলে, তাই তোমার ভয়-ডর নেই। বুঝলাম। সত্যি, ঐ অত উঁচু ডালে তুমি উঠেছিলে কেমন করে?

অমূল্য জাঁক করে করে বলে, ও আর কি! দেড়ে দেড়ে তাল-সুপারি-নারকেল—আকাশের মতো উঁচু, ডালপালা নেই যে পায়ের ভর রাখব—কাঠবিড়ালের মতো সেই সব গাছে হেঁটে উঠে যাই তর-তর করে। পেটরোগা লক্ষ্মণ হাজরা—এর-ওর গাছ থেকে চুরি-চামারি করে কত ডাব, তালশাঁস কত দিন পেড়ে খাইয়েছি। তবু শালার মন পেলাম না।

চুরি-চামারি করতে পার ?

না পারি কোনটা ? অ্যাক্টো করা, কুস্তি করা—দাঁড় বাওয়া, গান গাওয়া যে কর্মে লাগিয়ে দেবেন। গান শুনেই তো লক্ষ্মণ এক-কথায় দলে নিয়ে নিল। আজকে বারো ছ্যাচড়ার কান-ভাঙানিতে বিগড়ে গেছে।

অমলা উল্লসিত কণ্ঠে বলে, গান গাইতেও পার তুমি ?

কেমন গাই, আসরে শুনতে পাবেন। রাধিকা গাইবে—তারও শুনবেন। মদ্দা-হাঁসের মতো ফ্যাস-ফেসে গলা—তার মাইনে এগারো টাকা। পূজোর সময় ধুতি-চাদর উপরি। বললাম তো, এ হারামজাদা দলে বিচার নেই।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে অনুনয়ের কণ্ঠে বলে, আপনারা বড়মানুষ। এই নোটের কাঁড়ি, এই টাকার গাদা। কর্জ দেন না কিছু। যা সুদ চান দেবো। এক বছরে শোধবাদ করে যাবো, কড়ার করছি। আমি আর হরিপদ-দা তা হলে নতুন দল খুলে বেরিয়ে পড়ি।

অমলা প্রশ্ন করে, কিসের দল ?

যাত্রার দল—আবার কিসের ?

মহোৎসাহে সে বলতে লাগল, নতুন কায়দার যাত্রা। পালা পছন্দ করে রেখেছি। কে কোন পাঠ নেবে, তা-ও ঠিকঠাক। এক-আসর দু আসর গাইলেই হৈ-হৈ পড়ে যাবে। হুড়-হুড় করে টাকা আসবে। কিছু যন্তোর-পত্তোর আর চুল-গোঁফ-দাড়ির টাকা হলেই পেরাজ্ঞ বসানো যায়। সেইটের আপনি বন্দোবস্ত করে দেন।

করুণ চোখে অমলার দিকে তাকিয়ে আছে। অমলা বলে, আমার সিকি পয়সাও নেই, সমস্ত মা'র। যদি মা'র মন ভেজাতে পারো—

অমূল্য বলে, ভেজাবার কায়দাটা বাতলে দিন তা হলে।

ঘুমোলে মা বড্ড খুশি হন, তুমি যদি দুটো দিন অন্তত পড়ে পড়ে ঘুমোতে পারো এই বিছানায়—

ওরে বাবা !

পারবে না ?

একদম মরে যাবো। ঘুম আর ভাঙবে না তা হলে। আর একটা কিছু বলেন।

অমলা একটু ভাববার ভাণ করে বলে, আর এক হতে পারে। মা গান ভালবাসে। আর তুমি তো বললে—

কথা শেষ করতে দেয় না অমূল্য।

ব্যস, ব্যস! ঠিক আছে। পুলকিত কণ্ঠে বলে, যাবেন তো উনি আসরে? সেইটে দেখবেন, যাতে গান শুনতে গিয়ে বসেন। দু-খানা ডুয়েট আছে আমার আর হরিপদ-দার। মাত করে দেবো না?

হাত জোড় করে অলক্ষ্য উর্ধ্বে সে নমস্কার করল।

মান রাখিস গো বীণাপাণি—

৭

জনারণ্য। তিল-ধারণের জায়গা নেই কোথাও। দেউড়ির ধারে কেরোসিনের টেমি জ্বালিয়ে সারি সারি পান-বিড়ির দোকান বসে গেছে। খদ্দের সামলাতে পারে না তারা।

শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন পালা। অমূল্য গোপিনী। মোট তিন দফা যেতে হবে তাকে আসরে। প্রথম বার গোপবেশী হরিপদর সঙ্গে। গোকুলের পথে পথে দধি-নবনী ফিরি করে বেড়াচ্ছে গোপ ও গোপিনী। নির্জন পথে সহসা রঙদার হয়ে উঠে মন, দ্বৈত গান শুরু হয়—ক্রমশ নাচ। দ্বিতীয় বার অমূল্যর একটিমাত্র কথা—'কি ঘেন্না!' বলে গালে হাত দেওয়া এবং আয়ান ঘোষকে দেখে দ্রুত পলায়ন। পালার শেষ মুখে অমূল্য ও হরিপদর আর একটা গান আছে। আয়ান ঘোষ ধরতে এসে যখন দেখল, কৃষ্ণ নয়—কালী, কৃষ্ণ পলকের মধ্যে কালীমূর্তি ধরেছেন—গোপ-গোপিনী গান গেয়ে বিদ্রূপ করছে বেচারা আয়ানকে।

দীর্ঘ গোঁফ ও ঘুঙুর পায়ে হরিপদ তৈরি। কাঁধে বাঁক—দু-প্রান্তে সিকার

ভিতর দুটো কেলে-হাঁড়ি। অমূল্যকে তাগাদা দেয়, হল তোর? জটিলা-কুটিলার কোন্দল লেগে গেছে। এরই পর তো!

অমূল্য মেয়েলোক সাজল, সময় কিছু বেশি লেগেছে সেজন্য। আর সব হয়ে গেছে। মাথায় পরচুলা বসিয়ে দু-গাছা খাড়ু দু-হাতে ঢুকিয়ে কাঁখে দুধের কেঁড়ে নিয়ে সাজঘরের ভিতরেই নাচের এক পাক দিয়ে হরিপদর পিছু পিছু বেরিয়ে পড়ল।

গম-গম করছে আসর। ভারি জমেছে। দধি-নবনী ফিরি করতে করতে সেই মোক্ষম অবস্থা এসে গেল। কেসে গলা সাফ করে হরিপদ গান ধরল—

মুচকি হেসে ও ললিতে হানছ কেন নয়না?

অমূল্যর জবাব—

প্রাণ-ময়না, ওরে ও প্রাণ-ময়না,
ধিকি-ধিকি তুষের আগুন—
মন যে সামাল রয় না—

চারিদিকে উল্লাসধ্বনি উঠে—বাহবা, বাহবা! ঝনাঝন পয়সা, সিকি, দুয়ানি পড়ছে প্যালার থালায়। গোপ-গোপিনীর কণ্ঠ ও পদদাপ আরও জোরালো হল সমজদার শ্রোতা পেয়ে। পুলকিত লক্ষ্মণ চেঁচিয়ে উৎসাহ দেয়, ঘুরে ফিরে বেটারা, ঘুরে ফিরে—

আসরের সর্বত্র প্রদক্ষিণ করে, সকল দিকে মুখ ফিরিয়ে তারা নাচছে। মেয়েরা বসেছে কাছারি-দালানের বারান্দায়—এবার সেইদিকে চলল। সীতানাথ বেহালাদার পিছু পিছু দ্রুত লয়ে বেহালা বাজাচ্ছে। প্যালার থালা হাতে লক্ষ্মণ অগ্রবর্তী।

মুখ রাখিস মা বীণাপাণি!

গানের মধ্যেই অমূল্য উদ্দেশে একবার নমস্কার করে। হরিপদকে বলেছে সব কথা। ঐ ইন্দ্রাণী মেয়েদের মধ্যে আছেন। গতিক যা বোঝা যাচ্ছে, এদিকটাও মাত হবে নির্বাৎ। আসর মাতাবার যত কল-কৌশল জানা আছে, সমস্ত প্রয়োগ করছে প্রাণপাত প্রয়াসে।

মেয়েরা খিল-খিল করে হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।

আ মরণ! ছুঁড়িটা চোখ মারছে কেমন ধারা দেখ্—

ঝানু লক্ষণ ভাব বুঝে প্যালার থালা তাড়াতাড়ি এগিয়ে ধরে মেয়ে-বউদের ঐখানে। বেশ পয়সাকড়ি পড়ছে।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত। ইন্দ্রাণী মারমুখি হয়ে উঠলেন।

ভদ্রলোকের বাড়ি না কি এটা? দূর - দূর হয়ে যা এখান থেকে। বলবন্ত কান মলে বের করে দিয়ে আয় এ দুটোকে।

স্থান-কাল ভুলে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মুখের উপর যেন অগ্নিকাণ্ড। অমূল্য হরিপদ নির্বাক হতভম্ব হয়ে ছিল মুহূর্তকাল। তারপর সুড়-সুড় করে সাজঘরে পালাল।

ছিঃ মা—

হাত ধরে অমলা টেনে বসাল। খালি সে বকুনি খায় না, মাকেও বকে সময় সময়। ফিসফিস করে বলে, পাঁচ গায়ের লোক গান শুনতে এসেছে, সকলে তাকাচ্ছে। লজ্জা করে না তোমার?

মেয়ের কথায় ইন্দ্রাণী যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। অমলা শঙ্কিত হল—তার শান্ত সহিষ্ণু মা কখনো এমন ছিলেন না। মুকুল মারা যাবার পর এই অবস্থা দেখা দিয়েছে। নিম্নকণ্ঠে বোঝায়, ওদের কি দোষ বলো? যেমন যেমন পালায় আছে, তাই ওরা করবে তো! বাড়ির মধ্যে চলো মা। কাল মোটে ঘুমোও নি—শুতে যাবে এবার।

ভবতারণ ছুটে এসেছিলেন হন্তদন্ত হয়ে, কি একটা টিপ্পনীও কাটতে যাচ্ছিলেন। ইন্দ্রাণী মেয়েকে বললেন, ঠিক বলেছিস—ওদের কি দোষ?

ভবতারণকে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, অধিকারীকে ডেকে দেবেন তো আমার কাছে। দুধের ছেলেদের দিয়ে ইতরামি করাচ্ছে, তাকে সমঝে দেওয়া দরকার।

সাজঘরে এসে অমূল্য-হরিপদ বেকুবের মতো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

হল কি বল তো?

ভেবে তারা কূলকিনারা পায় না। অমূল্য বলে, তোমার তাল কেটে যাচ্ছিল হরিপদ-দা, তাই চটেছে।

তাল কেটেছে না আরো-কিছু! হরিপদ সবেগে ঘাড় নাড়ে। একটু-আধটু হেরফের হয়েও থাকে যদি, মেয়েমানুষ জাত, বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই— সে মার-প্যাঁচ ওরা ধরতে পারে ?

অমূল্যর চোখ ফেটে জল বেরুবার মতো। দলের এতগুলো লোক গ্রামে গ্রামে একসঙ্গে পালা গেয়ে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে একজন কেউ সমব্যথী নেই। সবাই মুখ টিপে হাসছে—কারো দিকে না তাকিয়ে অমূল্য বলে দিতে পারে। নিশ্বাস ফেলে সে বলল, কপাল রে দাদা, কপাল ছাড়া পথ নেই। ভেবেছিলাম গানে পরিতুষ্ট করে টাকা চাইব।

হরিপদ বলে, টাকার গরম— বুঝতে পারলি ? বিনি দোষে আমাদের হেনস্তা করে বড়মানুষি দেখাল। পাঁচু-অধর এসেই গাঁ টহল দিতে বেরিয়েছিল তো— তারাই আমাদের নামে কোটনামি করে এসেছে। ঠিক তারা—

গর্জন শুনে চমকে তাকাল।

ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে ফিরে লক্ষ্মণ-সাজঘরে ঢুকছে। অমূল্যর মাথার চুল ও হরিপদর গোঁফ এক টানে খুলে নিল।

বরখাস্ত করলাম তোদের দুটোকে। দূর হয়ে যা।

কিন্তু আদেশমাত্র দূর হয়ে যাবার পাত্র হরিপদ নয়। আজকেই ভাত খাবার সময় একবার দেখা গেছে। গরুড়-পক্ষীর মতো সে হাত জোড় করল লক্ষ্মণের সামনে।

একটু আশা আছে এখনো—শেষ গানখানা বিশেষ রকমের চটকদার। ঐ গানে যদি ঘায়েল হয়! অমূল্য কাতর হয়ে বলে, ধৈর্য ধরেন—দেখেন না কি হয়? গান তো আরও আছে। হরিপদ-দার সঙ্গে একটু সড়গড় করে নিই ততক্ষণ।

লক্ষ্মণ চোখ পাকিয়ে বলে, দলের মুখে চুণ-কালি দিলি, আর তোদের আসরে ঢুকতে দেবো? ওসব গান হবে না এ নচ্ছার আসরে। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে পাঁচু গিয়ে শুধু 'কি ঘেন্না'—বলে চলে আসবে। ব্যস - ঐ পর্যন্ত।

পাঁচুকে ডেকে বলল, নিয়ে যা এ সমস্ত।

পাঁচু দাঁত মেলে হাসতে হাসতে বিজয়দর্পে গোঁফ-চুল নিয়ে গেল। অমূল্যর ইচ্ছা করে, বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে হাসি সমেত ঐ দু-পাটি দাঁত উপড়ে ফেলে দেয়।

বলবন্ত এমনি সময় এসে মাটিতে লাঠি ঠুকল।

ছোঁড়াটা কোথা? তলব পড়েছে। এক্ষুনি চলো।

৮

সোনাকুঠুরির দরজায় ইন্দ্রাণী দাঁড়িয়ে। অমূল্য বলবন্তর সঙ্গে বলির পাঁঠার মতো অনিচ্ছুক পায়ে আসছে। ইন্দ্রাণী ডাকলেন, আয়—

আরও কাছে এলে হাত ধরে ফেললেন। ভর্ৎসনার সুরে মৃদু কণ্ঠে বললেন, লজ্জা করে না দশজনের মধ্যে ঐ রকম অসভ্য কথা বলতে?

অমূল্য বলে, আমি তো কিছু বলি নি ঠাকরুন।

বলিস নি? মিথ্যে বলে দোষ ঢাকছিস? তুই আর গোঁফওয়ালাটা দু-জনেই বলেছিস। শাড়ি পরে রঙ মেখে ভাবলি, আমি চিনতে পারব না।

অমূল্য অসহায় ভাবে বলে, সে তো গানের কথা। নিজে আমরা কি বললাম, আমাদের দোষ হল কিসে? যে রকম শেখাবে, তা-ই তো গাইতে হবে আসরে গিয়ে?

তোকে যদি শেখায় যে, তুই হনুমান—তাই গাইবি?

অমূল্য বলে, আলবৎ। শুধু আমি কেন—পাঠে যদি বলে দেয়, আমার বাপ-মা চৌদ্দপুরুষ ধরে সবাই হনুমান, বাপের সুপুত্তুর হয়ে সেই কথা বলতে হবে আসরে। হেরফের হলে সপাসপ বেত মারবে সাজঘরে এলে। চাকরি সঙ্গে সঙ্গে খতম। হেঁ হেঁ—যাত্রার দল এর নাম, চালাকি নয়।

কথা শুনে গম্ভীর হয়ে থাকা দায়। অনেক কষ্টে হাসি চেপে ইন্দ্রাণী রায় দিলেন, দলে থাকতে পারবি নে আর তুই।

তবে কোথায় থাকব ?

সে আমি দেখব। তোর কিছু ভাবতে হবে না।

অমূল্য আলো দেখতে পায় সহসা। বিষম ভয় হয়েছিল—সে সব তবে কিছু নয়! তার মতো গুণী ছেলে সামান্য গোপিনী সাজে, ঠাকরুনের রাগ সম্ভবত এই কারণেই। পুলকিত স্বরে সে বলল, তাই হবে। আপনি যদি ভরসা দেন।

বলছিই তো আমি। জিনিষপত্র যা আছে, নিয়ে চলে আয়।

বেশ!

বেশ নয়, এখনই—

অমূল্য ইতস্তত করে।

দশুই তারিখে মাইনে দেয়। সেটা ছাড়ব কেন? আর আটটা দিন মাত্তোর। এ ক'টা দিন চুপচাপ থেকে যাই।

অধীর কণ্ঠে ইন্দ্রাণী বলেন, একটা দিন—একটা মুহূর্তও আর নয়।

ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে একগাল হাসি হেসে অমূল্য বলে, যে আজ্ঞে। দিদিমণি তবে আপনাকে বলেছেন সমস্ত ?

অমলা? সে কি বলবে? তার বলাবলিতে কি আসে যায়? আমি বলছি, তোর যা দরকার সমস্ত পাবি। আমি ভার নিচ্ছি—কোন-কিছুর অসুবিধা হবে না।

তবে আর কি! খোশামুদি ভাবে অমূল্য বলে, দরকার সামান্যই ঠাকরুন। আপনার তো হাত ঝাড়লে পর্বত! হরিপদ-দা বলে, ষাট-সত্তর হলেই—

ইন্দ্রাণী বললেন, ষাট-সত্তর হোক আর ছ'শ সাতশ হোক, টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে—

অমূল্য অতএব মনস্থির করে ফেলল।

ঐ পাজির পা-ঝাড়া দলে আমি থাকব না, আগেই ঠিক করেছিলাম। বাঁচা গেল।

বিষম স্ফূর্তিতে সে লক্ষ্মণের কাছে চলল।

হরিপদর সঙ্গে ইতিমধ্যে ফয়শালা হয়ে গেছে। হরিপদ কায়দা জানে, হাত ছেড়ে শেষটা পা ধরেছিল এঁটে। লোকজন হাসছে, হাসুক গে। একজনে বেকায়দায় পড়লে দশে মজা দেখে, এটা জগতের রীতি। ওদের আবার যেদিন এমনি চাঁকরি নিয়ে টান পড়বে, হরিপদও হাসবে প্রচুর। এই রকম বন্দী হয়ে পড়ায় লক্ষ্মণ দস্তুরমতো বিপন্ন বোধ করছিল। ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও দেখল খানিকটা। অগত্যা ক্ষমা করে বলে, আচ্ছা হল তাই। পা ছাড়্, আসরে যাই। মন দিয়ে কাজকর্ম করবি। খাওয়া নিয়ে কোন কথা বারদিগর জিভের ডগায় না আসে! বুঝলি তো?

মুক্তি পেয়ে দ্রুত-পায়ে বেরুচ্ছে, দেখল অমূল্যকে।

তুই ঘুরঘুর করিস কেন? ট্যাঙস-ট্যাঙস বুলি—আসরে উদিকে ডাঙস খাস। তোকে কিছুতে রাখব না—দলসুদ্ধ খারাপ করবি।

অমূল্য বলে, নুড়ো জ্বেলে দি দলের মুখে—

বিস্ময়ে লক্ষ্মণ পাথর হয়ে গেল। মুখের উপর এত বড় কথা বলবার তাকৎ রাখে, মাথা খারাপ হয়ে যায় নি তো ছোঁড়ার?

অমূল্য বলে, মাইনে-পত্তোর চুকিয়ে দাও—

লক্ষ্মণ এতক্ষণে এবার কথা বলবার শক্তি পেল।

বেরো, এখুনি বেরিয়ে যা—

যাবই তো! এক মাসের মাইনে আমার পাওনা—

রাগের মধ্যেও লক্ষ্মণ হিসাব-জ্ঞান হারায় না। বলে, পাঁচ টাকা মাইনে, তা ফাইন করে দিলাম পাঁচ টাকা। সে-ও তো কম হল—দশের মধ্যে লক্ষ্মণ-যাত্রা পার্টির মুখ পুড়িয়েছিস।

ময়ূর খোদাই-করা শখের চিরুনি, হাত-আয়না, গন্ধ-তেল ও আধ-ছেঁড়া দ্বিতীয় ধুতিখানা গামছা দিয়ে পুঁটুলি বাঁধা। লক্ষ্মণ বাঁ-হাত দিয়ে ছুঁড়ে দিল, দাওয়া ছাড়িয়ে পুঁটুলি উঠানে ধূলোর মধ্যে পড়ল। কটমট তাকিয়ে অমূল্য তুলে নিল সেটা।

জনতার পাশ ক[illegible]য়ে যাচ্ছে। ঐ আলোকোজ্জ্বল আসরে শত শত বিমুগ্ধ

দৃষ্টির মাঝখানে গিয়ে দাড়ানো আর হল না। তা বলে সে দমছে না। আজকে না হল—দু-চার মাসের ভিতর তো দাঁড়াবেই। দস্তার মেডেলের মালা গড়িয়ে গলায় ঝুলাবে, ঝিকমিক করবে মেডেল আলো ঠিকরে পড়ে। দলের অধিকারী তখন সে—গোপিনী সেজে নাচে না।

নমস্তে বীণাবাদিনী, যা কপাল—কূলে এসে ভরা-ডুবি না হয়!

ভেবেছিল, সবাই গানে মত্ত—চুপিসারে সরে পড়বে। কিন্তু তা হল না, জামরুল-তলায় অপেক্ষায় ছিল ক'জন। হরিপদ তো আছেই—আশ্চর্য ব্যাপার, অধরও এদের মধ্যে।

হরিপদ সদুঃখে বলে, তবু একটা আশ্রয় ছিল। কোথায় দাঁড়াবি এখন?

একজনে সমর্থন করে, বেশ করেছে। মুখের গালমন্দে আর কি হবে? ঘুষি ঝেড়ে দিতে পারত লক্ষ্মণের চোয়ালে! তা হলে বুঝতাম।

আর একটা ছোকরা বলে, তুই তুখড় আছিস। কোথায় কি দাঁও জুটিয়েছিস! কথাটা ভাঙ না একটু ভাই—

কাঁধে হাত দিয়ে ঘনিষ্ঠতা করে।

বলবি নে কি ব্যাপার?

অমূল্য বলে, দল খুলব।

সবিস্ময়ে অধর বলে, কিসের দল?

যাত্রার দল—আবার কিসের? কলকাতায় বউ-মাস্টারের দলের কথা শুনেছিস—সেই ধাঁচে হবে। জুড়ি থাকবে না।

সমস্ত আয়োজন সমাধা হয়ে গেছে, এমনি নিশ্চিন্ততার সঙ্গে অমূল্য বলল।

বিশ্বাস করা কঠিন বটে—তবে কার অদৃষ্ট কি ভাবে খুলে যায়, কিছুই বলা যায় না। একটু-কিছু হয়েছে নিশ্চয়। নইলে লক্ষ্মণ হাজরার মুখের উপর শক্ত কথা বলার সাহস পেল কোথায়?

খুলে বল ভাই, কে দল করছে?

আমি আছি। হরিপদ-দা থাকবে। আর কাকে কাকে রাখা যায়, বিবেচনা করতে হবে।

সে কথা-হচ্ছে না। টাকা যোগাচ্ছে কে?

রহস্যময় হাসি হেসে অমূল্য বলে, তারও লোক আছে বই কি!

বলেই হন-হন করে চলল। আরও এসে সব জুটছে—আর দাঁড়ানো ঠিক হবে না।

ভুলিস নে কিন্তু—

গলা শুনে অমূল্য পিছন ফিরে চোখ তুলে দেখে। অধর বলছে। ইচ্ছে হল জবাব দেয়, এত শত্রুতা সেধেছিস, ভুলব কেমন করে তোদের? কিন্তু, না—করুণা হল অকস্মাৎ—দল করতে পারলে এদেরও টেনে নেবে সেই দলে। যে যে আসতে চায়, সবাইকে নেবে।

৯

দুপুরের মতোই আহারের রাজসূয় আয়োজন এবং আহারান্তে দালানের খাট-গদি। কিন্তু ঘুম আসে না। নরম বিছানার দরুন অসুবিধা আছেই—তা ছাড়া নানা রঙিন ভাবনায় মাথা গরম হয়ে উঠছে। আসরে গান-অ্যাক্টো পুরা দমে এখনো চলছে, কিন্তু এ নিয়ে তিলমাত্র আর ক্ষোভ নেই মনে। বরঞ্চ লজ্জা লাগছে—কি করে এত হেনস্তা সয়ে লক্ষণের দলে ছিল সে এতদিন।

পায়ের শব্দে চোখ মেলল। ইন্দ্রাণী এসেছেন—হাতে জলের কুঁজো ও কাচের গ্লাস। জলেরই দরকার এখন—মাথায় থাবড়াবে, তাতে যদি ঘুম পায়! উনি কি হাত গুণে সমস্ত জানতে পারেন?

ইন্দ্রাণী কুঁজোর মুখে গ্লাস ঢাকা দিয়ে টিপয়ের উপর রাখলেন। হারিকেনের জোর কমিয়ে দিলেন—অমূল্যর চোখে না লাগে। আরও সাবধানতার জন্য একটা পুরানো পোস্টকার্ড গুঁজে দিলেন চিমনির গায়ে।

অমূল্য দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। ইন্দ্রাণী বললেন, আর কি দরকার হবে, বল্—

কিচ্ছু না—

দরজায় খিল দিয়ে ঘুমিয়ে পড় এবার। আমি যাচ্ছি।

আজ্ঞে—

ইন্দ্রাণী ঘরের চারিদিকে আবার নজর করে দেখেন।

মশা হয় তো মশারি ফেলে দিবি। কেমন?

যে আজ্ঞে—

একা একা ভয় করবে না তো রে?

এ হেন উক্তির পর অমূল্যর শিষ্টতা বজায় রাখা দায় হয়ে ওঠে। ফিক করে সে হাসল।

ভয়? ভয় আবার কিসের?

না করলেই ভাল। ইন্দ্রাণীও হাসলেন। বললেন, তোর বয়সের ছেলেমেয়েরা মিছামিছি ভয় পায় কিনা! চোরের ভয়, সাপের ভয়, ভূতের ভয়—

অমূল্য বলে, আমরাই হলাম বলে এক এক ভূত—ভূতে কি করবে আমাদের?

ইন্দ্রাণী ভর্ৎসনা করে বললেন, ছিঃ! ওকথা বলতে নেই। মানুষ তুমি—ও সব হতে যাবে কেন? নিজেকে ছোট ভাবতে নেই।

সহসা নজর পড়ল তার মাথার দিকে।

খুব তো টেড়ির বাহার! জট বেঁধে গেছে ওদিকে পিছনের চুলে।

ঠাহর করে দেখে শিউরে উঠলেন তিনি। ময়লা নয়—রক্ত জমাট হয়ে আছে চুলের মধ্যে।

ও কি রে?

অমূল্য হাত বুলিয়ে দেখে বলে, কিছু না। সেই তখন পড়ে গিয়েছিলাম কিনা গাছ থেকে—

আচ্ছা ছেলে তো! এত রক্ত পড়েছে, কাউকে কিছু বলিস নি?

তাড়াতাড়ি তুলা-আয়োডিন নিয়ে এলেন। আয়োডিন ঢেলে দিলেন কাটা জায়গার উপর। অমূল্য উ-হু-হু করে ওঠে।

এতখানি কেটেছে, ঘা আলগা রয়েছে, তা বলে গ্রাহ্য নেই। কি ডাকাত ছেলে রে বাপ্!

অমূল্য বলে, আয়েশ করে শুয়েছিলাম। কি ঘোড়ার ডিম লাগালেন, বলেন তো! বিষম জ্বালা করছে—

ইন্দ্রাণী বললেন, জ্বালা এক্ষুনি যাবে। ফুঁ দিচ্ছি···আচ্ছা, হাওয়া করছি— হাত-পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। অমূল্য খাট থেকে নেমে পড়ল।

ইন্দ্রাণী বলেন, অমন করিস কেন? তোর মা থাকলেও ওষুধ দিতেন, হাওয়া করতেন এই রকম।

বিরক্ত-বিব্রত অমূল্য বলে, মা নেই। কেউ আমায় হাওয়া করে নি কোন পুরুষে।

তা বুঝেছি। মা থাকলে কি দুধের ছেলেকে এমন পথে পথে ছেড়ে দেয়?

পাশাপাশি মুকুলের কথা মনে পড়ে। কত আদরের ছেলে! কঠিন মাটির উপর হেঁটে পায়ে ব্যথা লাগবে—তা-ও বোধ হয় ইন্দ্রাণী চাইতেন না। এত যত্নেও কিন্তু ধরে রাখা গেল না তাকে।

উদ্গত অশ্রু রোধ করে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলেন, কে আছে তোর?

কেউ নেই—

মা না থাক, বাবা কি ভাই-বোন—

দাঁত বের করে হাসতে হাসতে অমূল্য বলে, কোন কুলে কেউ নেই ঠাকরুন। মা মরেছে তিন মাস বয়সে। বাবাকে ও-বছর সাপে ঠুকে দিল। তার পরেই লক্ষ্মণের দলে জুটে পড়লাম। বাপ থাকলে—ওরে সর্বনাশ! ঠেঙানি দিয়ে ভূত ভাগাত।

বাপ-মা মরে যাওয়ায় বড় রক্ষা পেয়েছে, এমনি তার ভাবখানা।

ইন্দ্রাণী বললেন, আমার কাছে থাকবি এখন থেকে। কোথাও যেতে পারবি নে—বুঝলি?

অমূল্য স্তম্ভিত। হঠাৎ কথা বেরোয় না।

এ কি বলেন আপনি? আপনার কথার উপর সোনার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এলাম। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া ধর্মে সইবে না।

ইন্দ্রাণী বলেন, কখন গাছে তুললাম, আর মই বা কাড়ছি কেমন করে?

বললেন যে টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না, এখন আবার উল্টোপাল্টা কথা বলেন।

টাকাকড়ি দেবো না—বলছি নাকি আমি?

কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে কি হবে? টাকাকড়ি নিয়ে কোন্ চতুর্ভুজ হব?

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী খাটের পাশে বসে পড়লেন। বললেন, ঘরের ছেলের মতো থাকবি আমার কাছে। ভাল হবি, মানুষের মতো মানুষ হবি।

কথাবার্তার ধরনে অমূল্য ক্রমশ মুষড়ে পড়ছে।

এখন বুঝি মন্দ আমি? তাই ভাল হতে বলছেন। বুঝেছি, অধর চুকলি কেটে গেছে—আর তাই আপনি ধরে বসে আছেন। শয়তানটা যেন ফেউ লেগে আছে আমার পিছনে।

ইন্দ্রাণী বললেন, অধর-টধর জানি নে। বলছি আমি—লেখাপড়া করতে হবে তোকে। ইস্কুলে যাবি, কলেজে যাবি—

অমূল্য হাঁ-হাঁ করে ওঠে।

ও মতলব ছাড়ুন ঠাকরুন। কিচ্ছু হবে না—মাথায় আমার গোবর-পোরা।

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, দেখাই যাক। বাংলা পড়তে পারিস?

পড়তে যদি পারতাম, নিদেনপক্ষে বলরামের পাঠ ঠেকায় কে? পড়িয়ে দিতে হয়—তাই তো বড় পাঠ দিতে চায় না।

প্রসন্ন পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালায় যাবি সকাল থেকে।...না—কাল তো বন্ধ, পড়া পরশু থেকে শুরু হবে।

বলে চলে যাচ্ছিলেন। অমূল্য জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বললেন—না ভয় দেখাচ্ছেন মিছিমিছি?

ইন্দ্রাণী হাসতে লাগলেন।

গোড়া থেকেই এই মতলব?

ইন্দ্রাণী বললেন, আপাতত এখানে পড়তে লাগ। শিগ্‌গিরই আমরা কলকাতা যাব—সেখানে ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো।

চলে গেলেন ইন্দ্রাণী। ভয়ে অমূল্যর সর্বদেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। দল করবার উৎসাহে হিতাহিত না ভেবে এ কোন্ ফাঁদে এসে ঢুকে পড়েছে? বলে কি ঠাকরুন? আর এই তাঁতিহাটই নয়—কলকাতা আছে এর উপর। শহর কলকাতা। কলকাতা জায়গাটা দেখা নেই অমূল্যর, গল্প শুনেছে। শহর তো ভালই—কিন্তু না মাঠ-ঘাট, না গাঙ-খাল। কেবলই দালান-কোঠা আর মানুষ। মাটি নাকি কিনতে হয় পয়সা দিয়ে। তবে তো ইটের খাঁচা বললেই হয়। ঐ খাঁচায় নিয়ে তুললে একদিনেই সে মারা পড়বে।

কপালটাই তার এমনি! আশা করে এক রকম, হয়ে দাঁড়ায় উল্টা।

১০

উৎসব-ক্লান্ত বাড়ি নিশিরাত্রে বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে। অমূল্য উঠল।

সন্তর্পণে দরজা খুলে মুহূর্তকাল স্থির হয়ে দাঁড়ায়। না—কোন দিকে সাড়া-শব্দ নেই। দ্রুত সে পেট-কাটা ঘরের দিকে চলল।

হরিপদ আর সে দাওয়ার প্রান্তে নিরিবিলি একটা জায়গা পছন্দ করে নিয়েছিল। তার রাজশয্যা জুটেছে—ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ি দিয়ে মাদুরে গড়াতে হয় নি হরিপদর মতো। কিন্তু এ ছিল অনেক ভাল। হরিপদ অকাতরে ঘুমুচ্ছে—ঘুমোবে না কেন? ঠাকরুনের নজরে পড়ে নি তো সে?

গায়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলল। কি বলতে যাচ্ছিল হরিপদ—মুখে হাত চাপা দিয়ে নিষেধ করল। তারার ক্ষীণ আলোয় নিঃশব্দে দু-জনে চলল।

জামরুল-তলায় অন্ধকারে অমূল্য হাতড়াচ্ছে।

হরিপদর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নেই। রাত দুপুরে তাকে ডেকে তুলে এ কি রহস্যময় আচরণ অমূল্যর!

কি খুঁজিস?

উনুন খুঁড়তে শাবল দিয়েছিল, কোথায় সেটা?

হরিপদ বলে, এখানে পড়ে ছিল। সীতেনাথ ছাঁচতলায় নিয়ে রেখেছে।

নিয়ে এস দাদা চট করে।

শাবল কি হবে?

অমূল্য বলে, আস্তে—

চাঁদ অনেকক্ষণ ডুবে গেছে। শাবল নিয়ে দু-জনে বাড়ির পিছনে গেল।

ফিসফিস করে হরিপদ জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার—বল্ না ভাই, কোথায় যাচ্ছিস?

টাকার জোগাড়ে। দল করতে হবে না?

জানলার পিছনে লেবু-গাছ। ডাল সরিয়ে দেয়ালের ধারে এল। জানলার নিচের অংশ দেখিয়ে অমূল্য বলে, এইখানটা খোঁড়। খুব নরম হাতে—আওয়াজ না হয়। তুমি খোঁড় খানিকটা, তারপর আমি লাগব।

চারিদিক এক নজর দেখে নিয়ে হরিপদ বলে, সিঁদ?

সিঁদ কি এর নাম? পুরানো বাড়ির পচা ইট—ঘা না দিতেই গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাবে।

কার্যকালে দেখা গেল, খুব সোজা ব্যাপার নয়। অনেক চেষ্টায় এক-খানা ইট খুলে ফেলে হরিপদ বলল, ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। ধরা পড়লে সর্বনাশ।

অমূল্য সাহস দেয়, আট-ঘাট না জেনে অমূল্যচন্দোর কাজে নামেন না। দেখেছ তো বরাবর!

তা দেখে আসছে বটে! হরিপদ নব উদ্যমে কাজে লাগে।

অমূল্য চুপি চুপি বলে, এই যে জানলা—এর লাগোয়া আলমারি। আলমারির দেরাজ ভর্তি টাকা আর নোট। একটা কেন—পাঁচটা দল গড়েও টাকা ফুরোবে না। ঘরে কেউ নেই—দালানে ডবল-গদিতে শুয়েছিলাম—নজর ছিল আমার এই দিকে।

চাপা হাসি হাসতে লাগল অমূল্য।

হরিপদ বলে, সুখে থাকতে তোকে ভূতে কিলোয় অমূল্য। ঠাকরুনের নজরে পড়েছিস—দু-দিন সবুর করলে কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে যেতিস হয় তো—

অমূল্যকে সত্যই সে ভালবাসে। বলে, আমি বলি কি—ফিরে যাই চল্ গিয়ে আবার ভালমানুষ হয়ে শুইগে। কপালে থাকলে আপোষেই ঠাকরুন টাকা দিয়ে দেবেন।

অমূল্য নিশ্বাস ফেলে বলে, ভেবেছিলাম তো তাই। সেই আশায় তল্পিতল্পা নিয়ে উঠলাম। কিন্তু শয়তানি মতলব খাটাচ্ছে। দল-টল কিচ্ছু নয়—ইস্কুলে পড়াবে।…যা পাওয়া যায়, হাত্ড়ে নিয়ে রাতারাতি সরে পড়ি রে দাদা! নইলে স্রেফ মেরে ফেলবে।

মাপসই গর্ত হয়েছে। অমূল্য ফিস-ফিস করে বলে, আমার জানা আছে কোথায় কি—আমি ঢুকি। জানলার কপাট খুলে মাল পাচার করব। তুমি দাঁড়াও ঐখানটায়।

হরিপদ বাধা দিল। বহুদর্শী সে—এসব কাজের অনেক অভিজ্ঞতা। লাউ-মাচা অনতিদূরে। কালি-পড়া বাতিল এক খোলা-হাঁড়ি মাচার গায়ে বাঁশের খুঁটিতে টাঙানো। মন্দ লোকের কু-দৃষ্টিতে গাছের ফলন হয় না, গাছ মরে অনেক সময়—কেলে-হাঁড়ি টাঙিয়ে রাখলে দোষ-খণ্ডন হয়ে যায়। ফসলের ক্ষেতে ও লাউ-কুমড়ার মাচায় হামেশাই এইরকম হাঁড়ি টাঙানো দেখতে পাবে।

হরিপদ বলে, রোসো—

খোলা-হাঁড়ি নামিয়ে এনে শাবলের মাথায় চড়াল। আস্তে আস্তে সেটা সিঁদের মুখে ঢোকাচ্ছে। যেন চোর ঢুকছে ঘরের মধ্যে। সিঁদেল-চুরির রীতি এ সমস্ত। চুরিতে যারা চুল পাকিয়ে ফেলল, তারাও এইরকম করে থাকে। হরিপদ করেছিল—তাই রক্ষা। বলবন্তর সোল্লাস চিৎকার শোনা গেল ঘরের মধ্যে, তবে রে বেটাচ্ছেলে!

চোরের মাথা মনে করে বলবন্ত প্রচণ্ড শক্তিতে হাঁড়ি চেপে ধরেছে। বেকুব হয়ে সজোরে আছড়ে হাঁড়ি চুরমার করে ভাঙল। ভবতারণ লাঠি তুলেছিলেন। দরজা খুলে লাঠি কাঁধে তিনি কানাচের দিকে ছুটলেন। বলবন্তও ছুটেছে।

চোর! চোর!

চেঁচামেচিতে সবাই জেগে উঠল, সোরগোল পড়ে গেল। অনেক আলো ও

লাঠি-সড়কি। একটা টোটার দোনলা বন্দুকও আছে, ম্যানেজার হরিতোষ ব্যবহার করেন। আমিন মনোহর সেটা বের করে রোয়াকে এসে দাঁড়াল। দেওড় করবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু কিসে কি হবে শেষটায়—সাত-পাঁচ ভেবে নিরস্ত হয়েছে।

দেউড়ির বাইরে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়েছে কতক—চারদিক ঘিরে খোঁজ করছে, জঙ্গল পিটছে লাঠি দিয়ে···

ভোঁ করে দৌড় দিয়েছিল অমূল্য আর হরিপদ। কিন্তু বাগান ছেড়ে ফাঁকায় বেরুবার উপায় নেই। নজরে পড়ে যাবে। টোপা-শেওলায় আচ্ছন্ন খিড়কির পুকুর—জল বরফের মতো ঠাণ্ডা। প্রাণের দায়ে হরিপদ ঐ পুকুরে গলা অবধি ডুবিয়ে চুপচাপ আছে। লোকজন কাছাকাছি গিয়ে পড়লে ডুব দিয়ে দম বন্ধ করে জলতলে থাকছে। অমূল্য বেপরোয়া—অত দুর্ভোগ ভুগবার পাত্র নয়। সবাই বেরিয়েছে, টুক করে এক সময় সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকতে যখন পেরেছে—আর ভাবনা করে না। এখন কেউ দেখে ফেললে, চোর ধরতে সে-ও বেরিয়েছে—এমনি ভাব দেখাবে। কিন্তু তার প্রয়োজন হল না—দেখা হল না কারও সঙ্গে। দালানে ঢুকে পড়ে দরজায় খিল এঁটে সে শুয়ে পড়ল। ফাঁড়াটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল তবে!

যারা খোঁজাখুঁজি করছিল, দুয়ে-একে ফিরছে। রোয়াকের ওধারে গুলতানি চলছে, চোর সম্পর্কে নানারকম অনুমান ও মন্তব্য করছে যার যেমন খুশি।

অমূল্যর মনে হল, এমন অবস্থায় নিঃসাড় হয়ে ঘুমিয়ে থাকলে তার উপরেও সন্দেহ পড়তে পারে। চারদিকে এত সোরগোল, একটা প্রাণীর উঠতে বাকি নেই। তার কানে কিছু যাচ্ছে না—এ কিছুতে হতে পারে না। সকলের মধ্যে পড়ে তারও কিছু হৈ-চৈ করা উচিত।

দরজা খুলে প্রথমেই অমলার সঙ্গে দেখা। অমলা সংবাদ দিল, চোর এসেছিল এই এখনি—

বিস্মিত অমূল্য চোখ মুছতে মুছতে বলে, সে কি? কোথায় এল চোর?

দেখগে ঐ ঘরে—

হায় ভগবান, এ কি কাণ্ড করে বসেছে! অন্ধকারে ঠাহর হয় নি, ঘর ভুল করেছে। সোনাকুঠুরি এটা নয়—তার পাশের কামরা। বলবন্ত ও ভবতারণ শোয় এখানে। ইন্দ্রাণী আসার পর থেকে ভবতারণ বাড়ি যান না—কখন কি দরকার পড়ে, তাই এই ঘরে আস্তানা হয়েছে।

অমূল্য সিঁদের মুখে ঝুঁকে পড়ে দেখছে। তারপর মুখ তুলে বলে, আচ্ছা হারামজাদা চোর তো! পাকা-দেয়াল কেটে ফেলেছে! ওদের অসাধ্য কাজ নেই।

আবার বলে, ধরতে পারা গেল না?

অমলা বলে, কই আর পারল! যারা গিয়েছিল, সবাই তো ফিরে আসছে।

অমূল্য বলে, যাবে কোথায়? খুঁজতে বলেন ভাল করে। পাখনা গজায় নি যে উড়ে পালাবে। আছে আশেপাশে কোনখানে।

আবার একবার সিঁদের দিকে তাকিয়ে বলে, সাহস বলিহারি! বাড়িময় লোক গিজগিজ করছে, তার মধ্যে আসে চুরি করতে! ধরতে পারলে এমন শিক্ষা দিতে হবে যে বাছাধনেরা আর এ কর্মে না আসে!

ভবতারণ ফিরে এলেন।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করেন, পাত্তা পেলেন চাটুজ্জে মশায়?

কিছু পেয়েছি মা, চিল পড়লে কুটোগাছটা না নিয়ে ওঠে? বেরিয়েছি যখন, শুধু-হাতে ফিরব না।

হাতের মুঠো খুলে দেখালেন। খানিকটা ছেঁড়া কাপড়। বললেন, চোর পেলাম না—খানিকটা এই কাপড় ছিঁড়ে আটকে ছিল লেবু-গাছে। এর থেকে দেখুন যদি হদিস পাওয়া যায়।

অমূল্যরই পরনের কাপড়ের অংশ। পচা কাপড় তালি দিয়ে ক্ষারে কেচে কোন গতিকে লজ্জা নিবারণ করে—এই মাসের মাইনেটা পেলে নূতন কাপড়

কিনে এটা পরিত্যাগের ইচ্ছা ছিল। দৌড়ানোর মুখে খানিকটা ছিঁড়ে রয়ে গেছে, টের পায় নি। অলক্ষ্যে সে তার পরনের ছেঁড়া অংশ ঢাকবার চেষ্টা করছে।

মলয় ভবতারণের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, দেন তো দেখি—

ইন্দ্রাণী হাঁক দিয়ে উঠলেন, বড় আদিখ্যেতা তোদের। এক এক ফোঁটা ছেলেপুলে রাত দুপুরে চোর ধরতে উঠে এসেছে। শুগে যা—

অমলা ও অমূল্যের দিকে চেয়ে বললেন, শুয়ে পড়গে সবাই—আর আড্ডা দিতে হবে না।

অমূল্যর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছিল। খুব বেঁচে গেল যা হোক—খুব রক্ষে হল গুরুর কৃপায়। উঃ, গায়ে ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল!

১১

খুব ভোরবেলা। তারা ঝিকমিক করছে তখনো আকাশে। উঠানে অট্টহাসির রোল উঠল।

এইখানে? এ যে কসাড় সুন্দরবন! এর মধ্যে এসে উঠেছেন?

যে মাঝি ঘাট থেকে মালপত্র বয়ে এনেছে, রকম-সকম দেখে সে দাঁত বের করে হাসছে। বলে, এ আর কি বাবু মশায়! বন দেখেন গে নীলখোলায়। ইদিকে অল্পস্বল্প ছিল—এনাদের আসবার আগে কেটেকুটে সারা করেছে। দিন-দুপুরে শেয়াল ঘুরে বেড়াত এই উঠোনে, সন্ধ্যের পর ফেউ ডাকত। কাছারি-দালানের তক্তাপোষের তলায় বোড়া-সাপ বেড়াল তাড়িয়ে ধরেছিল ও-বছর—

হাসির দাপটে লেপ ছেড়ে গেঞ্জি মাত্র গায়ে মলয় ছুটতে ছুটতে এসে হাত জড়িয়ে ধরল।

অশোক-দা!

ইন্দ্রাণীও এলেন। অশোক পদধূলি নিল।

পালিয়ে চলুন কাকিমা। ঢের হয়েছে। সাপ-শেয়ালদের বেদখল করে আছেন—এ অত্যাচার চুপচাপ বেশিদিন তারা সইবে না।

যাবো বই কি! সাপ-শিয়ালে নয়—মানুষই তাড়িয়ে বের করে দেবে। গলা নামিয়ে বললেন, যদি অবশ্য খদ্দের পাওয়া যায়। জান তো সমস্ত! তারপর—বাবা আছেন কেমন? কবে আসছেন? কতদূর কি করতে পারলেন? খদ্দের হবে না আরো-কিছু! কে আসছে এ বাজারে পাড়াগাঁয়ের তালুক কিনতে?…চলো, ভেতরে বসে কথাবার্তা হবে।

অশোকের ঘরে ঢুকবার উৎসাহ বিশেষ নেই। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। পুলকিত স্বরে বলল, কুন্থরে চলে যাচ্ছি শিগ্‌গির। তাই ভাবলাম, কাকিমাকে প্রণাম করে আসি গে। বাবাও বললেন তাই।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করেন, কেন—সেখানে কি?

নিউট্রিশান রিসার্চ ল্যাবোরেটারিস—ওটা অনেক বাড়ানো হচ্ছে। একজন সায়েন্টিফিক অফিসার হয়ে যাব। মনের মতো কাজ। টাকা-পয়সা নয়—এই চেয়েছিলাম আমি জীবনে। মাইনেও অবশ্য খুব খারাপ দেবে না।

কবে যাচ্ছ?

এখনো ঠিক পাকাপাকি হয় নি। দু-দশ দিনের মধ্যে হয়ে যাবে মনে হয়। ডক্টর দত্তর উপর লোক বেছে দেবার ভার। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে ঐ সম্পর্কে কেউ যদি কাজ করে থাকে, সে আমিই। ডক্টর দত্তের কাছে অবিচার বা আত্মীয়পোষণ হবার জো নেই—দেশসুদ্ধ সবাই তা জানে।

ইন্দ্রাণী বললেন, এলেই যদি—আর দুটো-চারটে দিন আগে আসতে হয়! একেবারে ভাঙা আসরে এলে।…সামিয়ানা দেখতে পাচ্ছ—কাল যাত্রা হয়েছিল। কত আমোদ-স্ফূর্তি হল!

বলবেন না কাকিমা। আপনাদের এই তাঁতিহাট যিনি আবিষ্কার করেন, কলম্বাসের কাছাকাছি মানুষ তিনি।

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, আমার শ্বশুরের দাদামশায়।

নমস্ত তিনি। এই ধাপধাড়া জায়গায় এসে বসতি-স্থাপন—বুকের পাটা না থাকলে কেউ পারে না।

তারপর পথ-কষ্টের ফিরিস্তি দিচ্ছে অশোক।

ছ-টার ট্রেন ফেল করে বসলাম। বারাসত অবধি মোটরে এসে ছোট-গাড়ি ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত করি। তারপর মোটর-লঞ্চ—উহুঁ, স্টেশন থেকে ঘাট অবধি রিক্সা করতে হল এর মাঝে। লঞ্চ থেকে নেমে ডিঙি। এরোপ্লেন আর গরুর গাড়ি হলে পৃথিবীর সব যান চড়া হয়ে যেত।

ইন্দ্রাণী বললেন, বড় কষ্ট হয়েছে—আহা! ঘরে চলো। হাত-মুখ ধোবে তো ধুয়ে এসো একেবারে।

দালানের দরজায় গিয়ে ইন্দ্রাণী ঘা দিলেন।

এই অমূল্য, উঠবি নে তুই? খাবার খাবি, শিগ্‌গির হাতমুখ ধুয়ে আয়।

অমূল্য ঘুমোয় নি একটুও—আতঙ্কে ঘুম হয় নি। শুয়ে শুয়ে ইতিকর্তব্য চিন্তা করছে। রাতারাতি সরে পড়বার মতলব হয়েছিল একবার। কিন্তু ভেবে-চিন্তে নিরস্ত হয়েছে। সিঁদ কাটার সম্পর্কে তা হলে তারই উপর সন্দেহ বর্তাবে। ধরা পড়ে গেলে তখন আর বিপদের অবধি থাকবে না। ভাগ্যক্রমে যখন রক্ষা পেয়েছে, প্রকাশ্য ভাবে বলে কয়ে বিদায় নেওয়া উচিত। সে যদি না থাকতে চায় এদের সঙ্গে, না পড়ে—জবরদস্তি করে এরা আটকাবে কেমন করে? স্পষ্টাস্পষ্টি ঠাকরুনকে বলে দেবে। কিছু টাকা ধার দেন ভাল—নয় তো কোন-কিছুরই দরকার নেই। লক্ষ্মণ না নিক—গুণ থাকলে কত দল লুফে নেবে!

ইন্দ্রাণীর ডাকে তড়াক করে উঠে দরজা খুলে অমূল্য বেরিয়ে এল।

এই চেহারা ও এমন বেশভূষা নিয়ে খাট-গদি দখল করে ছিল—বিস্ময়েরই ব্যাপার! অশোক জিজ্ঞাসা করে, এটি কে?

ছেলে একটি—

মলয় বলে, যাত্রাদলের ছেলে। কালকে নাচতে যা কাণ্ড হয়ে গেল। হি-হি-হি—

হাসি থেমে গেল ইন্দ্রাণীর তাড়ায়।

বখামি রাখ্। সোনাকুঠুরিতে গিয়ে বোস। খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

অশোকের ব্যাগ হাতড়ে মলয় ইতিমধ্যে বাক্স-ক্যামেরা আবিষ্কার করেছে। ঠিক জানি, অশোক-দা নিয়ে আসবে এ সব।

চললি কোথা রে?

সরস্বতী ঠাকুরের ছবি তুলি গে। একটা ছবি—শুধু একটা। সত্যি বলছি অশোক-দা—

বলতে বলতে পালাল।

তাড়া করেছে অশোক। ধুপধাপ পায়ের শব্দ। কয়েক পা মাত্র। মলয়ের পিছু ছেড়ে তারপর সে এঘর-ওঘর ঘুরছে। খিড়কির এঁদো-পুকুরের দিকটা পাক দিয়ে এসে বাইনোকুলার বের করল।

সিঁড়ির মুখে ইন্দ্রাণী গ্রেপ্তার করলেন।

কি ছটফটে ছেলে রে বাপু! সোনাকুঠুরির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে বললেন, অমূল্যই লক্ষ্মী। সে খেয়ে শেষ করল, তোমাদের পাত্তা নেই।

অশোক হাত বাড়িয়ে বলে, আমিও হচ্ছি লক্ষ্মী এইবার। দিন কাকিমা কি এনেছেন—

গোটা চারেক মিষ্টি এক সঙ্গে মুখে পুরে চায়ের কাপ হাতে অশোক দুড়দাড় সিঁড়ি দিয়ে ওঠে।

গরম চা ঢেলে পড়বে বাবা, অত তাড়া কিসের?

কোন্ জায়গায় এলাম দেখব না একটু তাকিয়ে?

ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলে? দেখেই সরে পড়বে না কি?

একলা নয়—আপনাদের সবসুদ্ধ নিয়ে।

ইন্দ্রাণী বললেন, তাই কথা রইল কিন্তু। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে। যদ্দিন না যাওয়া হচ্ছে, থাকতে হবে তোমার এখানে।

অশোক বলে, ইচ্ছেমতো থাকবার মালিক আর ক'দিন বা আছি! ডক্টর দত্তর চিঠি বোধ হয় দিন দশ-বারোর ভিতর এসে যাবে।

একটু হেসে বলে, দশ-বারো মাস হলেও অবশ্য আশ্চর্য হব না। স্বাধীন হই, যা-ই হই—সনাতন সেই আঠার মাসে বছর হিসেব করে আসছি এখনো। কিন্তু চিঠি যেদিন আসে আসুক গে—আপনারা ফিরে চলুন। সম্পত্তি সম্পর্কে যা করবার, বাবা তো করছেনই। আপনারা কোন্ সুখে পড়ে আছেন বলুন তো?

আমার শ্বশুরের ভিটে অশোক। তুমি যে চোখে দেখছ, আমাদের দৃষ্টি তার থেকে আলাদা তো হবেই।

ম্লান দৃষ্টিতে অশোকের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, প্রসন্ন পণ্ডিত মশায় সরস্বতী-পূজোর চাঁদা চাইতে এলেন। পাঠশালাটা তোমার কাকাবাবু আরম্ভ করে গিয়েছিলেন—পূজোর সমস্ত ভার আমি তাই ইচ্ছে করে কাঁধে তুলে নিলাম। কত কাল পরে উৎসব হল বাড়িতে, কত লোক আনাগোনা করল!··· তার মানে, থাকা যখন আর চলবেই না—হিসেব-নিকেশের মেয়াদটা নানান অজুহাতে কিছু লম্বা করে নিচ্ছি। মরবার সময় শুনতে পাই, জন্মদিন থেকে আগাগোড়া সমস্ত মনে পড়ে, বাঁচবার ভারি লোভ হয়। লোভ যতই হোক, প্রয়োজন তো তা মানবে না। কিন্তু ওদিককার খবর বল তো শুনি—

অশোক বলে, বাবা হারেন না কোন কাজে। খদ্দের পাকড়াবেনই। খুব ঘোরাঘুরি করছেন। এত খাটতে আমরা তাঁকে দেখি নি। অবিনাশ বর্ধন খুব আসা-যাওয়া করছে। চিনলেন না—লোহাপটির অবিনাশ? গাঁথবে মনে হচ্ছে।

ইন্দ্রাণী গভীর কণ্ঠে বললেন, তাঁর ঋণের বোঝা কিসে শোধ হবে জানি নে।

ছাতে বাইনোকুলার দিয়ে অশোক দেখছে। অমলা পিছনে। ঘুরতে গিয়ে মুখোমুখি হল।

কখন এলে? দেখতে পাই নি তো!

দূরে নজর আপনার। কাছের জিনিস কি দেখতে পান?

পাখি দেখছিলাম। কত রকমের পাখি পড়েছে জলা-জায়গাটায়। একটা বন্দুক পাওয়া যেত!

পাওয়া না হয় গেল। চালাবে কে

আমি—আমি। আবার কে ?

অমলার বাঁকা হাসি দেখে উত্তেজিত অশোক বলে, ফিনফিনে কাপড়-জামা দেখে ভড়কে যাচ্ছ ? বিশ্বাস করো, ট্রেনিং-কোরে খাঁকি ইউনিফর্ম পরে দস্তুর-মতো টার্গেট প্রাকটিস করেছি। বেশ তো, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার—বন্দুক যখন আছে, কাল-পরশু একদিন তোমাদের তাজ্জব বানিয়ে দেবো।

অমলা বলে, আমায় সঙ্গে নেবেন। তাজ্জব কাণ্ডটা নিজের চোখে দেখব, তবে বিশ্বাস হবে।

কিন্তু বকশিশ কি পাব, সেটা শুনে রাখতে চাই আগে ভাগে।

বিনা জলে একরকম মাংস রাঁধতে শিখেছি। তেমন রান্না জিভে পড়ে নি কখনো।

আবদুল বাবুর্চির চেয়েও ভাল ?

ঐ যে বললাম, কাছের জিনিস অতি তুচ্ছ আপনার কাছে। আজ নয়, চিরদিন দেখে আসছি।

কণ্ঠস্বর কেমন-কেমন! বাইনোকুলার রেখে অশোক হাত দু-খানা ধরল তার।

কেমন আছ অমলা ?

দায়-সারা অমন জিজ্ঞাসার দরকার নেই এতক্ষণ পরে।

স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে আছে অশোক। বলে, সত্যিই কি কাছের জিনিস তুমি ? আমি তো ভাবি, অনেক—অনেক দূরের। দূরের ঐ বাঁশঝাড়গুলো কিংবা আরও দূরে ঐ যে উঁচু কি-একটা—

অমলার বড় লজ্জা করে। কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্য বলে, স্তম্ভ ওটা। নীলকর সাহেবেরা তৈরি করেছিল। সেকালে নদী ছিল ওর নিচেই—দেশ-বিদেশের নীলের নৌকো এসে লাগত। আমি সব বলতে পারব না। চাটুজ্জে মশায় জানেন। তাঁর কাছে শুনবেন একদিন।

অশোক কিন্তু পূর্ব-প্রসঙ্গের জের টেনে চলেছে।

ঐ যে স্তম্ভ, কিংবা ঐ বিল, কিংবা আকাশের ঐ সব মেঘ—সকলের চেয়ে দূরবর্তী তুমি অমলা। কিছুতে নাগাল পাওয়া যায় না। সেই রাত থাকতে এসেছি, ঘর-বার করে বেড়াচ্ছি—একটা বার চোখের দেখা দিলে না এতক্ষণের মধ্যে!

এলেন কেন দয়া করে? না এলেই হত!

মানে?

অভিমান-ভরা কণ্ঠে অমলা বলে, বনরাজ্যে পড়ে আছি। কথা বলবার দোসর নেই। কতগুলো চিঠি লিখেছি, বলুন তো?

কিন্তু কষ্টের কথা তো লেখো নি। স্বভাবের শোভা বর্ণনা করেছ, তাঁতিহাট ভূস্বর্গবিশেষ—এই কথাই জানিয়েছ পাকে-প্রকারে।

ভূস্বর্গের লোভে পড়ে অ্যাদ্দিনে তবু উদ্যোগ হল। বন-জঙ্গল শুনলে আসতেনই না মোটে।

এ বন আলাদা কিনা! যদি জানতে পারতাম, বন্দিনী সীতা আকুলি-বিকুলি করছেন—

মুখ টিপে হেসে অমলা বলে, একলম্ফে তা হলে অশোকবনে এসে পড়তেন। ট্রেন-নৌকোর দরকার হত না।

উপমার অর্থ বুঝে হো-হো করে হেসে উঠল অশোক।

সে যাই হোক—ভক্তের মুখ পুড়িয়ে ফিরিয়ে দিও না, এই আরজি আগে-ভাগে জানিয়ে রাখছি।

ক্লিক—

অলক্ষ্যে মলয় এসেছিল, সে ফোটো তুলল। অশোক বলে, দুষ্টু ছেলে! বললি যে ছবি তুলবি মাত্তোর একখানা। স্পুল সবটা সাবাড় হয়ে গেল তো?

একটা কেবল বাকি ছিল। ভাবছিলাম, তোমার তুলব কি দিদিমণির তুলব। তা ভাল হল, একসঙ্গে পেয়ে গেলাম। বাড়ির মধ্যে কেউ আর বাকি থাকল না, কেউ রাগ করতে পারবে না।

ভবতারণ বর্ণপরিচয়, শ্লেট-পেন্সিল ও ধোলাই-করা তাঁতের ধুতি কিনে নিয়ে এলেন।

জামা পাওয়া গেল না মা। ক'টা লাট সাহেব আছে তাঁতিহাটে, যারা গায়ে জামা চড়ায়? বলেন তো গঞ্জ থেকে আনিয়ে দেবো। বই-শ্লেটেরও আগে চল ছিল না—দু-দুটো পাঠশালায় পাল্লা চলেছে, গোন বুঝে তাই ইদানীং আমদানি করছে।

অমূল্যকে ইন্দ্রাণী ডাক দিলেন, ময়লা কাপড়টা ছেড়ে ফেল—

অমূল্যর উৎসাহ নেই। বিষম চিন্তাকুল। ধীরে সুস্থে কাপড় ছাড়ছে, আর আড়চোখে তাকাচ্ছে বই-শ্লেটের দিকে। মরীয়া হয়ে সে বলে উঠল, শোনেন—ও সমস্ত কিন্তু চলবে না ঠাকরুন।

ইন্দ্রাণীর কৌতুক লাগে তার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গিতে।

দোষের কাজটা কি হচ্ছে?

অমূল্য গোঁ ধরে বলে, দোষ-গুণ যাই-ই হোক—সোজা কথা, পাঠশালায় আমি যাব না—

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, আজ তো ছুটি। কালকের কথা কাল হবে।

না—স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিচ্ছি ঠাকরুন। জবরদস্তি করে পাঠালে আমি সরে পড়ব।

ইন্দ্রাণী ভবতারণকে বললেন, শুনলেন তো—সরে পড়বে বলছে। একা ঘরে ওর আর আলাদা শোওয়া হবে না কালকের মতো। আপনাদের সঙ্গে শোবে। আপনার আর বলবন্তর উপর ভার। নজরে নজরে রাখবেন, ঘরের বার হতে না পারে।

ভবতারণ বলেন, খুব, খুব। রাতে কি আমি ঘুমুই? ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠতে হয়। আপনার হুকুম মাথা পেতে নিচ্ছি মা। ছোঁড়াটাকে পাশ ফিরতে দেবো না, এই কড়ার করছি।

অমূল্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, দিনমানেই চোখের সামনে দিয়ে চলে যাব। কে ঠেকায় দেখি! কড়ি দিয়ে কেউ কিনে রাখে নি।

সে কথায় দৃক্‌পাত না করে ভবতারণের দিকে চেয়ে ইন্দ্রাণী বললেন, এক কাজ করুন। প্রসন্ন পণ্ডিত মশায় বোধ হয় ঠাকুর-ভাসানোর তালে আছেন। ডেকে নিয়ে আসুন তো—কথাবার্তা বলে রাখি। মলয়টাও বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছে—দু-জনে পাঠশালায় যাবে

ভবতারণ চললেন প্রসন্নকে খবর দিতে।

অমূল্য হাত-চিরুণী দিয়ে চুলের দু-দিকে ফসফস করে গোটা দুই টান দিয়ে পুঁটলি বগলে তুলল।

এই চললাম। বদ্‌ মতলব খাটাচ্ছেন—এক মিনিট আর থাকছি নে। কেনা-গোলাম নই—কেয়া পরোয়া?

যেতে পারবি নে, আমি বলছি।

ইন্দ্রাণী হাত ধরলেন, অমূল্য এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল।

ধৈর্য হারিয়ে ইন্দ্রাণী চেঁচিয়ে উঠলেন, এই—

অমূল্যর সর্বদেহ কেঁপে ওঠে। তার ছাড়া-কাপড়টা মেলে ধরে কঠোর স্বরে ইন্দ্রাণী বললেন, কাপড়ের এতখানি ছিঁড়ল কি করে?

অমূল্য ভয়-পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বলতে লাগলেন, লেবুগাছে ওরা যে টুকরো পেয়েছিল, তার সঙ্গে পাড় অবিকল মিলে যাচ্ছে। দেখাব এনে সে টুকরো? সকলকে ডেকে দেখাই?

অমূল্যর কেঁদে ফেলবার অবস্থা। বলল, মাইরি বলছি—আমি ঘর থেকে বেরুই নি। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে পারি ঠাকরুন।

পা ধরতে যায় সে। ইন্দ্রাণী সরে গেলেন। কিছু নরম হয়ে বললেন, তবে কি করে হল?

অমূল্য বলে, একই পাড়ের কাপড় দু-খানা হয় না কি? একরকম ভাবে ছিঁড়তেও তো পারে?

তা পারে বটে! হেসে ফেললেন ইন্দ্রাণী। মুহূর্ত আগে অত রেগেছিলেন, এখন তা বলবে কে? কোমল কণ্ঠে বললেন, পারে বই কি! এমন কত হয়ে থাকে! পাগলামি করে একটু-আধটু যদিই বা ঘর থেকে বেরিয়ে থাকো, কি আর দোষ হয়েছে! দোষের কাজ তুমি কখনো করতে পার না। আমার মুকুল কতই তো দুষ্টুমি করত!

অশোকরা ছাদ থেকে নেমে এল।

মলয়কে দেখিয়ে ইন্দ্রাণী বললেন, আমার হাড় ভাজা-ভাজা করে দেয় এই মলয়। তা বলে কি একে ফেলে দিতে পারছি? দু-জনে এক সঙ্গে তোমরা পাঠশালায় যাবে, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, অবাধ্যপনা করবে না—কেমন?

অমলা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, পড়বে অমূল্য—আর যাত্রা করে বেড়াবে না?

অমূল্য তখন দালানের প্রান্তে গিয়ে আবার তাকের উপর আয়না-চিরুণী সাজাচ্ছে, পুঁটলি খুলে গামছা টাঙিয়ে রাখছে।

অশোক বলে, পাকাপাকি জুটে গেল তবে?

ম্লান দৃষ্টিতে চেয়ে ইন্দ্রাণী বললেন, সংসারে কোন্‌টা পাকাপাকি—কিছু ঠিক করে বলবার জো আছে? জানতাম তো, তিন ছেলেমেয়ে আমার—মুকুল তার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

মুকুলের প্রসঙ্গ অমলা হতে দিতে চায় না। দেড় বছর পার হয়ে গেছে, এখনও তুষানলের মতো সন্তানের বিয়োগ-ব্যথা ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে জ্বলছে, সে তা সর্বদা টের পায়।

মা'র ছবি তুলেছিস মলয়? যা টেনে নিয়ে মাকে দাঁড় করা রোয়াকের উপর। আমি তুলব মা'র ছবি।

মলয় বলে, সবার হয়ে গেছে, বললাম তো। কেউ আর বাদ নেই।

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে ইন্দ্রাণী বললেন, একজন কেবল। তাকে আর কোন দিন পাবি নে কেউ।

দেয়ালে বিলম্বিত ফোটোর মধ্যে মুকুলের দিকে এক নজরে তিনি চেয়ে-

ছিলেন। সহসা বলে উঠলেন, একটা জিনিস নজর করেছিস অমলা? মুকুলের মতো অমূল্যর কোঁকড়া চুল, চওড়া কপাল—

অমলা রাগ করে ওঠে।

আমাদের মুকুলের নাম কোরো না মা, বয়াটে ঐ যাত্রাদলের ছোঁড়াটার সঙ্গে।

চাঁদ বাঁকা আর তেঁতুলও বাঁকা। তা বলে তেঁতুল কিছু আর চাঁদ হয়ে গেল না। ভবতারণ ফোড়ন দিয়ে ওঠেন। প্রসন্নকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এসে পড়েছেন।

ইন্দ্রাণী আহ্বান করলেন, আসুন পণ্ডিত মশায়, আসতে আজ্ঞা হয়। আপনার পাঠশালায় দু'টি ছাত্র বাড়ল। একটি ইনি আর একটি উই যে—উনি। যত্ন করে পড়ালে ছেলে এমনি কত বেড়ে যাবে, দেখতে পাবেন।

প্রসন্ন একগাল হেসে বললেন, তা দেখবেন আপনি মা, খোকাবাবুকে কত যত্ন নিয়ে পড়াই—

ইন্দ্রাণী বললেন, একলা খোকাবাবু নয়, আরও একটি আছে—ঐ যে আমাদের অমূল্য।

প্রসন্ন সংশোধন করে তাড়াতাড়ি বলেন, তা বেশ! আপনি হাতে ধরে দিচ্ছেন—দু-জনের প্রতিই সবিশেষ মনোযোগ দেবো।

ইন্দ্রাণী বললেন, দু-জন নয়—সবিশেষ মনোযোগ সকলকার উপর দিতে হবে। কত ছেলে আপনার পাঠশালায়?

প্রসন্ন আমতা-আমতা করে জবাব দেন, ছেলে অধিক হবে কি করে? পেটে পেরেক ঠুকে ক-অক্ষর আদায় হয় না—এমনি সব হল এ অঞ্চলের মানুষ। গত বছর কুড়ির কাছাকাছি উঠেছিল—

ভবতারণ বললেন, তার উপর নির্মল ফক্কড়টা লেগেছে। ভুজুং-ভাজাং দিয়ে ছেলে সরিয়ে নেয়।

ইন্দ্রাণী বললেন, কাজে ফাঁকি দেবেন না পণ্ডিত মশায়। আপনার ইস্কুল যাতে ভাল চলে, ছেলে-মেয়ে আসে, টাকা-পয়সার দায় না ঠেকতে হয়—সে ভার আমি নিচ্ছি।

পণ্ডিত গদগদকণ্ঠে বললেন, যে আজ্ঞে। স্বর্গীয় বাবু মশায়ের বিদ্যালয়ে আমি একা সলতে ধরে আছি এতকাল। আপনি এসে গেছেন মা, কত যে বল-ভরসা—

বলতে দিলেন না ইন্দ্রাণী। মলয়কে বললেন, পণ্ডিত মশায়কে প্রণাম কর্। ওঁর আশীর্বাদে মানুষ হতে পারিস যেন।

মলয় প্রণাম করল। অমূল্যকে ডেকে বললেন, তুই আয়—

অমূল্যকেও অগত্যা এসে প্রণাম করতে হয়।

প্রতিমার কাছে ছেলেরা জটলা করছে। সেখান থেকে অনেকটা দূরে এক পাশে অমূল্য শূন্যদৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

সহসা চমক লাগল যাত্রার লোকদের হৈ-চৈ শুনে। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে পেট-কাটা ঘর থেকে তারা বেরুল, হাসি-স্ফূর্তি ও উচ্চকণ্ঠে নানা রকম রসিকতা করতে করতে চলেছে। কি নিয়ে জোর তর্ক বেধেছে দু-জনের মধ্যে— হরিপদই তো একজন। হাঁ—হরিপদ।

অমূল্য ডাকে, হরিপদ-দা চলে যাচ্ছ? শোন—একটা কথা শুনে যাও ও হরিপদ-দা।

হরিপদ দেখতে পেল। দল-ছাড়া হয়ে দ্রুত চলে এল কাছে।

অমূল্যর দু-গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। দলের মধ্যে হরিপদর আন্তরিক ভালবাসা তার উপর। সে চোখ মুছিয়ে দিল।

অমূল্য অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, ফাঁদে আটকে ফেলেছে হরিপদ-দা। কেউ না কেউ নজর রাখছে—এক-পা বেরুতে দেবে না। আবার শুনতে পাচ্ছি, পাঠশালায় নিয়ে বসাবে কাল থেকে।

হরিপদ সান্ত্বনা দেয়, মুষড়ে যাচ্ছিস কেন? খারাপ জায়গা তো নয়! আমি তো বলি, ভালই হচ্ছে। ভাল খাবি, ভাল থাকবি—আর এই মওকায় ক-ব-ঠ দু-এক কলম যদি বিদ্যে বাগিয়ে নিতে পারিস, পাঠ পড়িয়ে নেবার জন্য কাউকে খোশামুদি করতে হবে না। ধাঁ করে উন্নতি হয়ে যাবে।

পিঠ ঠুকে দিয়ে তাকে উৎসাহিত করে। বলে, দুটো-একটা মাস থেকে যা চোখ-কান বুজে। কদ্দিন চোখে-চোখে রাখবে? ভালবেসে কিছু দেয় ভাল, নয় তো যদ্দুর পারবি, হাতড়ে নিয়ে সরে পড়িস।

প্রবোধ বাক্যে অমূল্যর দুঃখ আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

তুমি তো বলবেই। নিজে চললে কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক—আমি শালা চৌপহর দিন পাঠশালার খোপে বসে বকম-বকম করি।

সখেদে বলে, বড়-বাড়ির সব কুঠুরি বাইরে থেকে এক রকম। আঁধারে ঠাহর করতে পারলাম না। ঘর ভুল করেই তো বিপাকে পড়লাম। কাপড় ছিঁড়ে গাছে বেঁধে ছিল—তুলে নিয়ে রেখে দিয়েছে। পালালে হুলিয়া বের করবে। জাঁতিকলে পড়ে গেছি—উপায় কি বলো এখন দাদা?

আদ্যোপান্ত শুনে হরিপদ চিন্তিত হল। অমূল্যর সঙ্গে তার নামও তো বেরিয়ে যেতে পারে! ভালয়-ভালয় গ্রাম-ছাড়া হতে পারলে বাঁচে। একেবারে অঞ্চল ছেড়ে তবে নিশ্চিন্ত হবে।

অমূল্য ঠাস-ঠাস করে নিজের দু-গালে চড় খাচ্ছে। কি ভুলটাই করেছি! আমায় ভুলে যেও না হরিপদ-দা। বেঁচে থাকি তো আবার একদিন জুটব তোমার কাছে।

১৩

দেওড় হচ্ছে কোথায়। অমলা ছুটে বেরিয়ে এল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলবন্তকে দেখতে পায়।

অশোক-দা কোথায় রে বলবন্ত?

বলবন্ত বলে, শুনতে পেলেন না? তিনিই তো! আমিন মশায়ের কাছ থেকে বন্দুক বের করে সকাল থেকে ঘষা-মাজা, তেল দেওয়া-দেয়ি হচ্ছিল—

অধীর কণ্ঠে অমলা বলে, আমারও যে সঙ্গে যাবার কথা—

কই? উল্টোই তো বললেন। মালকোঁচা-মারা, মাজায় টোটার পেটি,

বন্দুক-কাঁধে বেরুচ্ছেন—আমি বললাম, পাখি-টাখি কুড়োবার জন্যেও একজনের তো দরকার! তা আমাকেও নিলেন না, একা সব করবেন।

ক্ষুব্ধ অমলা বলে, আমার কথা হল না কিছু?

হল বই কি! বললেন, হুল্লোড় করিস নে, টের পেয়ে যাবে। একেবারে তাক লাগিয়ে দেবো সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে।

তারপর ঔদরিক বলবন্ত জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ দিদিমণি, পাখির মাংস নির্জলা রেঁধে খাওয়াবেন নাকি? তাই কখনো হয়? এক ফোঁটাও জল দেবেন না —তবে সিদ্ধ হবে কি করে?

কোন্ দিকে গেলেন বল তো?

হুই উদিক পানে হবে—

বলে অনির্দেশ্য দিগন্তের দিকে সে হাত বাড়াল।

কিন্তু আওয়াজ এল যে কুঠির জঙ্গলের দিক থেকে—

তবে সেখানেই।

বলে বাজে প্রসঙ্গে এড়িয়ে বলবন্ত বলে, নতুন কায়দার রান্নায় মশলাপাতি যদি কিছু আনতে হয়, বলে দেন। বেলাবেলি বাজারখোলা থেকে এনে রাখি।

ডুড়ুম-ডুড়ুম—আবার বন্দুকের আওয়াজ।

দুপুর বেলাটা এখন দস্তুরমতো গরম পড়ে। ইলেকট্রিক পাখার অভাব অসহ্য লাগে অশোকের। গ্রামের মধ্যে তবু ঘরদোর আছে, গাছপালা আছে, মাঠে বিলে কোন আচ্ছাদন নেই—গোড়ায় তাই সে বেরুতে আতঙ্কিত হচ্ছিল। কিন্তু উপায়ও নেই—বন্দুক নিয়ে শিকার রাত্রিবেলা চলে না যখন।

বিলে পড়ে কিন্তু প্রাণ জুড়িয়ে গেল। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, রোদের তেজ একটুও লাগে না। ঈশ্বরের আশীর্বাদ এটা—না হলে ক্ষেতে কাজ করা যেত না। ধান কেটে নিয়ে গেছে, গোড়াগুলো রয়েছে। মাটি শুকিয়ে পাথরের মতো। এই পাথরে লাঙল ঠেলতে চাষীরা দলে দলে নেমে পড়বে আর ক-দিন পরে, ফাল্গুন মাসটা কেটে যাবার পর। মাটি আলগা করে

রাখবে—প্রথম বর্ষণেই বাটা-চন্দনের মতো গলে মোলায়েম হবে কঠিন মাটি। টিলা কয়েকটা সারি সারি···খেজুর-বাগান। বট, নিম-নিশিন্দা ও শিরিষগাছ এবং দু-একটা বাঁশঝাড়ও দেখা যায়। নাবালের দিকে শোলাবন মাঝে মাঝে। শোলাগাছ দেখে বুঝতে হবে কূয়ো আছে ওখানটায়—কূয়োর পাড়ে শোলার ঝাড় জন্মে। বিলের মাছ এসে পড়ে ঐ সব কূয়োয়—গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে জল শুকিয়ে আসবে, মাছ ধরা পড়বে সেই সময়। আরও নাবালে দূরবিস্তৃত জলরাশি—বারো মাসই জল থাকে। এক কালে ওটা হরিহর-নদের খাত ছিল, মুখ বন্ধ হয়ে বাঁওড়ে পরিণত হয়েছে। নদী দক্ষিণে সরে গেছে। নীলকুঠি ছিল সেদিকটায়—এখন কুঠির জঙ্গল। কাঁচা রাস্তা বিল ভেদ করে কুঠি অবধি গিয়েছে। কুঠিয়ালদেরই তৈরি রাস্তা—এক কালে কতক অংশ বাঁধানো ছিল। সাহেবদের টমটম কত যাতায়াত করেছে সেই আমলে! এখন রাস্তার চিহ্নই নেই অনেক জায়গায়—রাস্তা কেটে লোকে ধান-ক্ষেতের সামিল করে নিয়েছে। শখের রাস্তা ছিল, দু-ধারে ছায়াবৃক্ষ রোপিত হয়েছিল—টিলার প্রান্তে বট শিরিষ নিম ইত্যাদির সারি দেখে বোঝা যায় বেশ এখনো। বর্ষার জলকাদায় এ রাস্তা ইদানীং অব্যবহার্য হয়ে পড়ে, সেই সময় ডোঙায় যাতায়াত করতে হয় নীলকুঠি এবং ঐ দিককার গ্রামগুলি ও তাঁতিহাটের মধ্যে।

সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে অশোক চলেছে। দেওড় করছে অনেকবার—কিন্তু একটাও পড়ে নি। পাখিগুলো পত-পত করে যেন উপহাস করে উড়ে যায়। ব্যাপার কি! শঙ্কিত হচ্ছে সে ক্রমশ। এই ভয়েই অমলাকে নিয়ে আসে নি। কিন্তু জানতে বাকি থাকবে না তার। ধারালো ছুরির মতো হাসি বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে অশোককে সে নাজেহাল করবে।

হঠাৎ অনেক পাখির মিলিত বিচিত্র ধরনের ডাক কানে এল। থমকে দাঁড়াল অশোক। নেংটি-পরা এক রাখাল ছেলে গরু ছেড়ে দিয়ে জিওল-আঠায় দোর-ঘুঁড়ি আঁটছিল আ'লের উপর বসে। তাকে জিজ্ঞাসা করল।

ঘুঁড়ি ছেড়ে ছেলেটা তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ায়। হাঁ সাহেব, ডা'ক পাখি। ঐ যে—ঐ সাহেবদীঘির খোলে—

ধুতি-পরা লোককে সাহেব বলে খাতির দেখাল বন্দুকের আভিজাত্যে নাকি? কিন্তু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সাহেবদীঘি বলে প্রত্যয় হয় না জায়গাটাকে। বন্ধুর মাঠ দীঘি কি করে হয়? তারপর ঠাহর করে দেখল, দূরের দিকে যা সতেজ ফসল বলে ভাবছিল সেগুলো কেউটে-ফণার দাম। সামান্য পরিমাণে পরিষ্কৃত হয়েছে, তাতে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে—জল আছে ওর নিচে। কেউটেফণার এপাশে-ওপাশে হোগলা-বন, চেঁচো-ঘাস এবং—আবার ভুল করে ভেবেছিল আখ-ক্ষেত—তা নয়, একজাতীয় ঘাস। দু'টি লোক ঠুক-ঠুক করে লাঠি খোঁচাচ্ছে ঐ জঙ্গলে, লাঠির সঙ্গে শেওলা-পচা পাঁক উঠে আসছে। সুগভীর—লাঠির অর্ধেকের বেশি ডুবে যাচ্ছে ঐ পাঁকের মধ্যে।

কি কর তোমরা?

কচ্ছম খুঁজতিছি।

একজনে খানিকটা এগিয়ে এসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

মশায়ের নিবেস? এয়েছেন কোয়ানে?

ডা'কের কলরব আবার। দীর্ঘচ্ছন্দে আলাপনের সময় নেই। অশোক-সংক্ষেপে জবাব দিল, রায়-বাড়ি এসেছি কলকাতা থেকে।

জুতো খুলে ছুঁড়ে দিল। মালকোঁচা আরও এঁটে দ্রুত সে অদৃশ্য হল হোগলা-বনে—যেখান থেকে ডাক আসছিল।

সামান্যক্ষণ মাত্র—তারপর মর্মান্তিক আর্তনাদ।

ভয় পালেন? আমরা এহেনে আছি—ভয়ডা কিসির? অত চেঁচালি পাখি এদিগরে থাকপেনে না।

অপর জন অনেকটা দূরে। সে বলে, আগুয়ে দেখ্ না ভীমে, হলডা কি—

ভীমের এগোবার লক্ষণ নেই। যথাপূর্ব লাঠি খোঁচাচ্ছে আর ঐখান থেকেই উপদেশ ছাড়ছে।

ঐ অজঙ্গি বাগানে সাঁদায়েছেন? বারোয়ে আসেন শিগগির।

কিন্তু উপদেশ শোনবার আগেই হোগলা-চেঁচোবন ভেঙে কাদা-মাখা মূর্তি অশোক টলতে টলতে ডাঙায় এল। এসেই বসে পড়ল।

ভীম একনজর তাকিয়ে বলে, ডা'ক পাখি বন্দুকি মারা যায় না, ফাঁদ পা'তে ধরতি হয়।

অশোক একখানা পা চেপে ধরে বলে, কিসে কামড়াচ্ছে, বড্ড জ্বালা করছে।

ভীম বলল, তা যে বাগানে গিয়েলেন, কামড়াবে তার বিচিত্তির কি?

সাপ-টাপ নয় তো?

অত্যন্ত সহজভাবে ভীম বলল, হতি পায়ে—

অশোক আবার আর্তনাদ করে ওঠে।

বলো কি হে? সাপ? কি সাপ আছে এদিকে?

খয়ে-কেউটে, কাল-কেউটে, কালাজ—সাপ কি এক রকমের মশায়? আবার ঢোঁড়া-দাঁড়াসও হতি পারে। ঢোঁড়ায় কামড়ালি নাক ডা'কে ঘুমোন গে—কিচ্ছু হবে না।

কিন্তু কেউটে যে নয়, তা কে বলবে?

ভীম ঘাড় নেড়ে বলে, কেউটে হলি মশায়, হাত-পা খিঁচোতেন এতক্ষণ, মুখি গেঁজলা উঠত। তবে কালাজ হতি পারে। তাতে যন্তোরণা বেশি হয় না।

কালাজের কামড়ে মরে?

মরে আবার না। সাক্ষাৎ শমন ওঁয়ারা। যত দেখেন, বেশির ভাগ তো মরে কালাজ-কানড়ের কামড়ে। বিছেনে শুয়ে রয়েছেন—টুক করে ঠুকে দেলেন—জ্বালা নেই, যন্তোরণা নেই—আস্তে আস্তে নীলবর্ণ হয়ে আসপেন—

অশোক ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, ওরে বাপু ওস্তাদ, কাছে এসে দেখ না একটুখানি—

কিন্তু এতক্ষণের পর ঠকাস করে উঠেছে লাঠির মাথায়। শেষ না দেখে ভীম উঠে আসে কি করে?

অশোকের কাঁপুনি ধরে গেছে দস্তুরমতো।

কি বলো ওস্তাদ? বেঁধে ফেলা তো উচিত পা'টা?

আজ্ঞে—

ইতিমধ্যে ভীম দাম ছিঁড়ে হাতখানেক জায়গা পরিষ্কার করে ফেলেছে। লাঠি খোঁচাচ্ছে এবার অতি সন্তর্পণে পরখ করে করে। তারপর লাঠি ফেলে নেমে পড়ল পাঁকের মধ্যে। হাতড়াচ্ছে। মুখে অশোককে প্রবোধ দেয়, বাঁধতি লাগুন মশায়, আসতিছি। একখান যেন পাওয়া গেল। তুলে দিয়ে আসতিছি আমি।

অশোক বলে, তোমার কোমরে গোঁজা ঐ দড়িটা দাও না ছুঁড়ে।

দড়িতি হবে নানে। দড়ির বাঁধনে বিষ ঠেকায় না। চিকন ধুতি পরা আছে, পাড় ছিঁড়ে নেন গে। পাড়ির বাঁধন খুব জব্দ।

অবস্থার গুরুত্ব এতক্ষণে কতকটা উপলব্ধি করে ভীম অপর লোকটিকে বলল, নিজি-নিজি পারবেনেন না—তুই বাঁধে দিগে হাড়ো-ভাই। কচ্ছমখান কায়দা করে আমি যাচ্ছি।

হাড়ো গিয়ে ফ্যাশ করে অশোকের ধুতির পাড় ছিঁড়ে কষে তিন-চারটে বাঁধন দিল। তারপর বলা নেই, কওয়া নেই—দু-আঙুলে সজোরে চিমটি কাটল জানুর উপরে। চিমটি কাটা বলে না তাকে, লোহার সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরছে যেন জায়গাটা। অশোক যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে, উহু-হু—ছাড়ো …কি করছ বলো তো?

হাড়ো চেঁচিয়ে বলে, দিব্যি সাড় রয়েছে—কাটি-ঘা নয় তা'লি ভীমে—

ভীম ততক্ষণে প্রকাণ্ড এক ঢালিয়ান-কচ্ছপ ডাঙার উপর চিৎ করে চার পায়ে দড়ি বাঁধছে। জুত করে বেঁধে রেখে এদিকে চলে এল।

চেমটি কা'টে বুঝতি পারা যায় না সকল সময়—

পায়ের ক-গাছা লোম একসঙ্গে ধরে সে টান দিল। টানের চোটে লোম ছিঁড়ে এল।

মুখ বিমর্ষ করে বলে, সাপে না কাটলি রোঁয়া উবড়াল কেন?

অশোক বলে, যা টান দিয়েছ, চামড়া অবধি উপড়ে আসে নি কেন তাই ভাবছি।

মাস্টের যাচ্ছে। উনারে ডাকলি খাঁটি বিত্তান্ত পাওয়া যাবেনে—

দু-জনেই ডাকছে, মাস্টের, ও মাস্টের মশায়, দেখে যাও এট্টুখানি—

কর্দমাক্ত অদ্ভুত-মূর্তি আধশোয়া অশোককে দেখে নির্মল দ্রুত-পায়ে এল।

হাড়ো বলে, কাটি-ঘা বলে সন্দ করি। দেখ।

ভীম বিজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার অশোকের দিকে, একবার নির্মলের দিকে চেয়ে বলল, রায়বাড়ি আয়েছেন। পাখী মারতি আ'সে এই কাণ্ড। দেখ দিনি মাস্টের মশায়···রোঁয়া টানলি কিন্তু ছিঁড়ে আসতিছে।

অশোকের পাশে উবু হয়ে বসে নির্মল ক্ষত স্থান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে। আঙুল বুলিয়ে দেখল একটুখানি ফুলে উঠেছে। সে হাসতে লাগল।

উঃ, কি রকম নাস্তানাবুদ করছিস তোরা ভদ্রলোককে, কিচ্ছু নয়—চেলা-বিছেয় কামড়েছে। এক কাজ কর্ ভীম। জায়গাটা রগড়ে রগড়ে মুছে, তোদের হুঁকোর তামাক রয়েছে না—ঐ খানিকটা ডলে দে।

নিবিষ্ট ভাবে আরও একটু দেখে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে নির্মল বাঁধন খুলে দিল।

যন্ত্রণা কমেছে তামাক দিয়ে—কি বলেন? কমতেই হবে। পড়ে গিয়েছিলেন গাদের ভিতর? ঐ কসাড় হোগলাবনে এমনভাবে কেউ যায়?

অশোক বলে, ডা'ক পাখি ডেকে উঠল কিনা ওর মধ্যে—

হেসে নির্মল বলে, আর আপনি অমনি তাড়া করলেন? ভারি চালাক পাখি—বন্দুকে মারা প্রায় অসম্ভব। এরা ফাঁদ পেতে ধরে থাকে। এবারে ধরছ না হাড়ো?

হাড়ো বলে, ধরি কখনো-সখনো।

নির্মল বলে, গ্রামের অতিথি—মিছামিছি কষ্ট পেলেন। এবার যখন ধরবে, এঁকে দিয়ে এসো কয়েকটা।

বন্দুকটা পাশে পড়ে ছিল। নির্মল তুলে ধরে দেখছে। অশোক হাঁ-হাঁ করে ওঠে, নাড়ানাড়ি কোরো না মাস্টার, টোটা ভরা আছে।

নির্মল বলে, বন্দুকসুদ্ধ পড়ে গিয়েছিলেন—জোর কপাল, গুলি বেরোয় নি। সাপের কামড়ে না হোক বন্দুকের গুলিতে জখম হওয়া অসম্ভব ছিল না।

এক জোড়া বালিহাঁস অনেক দূরে কলমির দামের মধ্যে। এত দূরে যে দেখাই যায় না ভাল করে। নির্মল বন্দুক তুলল।

এই জায়গায় টিপলে তো গুলি বেরোয়?

অশোক বলে, দেখ না টিপে। ঝাঁকি মেরে ফেলে দেবে—হাড়গোড় চূর্ণ হবে, মজা টের পাবে তখন—

বিদ্রূপের সুরে বলল, তাক করছ যে! এখান থেকেই লক্ষ্যভেদ করতে চাও?

নির্মল বলে, ঝাঁকি মারার কথা বললেন—তা পড়ে যদি যাই, ডাঙার উপরেই পড়ি। আর এগোলে কাদা মেখে আপনার অবস্থা হবে।

বলতে বলতে ট্রিগার টিপল।

আর এ কি পরমাশ্চর্য ব্যাপার—একটা পাখি সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল। ছররা খেয়ে অপরটা ছুটল—হাত কয়েক গিয়ে সেটাও পড়ে গেল।

অশোক স্তম্ভিত।

পাকা হাত তোমার হে! আবার জিজ্ঞাসা করছিলে, টিপতে হবে কোথা? দস্তুরমতো প্রাকটিস আছে।

হেসে উঠে নির্মল বলে, তা আছে বটে! ছেলেগুলোর পিঠের উপর। বন্দুক নয়—কিল।

অশোক গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়ল।

উঁহু—ঠাট্টা নয়। হাজারে একটা দেখা যায় না এমন।

নির্মল বলে, কপালগুণে লেগে গেছে। বন্দুকটাও খুব ভাল।

অশোক বলে, আর একবার দেখ না—কপালগুণে আরও কয়েকটা যদি লেগে যায়। মান বাঁচিয়েছ তুমি। জল-কাদা মেখে খালি-হাতে এই অবস্থায় ফিরলে হাসাহাসির চোটে হয়তো নিজের বুকেই গুলি বসাতাম।

আলাপ-পরিচয় হল। ঐ দীঘির গর্ভেই দূর্বাঘাসের উপর পাশাপাশি বসেছে।

নির্মল বলে কি দিয়ে অভ্যর্থনা করি? পাড়াগেঁয়ে মানুষ—চায়ের বন্দোবস্ত নেই। খেজুররস খান। ও জিনিষ কলকাতায় জোটে না। সকালে রস

ঝেড়ে নিয়ে আবার পেতে রেখে গেছে। ওলার রস বলে—খুব মিষ্টি, আর শুনেছি উপকারীও খুব।

একটি ছেলেকে ডেকে বলে, অতুল, রস খাওয়াতে পারিস কিনা দেখ্ তো ভাই—

অতুল একা নয়—সঙ্গে আরও চার-পাঁচটি ছুটল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে অশোক বলে, অনেকগুলো ঘর—হাই ইস্কুল-টিস্কুল হলে কথা ছিল, পাঠশালায় এত ঘর কি দরকারে লাগবে?

নির্মল সায় দিয়ে বলে, তা সত্যি। ঘরের দরকার খুব বেশি হবে না, জমির দরকার। টাকার সঙ্গতি নেই তো—পতিত জঙ্গল কেটে কেটে জমি বের করতে হচ্ছে। বড় কষ্টের কাজ—হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

অতুল ফিরে এল খানিক পরে। অভাবিত ব্যাপার—সঙ্গে অমলা ও বলবন্ত।

রস ভাল নেই নির্মল-দা, গেজে গেছে। গরম পড়ে গেছে কিনা! কেনারাম ওরা ডাব পেড়ে আনছে।

ভালই হবে—

বলে নির্মল হাসিমুখে অমলাকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসে।

ইস্কুল-ঘরে গিয়ে বসবেন? অবিশ্যি সে যা ঘর—দূর্বাবন তার চেয়ে অনেক ভাল।

অমলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আপনার কাছে নালিশ করতে এসেছি। ছেলেরা আমায় অপমান করেছে।

ব্যস্ত হয়ে নির্মল বলে, সে কি?

অতুল বলে, না নির্মল-দা, অপমান কেন হবে? অপমান আমরা করি নি। কি বলেছিলি?

কুশি কুশি কাঁকুড় তুলছিলেন, তাই মানা করেছি।

নির্মল বলে, যেমন সবাইকে মানা করে, আপনাদেরও করেছে। লোক বুঝতে পারে নি।

অতুলের দিকে চেয়ে বলে, শহরে থাকেন—তোমাদের ক্ষেতের জিনিষ খেতে ইচ্ছে হয়েছে। মানা করা ঠিক হয় নি।

অমলা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, ভাল চাও তো বেরোও ক্ষেত থেকে—কি ধরনের কথা এসব? পাঠশালায় কেবল অ আ-ই শেখান, ভদ্র আচরণ শেখান না?

নির্মল ভ্রূকুটি করল অমলার দিকে। কঠিন কণ্ঠে অতুলকে জিজ্ঞাসা করে, বলেছিলি?

অতুল কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, এঁকে নয়—বলবন্তকে নির্দেশ করে বলে, ঐ লোকটাকে।

অমলা বলে, আমার লোকের অপমান করলে আমারই অপমান। ক্ষেতের ভিতর আমিও ছিলাম।

নির্মল বলে, গেঁয়ো ছেলেপুলে—মহিলার সম্মান বোঝে না। কাকে কি বলতে হয়, কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওদের হয়ে আমি মাপ চাচ্ছি।

অতুল বলে, খাওয়ার জন্য দুটো-একটা নিলে কিছু বলতাম না নির্মল-দা। যত জালি পড়েছিল, সমস্ত তুলে ঐ—ঐ দেখ না—কোঁচড় ভরেছে। মানা করলে তেড়ে মারতে আসে, বাপ তুলে কথা বলে।

বলবন্ত তম্বি করে, বলবই তো! বাপের ঘরের জমি নাকি? রায়-এস্টেটের খাস এলাকাভুক্ত এ সমস্ত।

নির্মল বলে, কতগুলো কাঁকুড় তুলেছ দেখি? ঢালো—সমস্ত ঢেলে ফেল এই জায়গায়—

পরিমাণ দেখে মুখ অন্ধকার হল। অমলার দিকে চেয়ে বলে, আপনাদের গাছের কুল পেড়ে খাচ্ছিল বলে যাত্রাদলের ছোঁড়াটাকে দড়া দিয়ে বেঁধেছিলেন, থানায় পাঠাচ্ছিলেন। আশা করি সেটা ভুলে যান নি।

অশোক এতক্ষণ নির্বাক ছিল। উচ্চ হাসি হেসে বলে, উহু, বাঁধাবাঁধির তালে যেও না মাস্টার। তোমার টাকার গরজ—মুক্তিমূল্য দিয়ে দিচ্ছি।

অমলা মুখ রাঙা করে বলে, খাওয়ার জন্য কেউ তো কিছু বলে নি। কুল ছুঁড়ে মেরেছিল বলেই—

বলবন্ত ফোড়ন দেয়, এমন মেরেছিল যে দিদিমণি মাথা ঘুরে পড়লেন। কপাল ফুলে এই গুয়োপানা।

নির্মল তিক্তকণ্ঠে বলে, নবনীত-কোমল শরীর—ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান, কুলের ঘায়ে তো যাবেনই। কিন্তু কোমলতা শুধু বাইরে—মনে এতটুকু নেই? ছেলেদের জঙ্গল কেটে বানানো সবজি-ক্ষেত তছনছ করতে মায়া লাগে না, লজ্জা করে না একটু?

খোঁচা খেয়ে অমলা ক্ষেপে গেল।

মহিলার মর্যাদা ছেলেপুলেরা বোঝে না বলছিলেন, গুরুও বোঝেন কি না ভারি! গেঁয়ো পাঠশালার গেঁয়ো মাস্টার—না আছে শিক্ষা, না আছে সহবৎ। আমারই অন্যায় হয়েছে এই আস্তাকুড়ে আসা।

রোষ-কম্পিত কণ্ঠে অশোককে বলে, দিয়ে দিন কাঁকুড়ের দাম যা হয়—

ফলগুলো নেড়েচেড়ে দেখে বলবন্ত বলে, কত আর—দশ-বারো গণ্ডা পয়সা।

নির্মল ঘাড় নেড়ে বলে, আজকের এই কচি জিনিষের দর নয়। বড় হত কাঁকুড়—দক্ষিণের পাইকাররা ভাল দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যেত।

অশোককে বলে, ছেলেরা খরচ চালায় গায়ে-গতরে খেটে—বড়লোকের টাকায় নয়। এই তাদের উপজীবিকা, ভবিষ্যৎ। বই-কাগজ, শ্লেট-পেন্সিল—যা কিছু এই পয়সায় কিনতে হয়।

বলবন্ত বলে, আচ্ছা কুঁদুলের পাল্লায় পড়া গেছে। তা তোমার শসা-কাঁকুড়ের দাম দু-শো পাঁচশো হবে নাকি?

কেনারাম ডাবের কাঁদি উঠানে এনে নামাল। নির্মল বিড়বিড় করে হিসাব করছে। বলল, দক্ষিণের পাইকারের কথা যাক—কাঁকুড়গুলো পুষ্ট হলে আমাদের বদন ব্যাপারিই তিন টাকা দিত। কি বলিস রে অতুল—নয়? কি বলিস কেনা?

মুখ তুলে অমলার দিকে চেয়ে বলে, তিন টাকা দেবেন।

অমলা বলে, দশটা টাকা মুখের উপর ছুঁড়ে দিন তো অশোক-দা—

নির্মল বলে, দশ টাকা দাম নয়—দশ টাকা আমি নেবো কেন?

অমলা-বলে, বড়লোকেরা দিয়ে থাকে এমনি—

নির্মল বলে, আমাদের তিনটে টাকা দেবেন। বেচা-কেনার ব্যাপারে ঠকানো আমাদের পেশা নয়। বাকি টাকা ছুঁড়ে দেবেন গাঙের জলে। বড়লোকেরা দিয়েই থাকেন এমনি।

অশোক থামিয়ে দেয়।

আচ্ছা যা দেবার দিয়ে দেবো আমি। ঝগড়াঝাটি করছ কেন—স্থিরো ভব।

নির্মল কাটারি দিয়ে ডাব কেটে কেটে দিচ্ছে। অমলার কাছে আনল। মুখ ফিরিয়ে আছে সে।

ডাব খান।

না। অমলা মুখ-ঝামটা দিয়ে ওঠে।

খান একটা—মন-মেজাজ ঠাণ্ডা হবে। ভেবে দেখুন, অন্যায় হয়েছে কিনা। অতি-গরিব এই সব ছেলেপুলে। অভিভাবকরা লেখাপড়ার খরচ তো দেবেই না, উল্টে রাগ করে পাঠশালায় আসার দরুন সংসারের কাজের অসুবিধা ঘটে বলে।

অমলা জবাব দেয় না।

আচ্ছা, যা-কিছু বলেছি সমস্ত তুলে নিলাম। অত্যন্ত কোমল আপনি—বাইরে যেমন, ভিতরেও তেমনি। ব্যস—হল তো? আপনিও তো আমায় কত কি বললেন—গেঁয়ো মাস্টার, শিক্ষা নেই, সহবৎ নেই—রাগ করেছি? যা সত্যি, তাতে রাগ করব কেন?

পিপাসা পেয়েছিল অমলার। এত গালি দিয়েছে, সেজন্য লজ্জাও হল বোধকরি। ডাবটা নিয়ে সে অশোকের দিকে চেয়ে বলল, দাম ধরে দেবেন কিন্তু ডাবের।

তাই দেবেন। তিন টাকা আর ডাবের দাম হল এক আনা।

অমলা সংশোধন করে বলে, তিন টাকা দু-আনা। দিয়ে দেবেন অশোক-দা। আপনিও খেয়েছেন।

নির্মল বলে, ওঁর ডাবের দাম কক্ষণো উনি দিতে চাইবেন না। ওঁর সঙ্গে ভাব—ঝগড়া তো নয়।

আমি অপমানিত হলাম আর আপনি বন্ধুত্ব করছেন অশোক-দা ?

অভিমানে অমলার স্বর কাঁপছে।

অশোক বিপন্ন ভাবে বলে, আহা-হা—বন্ধুত্ব কেন হবে ? ঝগড়াই করব। দলবল নিয়ে একদিন ভেঙে দিয়ে যাব এর এই ছারপোকার পত্তন। আজকে মাত্র তিন জন আমরা—এত জনের সঙ্গে পেরে উঠব না তো ! চলো এবারে—সন্ধ্যে হয়ে গেল। পাখিগুলো নিয়ে নাও বলবন্ত—

নির্মলকে একান্তে নিয়ে অশোক খান তিনেক নোট গুঁজে দেয় তার হাতে। নির্মল অবাক হয়ে বলে, দাম চেয়েছিলাম তিন টাকা—তিনখানা নোট নয়।

তা হোক, তা হোক। অনেক খেটেছ তুমি মাস্টার। এতগুলো পাখি মেরে দিলে। ছেলেরা গাছে উঠে ডাব পেড়ে খাওয়াল—

খাটুনির মজুরি দিচ্ছেন ?

অপ্রতিভ হয়ে অশোক বলে, না-না—ওকি বলছ ? মিষ্টি-মিঠাই খাবে ছেলেরা মিলে—

মিষ্টি পাওয়া যায় না এখানে—

যা পাওয়া যায়, তাই খাবে। না হয় ইস্কুলের সাহায্য বলেই নিয়ে যাও।

নির্মল হেসে বলল, রেখে দিন ওটা। ইস্কুলে আসুন একদিন—দেখুন, শুনুন—না দেখে সাহায্য দেবেন কেন ?

বলো কি ?

নির্বাক বিস্ময়ে অশোক মুহূর্তকাল তার দিকে চেয়ে রইল। বলে, তাই হবে। দেখতে আসব একদিন। আজব লোক হে তুমি ! যেচে চাঁদা দিতে গেলাম—তাতে আপত্তি ? নাঃ—তোমার ইস্কুল চলবে না।

ইন্দ্রাণীর হুকুম ভবতারণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছেন। যে ঘরে সিঁদ কেটেছিল, তার মেঝেয় অমূল্যর শোবার ব্যবস্থা। ব্যবস্থা অতি নিখুঁত। দিনমানে পাইক-দারোয়ান ও প্রসন্ন পণ্ডিতের চোখ এড়িয়ে যদিই বা পালানো সম্ভব, রাত্রিবেলা জোরে একটা নিশ্বাস ফেললেও ভবতারণ অমনি তড়াক করে উঠে বসেন।

অমূল্য শোয় দেয়াল ঘেঁসে। তার এদিকে বলবন্ত সুবিপুল দেহ নিয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ পর্বতের মতো পড়ে থাকে। এ হিমালয় অতিক্রম করা অসম্ভব ব্যাপার। বলবন্ত ও অমূল্যর এক মশারি। হাতখানেক মাত্র ব্যবধানে সমস্ত দরজাটা জুড়ে দ্বিতীয় মশারি ভবতারণের। মশারির বাইরে হাতের কাছে হুঁকো-কলকে টিকে-তামাক টেমি-দেশলাই ইত্যাদি রাত কাটাবার যাবতীয় সরঞ্জাম। ইন্দ্রাণীকে বলেছিলেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠতে হয়—বিনয়বশত কম করেই বলেছিলেন, ঘণ্টায় একাধিক বার ওঠেন তিনি তামাক খেতে। টেমি জেলে টিকে ধরিয়ে ভুড়ুক-ভুড়ুক করে দীর্ঘচ্ছন্দে তামাক খান।

আর অমূল্যর এমন অভ্যাস-দোষ, আলো থাকলে কিছুতে ঘুম হয় না। ভবতারণকে মিনতি করে, দেখুন—দিনমানে তো কলুর বলদ হয়ে পাঠশালার ঘানি ঘোরাচ্ছি, রাতের বেলা একটু না ঘুমুলে বাঁচি কি করে ?

সজোরে সুখটান দিয়ে নাকে-মুখে ধূম উদ্গীরণ করে ভবতারণ নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, তা ঘুমো না তুই। ঘুমোতে কে মানা করছে ? ঘুমিয়ে থাকবি—তাই তো চাই।

অমূল্য বলে, ঘড়ি-ঘড়ি উঠে জালাতন করছেন, ঘুমোবার উপায় আছে ?

ভবতারণ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, তিরিশ বছরের অভ্যেস। তোর ঘুমের জন্যে তামাক ছেড়ে দিতে বলিস নাকি রে বেটা ?

অমূল্য তাড়াতাড়ি বলে, তা খান না আপনি তামাক। তামাক ছাড়তে

বলব কেন? বললে আপনি শুনবেনই বা কেন? টেমিটা যদি না জ্বালেন। চোখে আলো পড়লে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয়, আসরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছি।

ভবতারণ বলেন, টেমি না জেলে কি আঙুল দিয়ে টিকে ধরাব? ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নে—চোখ বুঁজে থাক্।

গেরো কি একরকম! বলবন্ত নাক ডাকতে লেগেছে এদিকে। ঘুম যত গাঢ় হবে, বলবন্তর নাসাগর্জন উগ্র হয়ে উঠবে ততই।

অমূল্য বলবন্তর গায়ে নাড়া দেয়।

লাও ঠেলা। তুমি যে আবার নাকের বাজনা শুরু করলে!

ভবতারণ রসিকতা করেন, আসরের মধ্যিখানে রয়েছিস তো তুই। বাজনা হচ্ছে, আর কি—নাচতে শুরু করে দে।

ঘুম ভাঙে না বলবন্তর। প্রথমে মোলায়েম ভাবে ঝাঁকাচ্ছিল, শেষটা রদ্দা মারতে লাগল। কিছুতে সাড় নেই। মুগুর দিয়ে পিটলেও বোধ করি অবস্থার ইতর-বিশেষ হবে না।

কুলুঙ্গিতে সরষের তেলের বোতল। পালোয়ান বলবন্ত দৈনিক দু-ঘণ্টা তেল মাখে—তার নিজস্ব তেল, অমূল্যর দুর্দম ইচ্ছা হয়, আস্ত তেলের বোতল আছড়ে ভাঙে বলবন্তর মাথায়। হাত বাড়িয়ে—বোতল নয়, ছিপিটা খুলে নিল। নাকে ছিপি পরিয়ে আওয়াজ রোধ করা যায় কিনা! কিন্তু সাধ্য কি—প্রশ্বাসের বেগে বুলেটের মতো ছিপি ছিটকে এসে পড়ে।

কি ফ্যাসাদে ফেললি হায় বীণাপাণি! এ কি নিদারুণ পরীক্ষা রে তোর!

রাতের এই গতিক। দিনমানটা সে প্রসন্ন পণ্ডিতের জিম্মায়। পণ্ডিতের ছাত্রবৃদ্ধি মলয় আর অমূল্য—ঐ দুইটি মাত্র, দুয়ের বেশি তিন হল না এতদিনের মধ্যে। ইন্দ্রাণীর চেষ্টার কসুর নেই—যাকে পাচ্ছেন পাঠশালায় ছেলে পাঠাতে বলেন। ভবতারণকে দিয়েও বলাচ্ছেন। সকালবেলা নিয়মিত বেড়াতে বেরোন

ইন্দ্রাণী—বেড়িয়ে ফিরবার সময় পাঠশালায় চেপে বসেন কখনো কখনো। অপরাহ্নে ক'দিন থেকে দুধ পাঠাচ্ছেন ছেলেদের জন্য। সকাল-সন্ধ্যা প্রসন্ন প্রাণপণ চিৎকারে তাঁর বাংলা-ইস্কুলের বিদ্যা জাহির করছেন ছাত্র এবং কাছারিতে আগন্তুক প্রজাপাটকের সামনে। কিছুতে কিছু হয় না।

নামতা পাঠ হচ্ছিল। কাছারি-দালানে হাতবাক্সর পিছনে উবু হয়ে জমা-খরচ টুকতে টুকতে ভবতারণ মুখ খিঁচিয়ে উঠিলেন, মিনমিন করে যেন বীজ-মন্তোর আওড়াচ্ছে হতভাগারা। চেঁচাতে পারিস নে—গলায় জোর নেই? চালের ভাত খাস—না, সাবুদানা খেয়ে এসেছিস? লোকে জানুক—হ্যাঁ, পাঠশালা হচ্ছে। হাঁক-ডাক শুনে তবে তো আর দশটা ছেলে আসবে?

খানিক পরে পৈঠা দিয়ে নেমে আড়ামোড়া ভেঙে ভবতারণ ছাঁচতলায় এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখে পরম বিস্ময়ে বললেন, ও পণ্ডিত, এ কি কাণ্ড—এই ক'টিতে এসে ঠেকেছে?

প্রসন্ন বিমর্ষভাবে বলেন, নতুন আসার নামগন্ধ নেই, রোজই একটা-দুটো করে কমছে। ভাবিত হয়ে পড়ছি চাটুজ্জে। মা-জননী ইস্কুলের ভার নিয়ে নিলেন, তা ছেলেই যদি পড়তে না আসে, কিসে কি হবে বলো?

ভবতারণ বলেন, ঐ—ঐ কচুবনের কালাচাঁদ। একেবারে আদা-জল খেয়ে লেগেছে।

প্রসন্ন ঘাড় নেড়ে সমর্থন করেন।

খবরও পেলাম, কয়েকটা এর মধ্যে জুটেছে গিয়ে তার ঐ ইস্কুলে।

ভবতারণ গর্জন করে উঠলেন, ইস্কুল কিসের? আড্ডাখানা বলো—

প্রসন্ন বলেন, তা সত্যি। তবে এ-ও বলি, চাষের মরশুম আসছে কিনা—ইস্কুল ছাড়িয়ে এবার চাষারা ক্ষেতের পান্তা বহাবে ছেলেদের দিয়ে।

এক টিপ নস্য নিয়ে নাক ঝেড়ে তিক্তবিরক্ত মুখে তিনি বলতে লাগলেন, ছ্যাচড়া—পরম ছ্যাচড়া স্থান। বিশ বছর দেখে আসছি তো!

ভবতারণ সহসা এক আশ্চর্য কথা বললেন, ছেলে-ছেলে করছ পণ্ডিত, তোমার পাঠশালা বোঝাই করে দিতে পারি ছেলে দিয়ে।

অমূল্য শ্লেট নিয়ে এসে দাঁড়াল পণ্ডিতের জলচৌকির সামনে। প্রসন্ন বললেন, কিন্তু এ রকম ছেলে নয়—

ভবতারণ চোখ টিপে বলেন, আদর-বিবির চাদর গায়, পুলি-পিঠের লেজ গজায়! পেয়ারের পোলা—হুঁস রেখে কথা বলো পণ্ডিত।

প্রসন্ন সন্ত্রস্ত ভাবে এদিক-ওদিক তাকালেন।

সাধে বলি—মনের দুঃখে বলে ফেলি। ধরো—সেই মুখ-আঁধারি থাকতে পণ করে বসেছি, স্বরবর্ণ ক'টা শেখাবোই। তা দেড় পহর হতে চলল, এখনো মশাই কূল নেই, কিনারা নেই—অথই সমুদ্দুর। বড় বড় করে লিখে দিয়েছি, তাই দেখে দেখে লিখতে বললাম—এতক্ষণ পরে এই চিত্রকর্ম করে এনেছে।

সজোরে কান টেনে অমূল্যর মাথা নুইয়ে আনলেন নিজের কাছে। বলেন হাঁড়ি-কলসি মণ্ডা-জিলিপি এর কোন্‌টা কি অক্ষর হল, বুঝিয়ে দে ব্যাখ্যা করে—

ভবতারণ হেসে উঠলেন। এবারে অ-আ—মাত্র এই দুটি অক্ষর বড় বড় করে শ্লেটে লিখে প্রসন্ন বললেন, দাগা বুলোগে যা। না দেখে যখন এই দুটো লিখতে পারবি, তখন ছাড়ব। দেখা যাক ক'দিন কি ক'মাস লাগে। তোর সঙ্গে সঙ্গে আমিও রইলাম বসে। পনের-বিশ দিন হতে চলল, উঃ—মা-জননীর কাছে মুখ দেখাই আমি কি করে?

অমূল্য স্বস্থানে গিয়ে বসে। নামতা পাঠ সমাধা হয়েছে। প্রসন্ন হুকুম করলেন, বুড়ি—। অর্থাৎ ধারাপাতের বুড়িকিয়া পড়তে হবে অতঃপর।

আদেশ দিয়ে উঠানে ভবতারণের কাছে এলেন।

ছেলের কথা কি বলছিলে ভায়া?

বাঁকা হাসি হেসে ভবতারণ বলেন, ঘর-বারান্দা ছাপিয়ে উঠোনে নিয়ে ছেলে বসাতে হবে, এমন অবস্থা করতে পারি।

প্রসন্ন তাঁর হাত জড়িয়ে ধরলেন।

তা পারো তুমি, তোমার মবলগ বুদ্ধি।

ভবতারণ ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, বুদ্ধি

ঠিক—পারাও যায়। শুধু টালবাহানা করছি, গোড়াতেই স্থচিকাভরণ প্রয়োগ করব কিনা।

মরণোন্মুখ রোগিকে শেষ চেষ্টা হিসাবে স্থচিকাভরণ দেবার বিধান। পাঠশালা প্রসঙ্গে ঔষধটার মানে কি দাঁড়াচ্ছে প্রসন্ন ধরতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করবারও ফুরসৎ হল না—ইন্দ্রাণী বেড়িয়ে ফিরছেন। প্রসন্ন দাওয়ায় উঠে যথারীতি জলচৌকিতে বসলেন, ভবতারণ এগিয়ে গেলেন আপ্যায়ন করতে।

বড্ড যে বেলা হয়ে গেছে মা, রোদ চড়ে উঠেছে।

ইন্দ্রাণী বললেন, হাঁটতে হাঁটতে সেই বুনোপাড়া অবধি গিয়ে পড়েছিলাম। বড্ড ভাল ওরা, ভারি যত্ন করে। কথাবার্তায় বেলা হয়ে গেল। ছাতা ছিল, কষ্ট হয় নি।

দেউড়ি অতিক্রম করে ছাতা বলবন্তকে দিয়ে দিয়েছেন। অনেকটা পিছনে সে কথা বলছে কার সঙ্গে।

অমলা বলে, চাটুজ্জে-দাদা, বুনোপাড়া—বুনোপাড়া ছাড়িয়ে যে গড়ের খাল —অদ্দূর নাকি আমাদের এলাকা? বলবন্ত বলছিল।

আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাসি হেসে ভবতারণ বলেন, বলবন্ত মিথ্যে বলে নি। উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম যে দিকে দু-চোখ যায়, সমস্ত তোমাদের। কোন বেটা-বেটির ফুটানি মারবার জো নেই এলাকার মধ্যে এসে।

নির্মলের কাছে সেদিনকার সেই অপমান অহরহ কাঁটার মতো খোঁচা দিচ্ছে অমলার মনে।

কুঠির জঙ্গলও তো আমাদের?

আলবৎ। মালেকান স্বত্ব আছেই, তার উপর গ্রাণ্ট-কুঠিয়ালের ভাগ্নে টমাস সাহেবের পাট্টা সূত্রে খাস দখলিকার ছিলেন স্বর্গীয় বুড়োকর্তা রামকিশোর রায় মশায়—

তবে দাদা, সেদিন যে দেখে এলাম—জঙ্গল কেটে ঘরের পর ঘর তুলছে, চাষবাস করছে—

ভবতারণ চমৎকৃত হলেন। ইন্দ্রাণীকে বলি-বলি করে যা বলেন নি—বলতে সাহসে কুলোয় নি—সেই আলোচনার সুযোগ করে দিল অমলা।

আড়চোখে ইন্দ্রাণীর দিকে এক নজর চেয়ে বললেন, এক আধেলা পয়সাও সেরেস্তায় দেয় না ঐ বাবদ। থাচ্ছে—তা-ও একেবারে মাগনা।

ইন্দ্রাণী আশ্চর্য হয়ে বলেন, সে কি? কিছু বলেন না তো আপনারা!

আমি চুনোপুঁটি—আগ বাড়িয়ে কি বলতে যাব? শুনবেই বা কেন আমার কথা?

ইন্দ্রাণী বললেন, এতদিন এসেছি—ঘুণাক্ষরে শুনি নি এসব—

তবে দেখুন। আপনাকেও একটাবার জিজ্ঞাসার পিত্যেশ নেই। তাই তো বলি—জানতপক্ষে কেউ বুকে বসে দাড়ি উপড়াতে দেয়? ফক্কড়টা যে কি গুড়-মন্তোর ছেড়েছে ম্যানেজার বাবুর কানে—

ম্যানেজার? ম্যানেজার আবার কে?

ভ্রূকুটি করলেন ইন্দ্রাণী।

থতমত খেয়ে ভবতারণ বলেন, হরিতোষবাবুর কথা বলছিলাম।

ইন্দ্রাণী বললেন, ম্যানেজার নন তিনি—অমলা-মলয়ের জ্যেঠাবাবু। আপনাদের বাবুর পরম বন্ধু ছিলেন—দয়া করে এস্টেট দেখাশুনা করেন। তিনি হুকুম দিয়েছেন যখন, তার উপর আর কথা নেই।

পাকা গুঁটি কেঁচে যায় দেখে ভবতারণ তাড়াতাড়ি সামলে নেন।

হাতে-পায়ে ধরাধরি করছিল, ম্যানেজার—থুড়ি, হরিতোষবাবু সদাশিব মানুষ—হাত এড়াতে না পেরে সরল বিশ্বাসে একখানা দোচালা ঘর তোলবার অনুমতি দিয়েছিলেন বুঝি! তিনি অনুপস্থিত বিধায় কি কাণ্ড করছে দেখুন গে।, নিদেন পক্ষে দশটি বিঘে বেদখল করে দেদার ধান-আখ-তরিতরকারি লাগাচ্ছে বাঁশঝাড় কেটে বেছাপ্পর করছে।

ইন্দ্রাণীও বিরূপ নির্মলের প্রতি। বললেন, নিজের চোখে দেখতে চাই আমি। যা বলছেন, তা-ই যদি হয়—বিহিত করতে হবে।

খুব তাড়াতাড়ি। আমি বলি, কালই চলুন। আইন বড় যাচ্ছেতাই—একবার শিকড় গেড়ে বসতে পারলে সরানো দায়। মূল্যবান সম্পত্তি মা···আমার তো হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে। প্রসন্ন এসে নাক কাঁদছিল, ছেলে ভাঙিয়ে

নিচ্ছে। আরে, তোমার তো এক পুঁটকে পাঠশালা—এস্টেটের মবলগ টাকা উড়েপুড়ে যাচ্ছে—

ডা'কপাখির ডাকে আলোচনা চাপা পড়ল। ভীম আর হাড়ো ইন্দ্রাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

অমলা বলে, সেদিন দেখেছিলাম তো তোমাদের ?

আজ্ঞে, মাস্টেরের ওখেনে। মাস্টেরই পাঠায়ে দেছে। সে বাবুডি কোয়ানে?

ইন্দ্রাণী বললেন, কে ?

সেই যে বন্দুক নিয়ে গিয়েলেন।

ভীম বলে, আমরা ভাবতিছিলাম, চলে গেলেন বুঝি হানতে—পাখি ধরতি মেলা দিন লা'গে গেল। জোরজারির কর্ম তো নয়—ভুলোয়ে-ভালায়ে ফাঁদে আ'নে ফেলতি হয়। মরজি হলি তবে আসে।

চারটে পাখি—একত্র পায়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা। বাঁশের খাঁচার ভিতরে আর একটা।

অমলা জিজ্ঞাসা করে, ওটা আলাদা কেন ?

ভবতারণ পাখি ধরার প্রণালী বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

খাঁচার ঐটেই তো আসল, দিদি। শিস দিলে ডাকে। ডাক শুনে ঝোপ-ঝাড়ের পাখি কাছে ছুটে আসে। আসতে গিয়ে ফাঁদের রশিতে আটকা পড়ে যায়। যত্ন করে শিখিয়েছে পাখিটাকে—ভাত-ভিত্তি ওদের—ওটা বেচবে না।

হাড়ো সর্দার বলে, কোনডাই বেচপানে না। বেচার হলি হাটে যাতাম। এমনি দিতি আইছি।

উঠানে আচম্বিতে ডা'কের ডাক শুনে অশোকও চলে এসেছে। হাড়ো বলল, এই কডা নেন বাবু। সেদিন অনাকারণ জল-কাদা ভাঙিলেন, কত অব্যেঘাত হয়েল—

ভবতারণ বললেন, অকারণ হবে কেন রে ?-কত পাখি মেরে এনেছিলেন—

হাড়ো ও ভীম মুখ তাকাতাকি করে।

এট্টাও উনি মারেন নি—

অমলা সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, বলো কি? কে মেরে দিল তবে?'

মাস্টের—

খিল-খিল করে হেসে উঠল অমলা। অশোক কিন্তু বেকুব হয় না। বলে তাই যদি হয়—হাসবার কি আছে এত? সাহিত্যিক বই লিখে দেয়, পারসোন্যাল সেক্রেটারি বক্তৃতার তালিম দিয়ে দেয়, শিকারি শিকার করে দেয়, চোর-জোচ্চোরেরা বৃহত্তর চুরির আশায় নেপথ্য থেকে টাকা দান করে—আর ভাগ্যবানেরা দু-হাতে যশ কুড়িয়ে বেড়ান। এই তো সমাজের রীতি—

অমলা ভীমের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, মাস্টার শিকার করতে পারে? পাঠশালার পণ্ডিতের এত ক্ষমতা? বলো কি!

এক গাল হেসে ভীম বলে, এ বড় আচ্ছা মাস্টের! য্যানতে-স্থানতে দেওড় করে, আর টুপটাপ যেন পাকা আম পড়তি লাগল। ও মাস্টের আর-জন্মে ব্যাধের পোলা ছিল।

ভবতারণ বলেন, সর্বনেশে মাস্টার—জানেন না আপনারা। মানুষ মারতে পারে, সে লোক দুটো পাখি মারবে, এ আর কত বড় কথা!

ইন্দ্রাণী শিউরে উঠে বলেন, খুনি?

সুযোগ পেয়ে নির্মলের বিরুদ্ধে ভবতারণ আরও কিঞ্চিৎ বিষোদ্গার করেন। খুনের জোগাড় করে এনেছিল মা। রামা-শ্যামা নয়—রাজগোষ্ঠী—সাদা সাহেব। বুঝুন। চৌবাচ্চার মধ্যে এই গাদা-গাদা বোমা। কতটুকু তখন ও—ইস্কুলে পড়ে, মুখ টিপলে দুধ বেরোয়। আজকে বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া। কোনদিকে জুত না পেয়ে পাঠশালা খুলেছে। সাহেব মারা ছাড়ান দিয়ে প্রসন্নর অন্ন মারতে লেগেছে।

ইন্দ্রাণী চলে যাবার মুখে আবার বললেন, তাহলে কালকেই যাচ্ছি ওদিকে—

অমলা অশোককে বলে, শিকারে যাওয়া হচ্ছে। বন্দুকে আবার তেল-টেল দিতে লেগে যান।

অশোক মুখ টিপে হেসে বলে, সবই তো জেনে ফেলেছ। এক শিকারের গায়ের ব্যথা মরে নি এখনো—

এবারে পাখি নয়—মানুষ। যার সঙ্গে অত ভাব করে এলেন।

অশোক বলে, কিন্তু বড় যাচ্ছে-তাই বন্দুক যে তোমাদের! যেখানটা তাক করা যায়, তার বিশ হাত দূরে গুলি গিয়ে লাগে।

অমলা বলে, বিশ হাত সরিয়ে তবে তাক করবেন। গুলি ঠিক গায়ে লাগবে।

রাগ পড়ল না কিছুতেই?

রাগ বাড়ছে। শুনলেন তো—এত কাণ্ড করে এসে জঙ্গলের মধ্যে এখন মাস্টারি করতে বসেছেন। অতি অপদার্থ। মানুষের সমাজে থাকা উচিত নয় এমন লোকের।

১৫

হাট করে ভবতারণ বাড়ি চলেছেন। ধামা-ভরতি হাট-বেসাতি। রায়বাড়ির সওদা বলবন্ত নিয়ে গেছে, তাঁর ধামার জিনিষপত্র শঙ্করীবালার জন্য।

দু-সংসারের হাট এক সঙ্গে হয়—খরচটা অবশ্য সম্পূর্ণ রায়-এস্টেটের। আজ নয়-বহুকাল ধরে এমনি চলে আসছে। মাছ-তরিতরকারি কিনে কিনে ভূষণ দাসের দোকানে রাখা হয়, একটা আলাদা ধামা থাকে সেখানে। যাই কিছু কেনা হোক, তার কিয়দংশ পড়ছে ঐ ধামায়। বলবন্ত সমস্ত জানে। সে আপত্তি করে না, শুধু রসিকতা করে মাঝে মাঝে। প্রক্রিয়াটাকে বলে তোলা-দান। হাটের ইজারাদার প্রতি ব্যাপারির কাছ থেকে একটা-দুটো যেমন জিনিষ তুলে নেয়, এ-ও তেমনি তোলা-আদায়ের ব্যাপার আর কি! তিন কুড়ি কই মাছ কেনা হল, তার গোটা পাঁচ-সাত পড়ল ভবতারণের ধামায়। পান কেনা হল, গণ্ডা তিনেক বের করে নিল বিড়ে থেকে। কাঁচকলার ছড়া থেকে ভেঙে রাখল দুটো। এমনি প্রতিটি জিনিষ।

ভবতারণের যা কাজ—আগেও রায়বাড়ি পড়ে থাকতে হত, কিন্তু ইন্দ্রাণীদের আসবার পর থেকে নিজের বাড়িঘরে যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে এসেছে।

কখন কিসের দরকার পড়বে, বলা যায় না। ম্যানেজার অনুপস্থিত থাকায় দায়িত্ব বেশি বর্তাচ্ছে। ম্যানেজার বললে তো আগুন হবেন ইন্দ্রাণী—হরিতোষ-বাবু। হরিতোষ—হরিতোষ—হরিতোষ—রপ্ত করে নিচ্ছেন ভাল করে। নির্মল শুধু নয়—হরিতোষেরও কীর্তিকাহিনী জনসমাজে জাহির করবেন, এই তাঁর পণ। কথাবার্তায় মনে হবে, ভদ্রলোক ধর্মের বস্তা পিঠে বয়ে বেড়াচ্ছেন—আসলে রাঘব-রোয়াল তিনি একটি। একাই সমস্ত গ্রাস করবেন, ভাগ দেবেন না কাউকে। সরকারি চাকরির সাহেব-সুবো চরিয়ে এসেছেন দীর্ঘকাল—অতিশয় ঝানু—তাই এমন নিখুঁত তাঁর কাজকর্ম যে, ধরা-ছোঁওয়ার উপায় নেই। কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন ভবতারণও।

এই নির্মলের ব্যাপার দেখ না। গ্রামে ফিরে এসে সর্বপ্রথম ভক্তিযুক্ত হয়ে প্রণাম করেছিল সে ভবতারণকে। করবে তো বটেই—তিনি ছাড়া সে আমলের পূজ্য গুরুজন আর কে আছে? ভবতারণও মিষ্টি কথায় সম্ভাষণ করেছিলেন।

ফিরে এলে বাবাজি? এসো, এসো। কত কষ্ট করে ইংরেজ তাড়ালে, সকল দুঃখের অবসান হল। এবার তোমরাই কর্তা, দু-হাত তুলে সেলাম করব তোমাদের। ভালই হল বাবা, লালমুখো এক একটা দুশমন—সামনে গেলে বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করত, একবর্ণ কথা বোঝা যেত না। আপদ চুকেছে, বাঁচা গেছে।

নির্মল বলে, ইস্কুল করছি একটা। কুঠিবাড়িতে পতিত জমি আছে, ঐখানে ঘর তুলব।

ইস্কুলের কথা শুনে দমে গেলেন ভবতারণ।

সে কি বাবাজি? রাজ্য পাবে রামচন্দর, কলা খাবে যত বান্দর? এত স্বদেশি কাজকর্ম করে তোমার আজকে এই দশা?

খারাপ দশা কি দেখলেন?

কতই সব লাট-বেলাট হয়ে যাচ্ছে, তুমি পচা গাঁয়ে পড়ে মাস্টারি করবে? ও সব বিদ্যে শেখা হয়নি যে!

ভবতারণ সহজ ভাবে কথাটা নিলেন। সদুঃখে ঘাড় নেড়ে বলেন, তবেই বোঝ, কত বড় ভুল করেছ! পেটে বিদ্যে না থাকলে কোথাও খাতির নেই। জেলে গেছ বলেই কি আর সত্যি সত্যি জেলার গদিতে নিয়ে বসাবে? কাজ চালাতে হলে হরবখত ইংরেজি কইতে হবে। হেঁ-হেঁ—চালাকি নয়।

নির্মল বলে, ঠিক বলেছেন।

উৎসাহিত হয়ে ভবতারণ বলতে লাগলেন, দুই রকম স্বদেশি কর্মী আছে। মিটিং হবে—এক দল চেয়ার-বেঞ্চি সাজায়, পাঞ্চ-আলো পাম্প করে। চিরকাল ধরে দেখছি, তারা ঐ কর্মই করে গেল। আর এক দল গাড়ি চড়ে এসে মিটিঙে বক্তৃতা দিয়ে যায়। এক এক কথা বলে, আর হাততালি। তোমরা বাবাজি হলে বেঞ্চি-বওয়া দলের। চিরকাল বেঞ্চি ঠেলেই যেতে হবে।

নির্মল বলে, কপাল ছাড়া পথ নেই খুড়োমশাই। সে যাই হোক—কিছু জমির দরকার ইস্কুলের জন্য। সেইজন্য এসেছি।

বেশ তো! আমি রয়েছি, ভাবনা কিসের? কিচ্ছু আটকাবে না। একটা বন্দোবস্ত করে ফেল।

নির্মল বলে, ম্যানেজার বাবুটি লোক কেমন?

ভবতারণ উদাসভাবে বলেন, মোটা মানুষ, মস্ত সরকারি কাজ করে এসেছেন, বিদ্যে-বুদ্ধিও শুনতে পাই পাহাড়-প্রমাণ—লোক মন্দ হবেন কেন?

একদিন দেখা করি গিয়ে। কি বলেন?

ভবতারণ বলেন, খাঁইও বাবাজি দেহের অনুপাতে হবে কিন্তু। একটুখানি জংলা জমি—পোষাতে পারবে কেন? তার চেয়ে খুশি মনে আমাদের কিছু পান খেতে দিও, যাকে যা বলতে হয় বলে-কয়ে ঠিকঠাক করে দেবো। তোমায় হাঙ্গামা পোয়াতে হবে না।

কিন্তু সদ্‌যুক্তি নির্মল কানে নিল না, হরিতোষের সঙ্গে সোজাসুজি দেখা করল। সৌম্যদর্শন প্রবীণ ব্যক্তি, দেখে শ্রদ্ধা হয়। সদালাপীও। জঙ্গল কেটে ইস্কুল করবার প্রস্তাবে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, অত দূরে কুঠিবাড়ি

পছন্দ করলে কেন হে? রায়বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যেই কত বড় জঙ্গল—দেখতে পাও না? কেটে কুটে নিয়ে এইখানেই বসাতে পার ইস্কুল।

নির্মল বলে, রায়বাড়িতে রয়েছে আর একটা। জমিদার প্রতিপালন করেন, সে ইস্কুলের কত ইজ্জত! আমাদের সামান্য আয়োজন—এমন বৃহৎ জায়গায় বসে সোয়াস্তি পাব না তো!

হরিতোষ বললেন, তা বটে! প্রসন্ন পণ্ডিত মশায় এক একদিন সকালবেলা বসেন বটে ছেলেপিলে নিয়ে! ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ—কুঠিবাড়িতেই বোসো গে তবে।

নির্মলের পূর্ব ইতিহাস শোনা ছিল হরিতোষের। কৌতুক-কণ্ঠে তিনি বললেন, আবার বোমা-পিস্তল বেরুবে না তো জঙ্গলের ভিতর থেকে? ঠিক করে বলো।

নির্মল বলে, হাইড্রোজেন-বোমার যুগে হাতবোমা কি কাজে আসবে? মানুষ হল আসল—হাইড্রোজেন-বোমা যারা বানিয়েছে। আশীর্বাদ করুন, ওখান থেকে যেন মানুষ বেরোয়—

যে-মানুষ হাইড্রোজেন-বোমা বানাবে?

নির্মল হেসে বলে, আজ্ঞে না। হত্যার যুগ উত্তীর্ণ করে দেবে যে মানুষ।

প্রকাশ্য কথাবার্তা এবম্বিধ। কিন্তু শুধুমাত্র মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজেছে—জমিদারি সেরেস্তায় চুল পাকিয়ে এমন ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ব্যাপার বিশ্বাস করেন না ভবতারণ। আর কিছু নয়—হরিতোষ একাই গ্রাস করলেন, একটা পয়সা কাউকে ভাগ দিলেন না—এই দুঃখ। অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও লেনদেনের একটা আন্দাজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। ভবতারণ ক্ষেপে আছেন। ইন্দ্রাণীকে তাতিয়ে আজকে বড় খুশি। কর্ত্রী স্বচক্ষে দেখুন বাঁশ-খড় ও সম্পত্তির খোয়ার। দেখে অন্তরাত্মা জ্বলে ওঠে কিনা, বিশ্বাস কতটা বজায় থাকে হরিতোষের উপর —সেই সময় বোঝা যাবে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার মজা বোঝাতেই হবে নির্মলকে।

মনের উল্লাস শঙ্করীবালার কাছে কথায় কথায় প্রকাশ করে ফেললেন।

কালকে যাচ্ছি আমরা—

উদ্বিগ্ন স্বরে শঙ্করী জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

হি-হি করে হেসে ভবতারণ বললেন, এই তত্ত্বতল্লাস নিতে আর কি ! মুরুব্বি হরিতোষটা সরেছে—বড্ড একা পড়ে গেছে কিনা বেচারি !

মুহূর্তকাল শঙ্করীবালা কি ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, আলো নিয়ে একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে। এখনই।

কোথায় ?

নির্মলকে একটা খবর দিয়ে আসব। রায়গিন্নি দক্ষযজ্ঞ বাধাবে বুঝতে পারছি। সে-ও তৈরি হোক।

ভবতারণ অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করলেন নিজেকে।

দাঙ্গাহাঙ্গামা চাইছ ? দেড়-পয়সার মাস্টার, পেরে উঠবে সে রায়-এস্টেটের সঙ্গে ?

শঙ্করী তিক্ত কণ্ঠে বললেন, জঙ্গল কেটে ভাল জিনিস গড়ে তুলছে, অমনি চোখ টাটাচ্ছে। মানুষ না কি তোমরা ? গিন্নির ঠ্যাং দুটো কাল মুচড়ে ভেঙে দিতে পারে, তবে বলি বাহাদুর !

ভবতারণ অনুতপ্ত হলেন ঘরশত্রু-বিভীষণের কাছে কথা ফাঁস করে ফেলার জন্য। এস্টেটের কর্মচারী ঠ্যাং-ভাঙার অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করতে পারেন না তো—শঙ্করী কইমাছ ক'টা জিয়োতে গেছেন, ফাঁক বুঝে সেই সময় সুড়ুৎ করে তিনি সরে পড়লেন।

আয়োজন পরিপাটি। এমন কি প্রসন্ন পণ্ডিতও চলেছেন গুটি-গুটি সকলের পিছনে। ভবতারণের নির্বন্ধে মজা দেখতে যাচ্ছেন। রবিবারে আজ পাঠশালা বন্ধ।

বিলে পড়বার মুখে এক কাণ্ড হল। ভীম সর্দার এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। প্রণাম চুলোয় যাক, মাথাটাও নিচু করল না ইন্দ্রাণীর দিকে। বলে, যা'য়ে না ঠাকরুন।

কেন ?

যা'য়ে তো ঘর-দোর ভাঙবানে, কাঁকুড়গাছ ছিঁড়বানে, নাঙল দেবানে বীজ-ক্ষেতে।

ধ্বক করে জলে উঠল ইন্দ্রাণীর দু-চোখের দৃষ্টি।

সব খবরই পেয়ে গেছ দেখছি। এস্টেটের খাস-জমির উপর যা ইচ্ছে আমরা করব। বাইরের লোকের বলবার কি এক্তিয়ার আছে ?

ভীম থতমত খেয়ে যায়। স্বর নরম করে এবার বলে, আমাগোর বুনো-পাড়ায় হুটকো ছোঁড়াগুলো হম্বিতম্বি করতিছে। একখানা কাণ্ড করে না বসে, তাই কতি আয়েলাম।

কওয়া তো হয়ে গেল? যাও—তোমাদের মাস্টারকে খবর দাওগে। যাদের ডাকবার—ডেকে ডুকে নিয়ে আসুক।

মাস্টের কি জানে? মাস্টেররে কয়ে আইছি নাহি ?

লম্বা পা ফেলে ভীম চলে গেল। ভবতারণ বলেন, এই—এই সমস্ত করে। ইস্কুল-টিস্কুল ভাঁওতা। যত চাষাভুষো জুটিয়ে দল পাকায়।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করেন, বরকন্দাজ ক-জন আছে সদরে ?

আট জন—বলবন্ত ছাড়া।

সবাইকে নিয়ে এসো বলবন্ত। তাড়াহুড়োর দরকার নেই—ধীরে সুস্থে এসো তোমরা।

অতএব ঝড় আসন্ন বলেই ঠেকছে। ভবতারণের আনন্দের অবধি নেই। নির্গোলের কাজে সুখ নেই, পেটও ভরে না। হাত নিস-পিস করছে—হুকুমটা একবার পেলে হয়। যা বলে গেল ভীমেটা—বরকন্দাজদের সহযোগে চক্ষের পলকে উপড়ে ফেলবেন খোড়ো ঘর। কাঁকুড়-ক্ষেত ও ধানের বীজতলা গরু দিয়ে খাওয়াবেন। বুনো ছোঁড়া দু-চারটে এসেও পড়ে যদি, তাদের মুরোদ জানা আছে—একলা বলবন্তর লাঠির সামনেই দিশে পাবে না পালাতে। সবই, দেখা যাচ্ছে, জানাজানি হয়ে গেছে—শঙ্করীবালা ছাড়া আর কে হতে পারে এর মূলে ?

নির্মল রাস্তার তেমাথা অবধি এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন কাউকে তো দেখা যায় না। যদি জোগাড় হয়ে থাকে, সরিয়ে রেখেছে এদিক-ওদিক। একা দাঁড়িয়ে—বুকের পাটা আছে বটে! বুকের পাটার পরিচয় আকৈশোর দিয়ে এসেছে অবশ্য। আর শয়তান কি রকম—মনের বিষ মনে রেখে সমাদরে সে অভ্যর্থনা করল, যেন পরম কুটুম্বেরা এসেছেন।

আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়—

সাহেবদীঘির গর্ভে পায়ে-চলার পথ পড়ে গেছে। উত্তর পাড়ে কুঠিবাড়ি। সাবেক আমলের বাড়িগুলো ভূমিসাৎ হয়েছে, পাতলা পাতলা ইটের পাহাড়। নীলখোলাটা জুড়ে বিস্তীর্ণ নাটাবন। এককালে বাঁধানো খোলাট ছিল—এখন সাপ ও বুনো-শূয়োরের আস্তানা। কেউটে-সাপ বেরিয়ে পথে-ঘাটে বেড়ায়, কাটি-ঘায় মারা যায় অনেক মানুষ প্রতি বছর। সাপও দশ-বিশটা মারা পড়ে। কেঁদো-বাঘ আসে মাঝে মাঝে—গৃহস্থের গরু-ছাগল মেরে টেনে নিয়ে আসে এই অবধি।

জন্তু-জানোয়ার ছাড়াও অশরীরী অপদেবতারা আছেন। সাধুবর নামক এক চাষী মোড়ল গ্রাণ্ট কুঠিয়ালের পিটুনিতে মুখে রক্ত উঠে মরেছিল নাকি নীলখোলার উপর। ঘরে আগুন দিয়ে কারা অত্যাচারের পাল্টা শোধ নিয়েছিল। তার ফলে সর্বাঙ্গ দগ্ধ হয়ে বুড়ো গ্রাণ্ট মারা পড়ে। এঁরাই সব অপযোনি হয়ে আছেন। মৃত্যুপারে লড়াইটা কি রকম জমেছে, সঠিক কেউ জানে না। আমরা ঘুমিয়ে পড়লে তখনই ওঁদের দিনমান—চরে ফিরে বেড়াবার সময়। কার দায় পড়েছে—কে যাচ্ছে বলো রাত দুপুরে ঘুম কামাই করে? মানুষজন দিনের বেলাতেই পারতপক্ষে ওদিককার ছায়া মাড়ায় না।

না—যেত বটে কেউ কেউ। এখন নয়—বছর কুড়ি আগেকার কথা। রাতদুপুরেই যেত তারা।

অশোক বলে, চৌবাচ্চাটা কোথায়, দেখতে পাই?

কোন্ চৌবাচ্চা?

যেটা আপনাদের অস্ত্রাগার ছিল—

সেকালে এমনি এক গাল-গল্প কারা পুলিসের কানে তুলেছিল। সে-সব লোক এখনো আছে দেখছি।

অশোক বলে, এ-বাজারে সবাই বুক ফুলিয়ে আমি এ করেছি, আমি ও করেছি বলে আসর জমায়। আপনি আশ্চর্য মানুষ!

আবার বলে, সে দিন 'তুমি' 'তুমি' করে বলেছিলাম মশায়, ক্ষমা করবেন।

নির্মল বলে, তাই তো দেখছি। হঠাৎ কি অপরাধ করে বসলাম—

অনেক-কিছু জানা গেল কিনা আপনার সম্বন্ধে!

জানাশুনো হলে 'আপনি' থেকে 'তুমি' হয়ে যায়। আমার বেলা উল্টো?

চাঁদার টাকা হাতে পেয়ে ফিরিয়ে দিলেন, তখনই চমক লাগল। বুঝলাম, অসাধারণ ব্যক্তি।

ফিরিয়ে দিলাম অনেক বেশি পাব, এই আশায়। লোভ বেশি কিনা আমার!

অশোক হাসতে হাসতে বলে, সেটা বরাবরই।

নির্মল বলে, তা যা বলেছেন। ছেলেবেলা থেকে। সাধ্য না থাক, সাধটি বেশ প্রকাণ্ড।

সুঁড়িপথ বেয়ে জঙ্গলের দুর্গম অংশে চলেছে তারা। সকলে নয়, তিন জন— অশোক, অমলা ও নির্মল। অশোক-নির্মলের কথাবার্তার মধ্যে অমলা কখন জুটে পড়েছে। কিন্তু একটি কথা বলে না সে—নিঃশব্দে পিছু পিছু যাচ্ছে।

নীলকুঠি ধ্বসে পড়েছে, কিন্তু নীল পচান-দেওয়া বিশাল চৌবাচ্চা প্রায় অভগ্ন। কাঁটা-ঝিটকের ঝোপে তলদেশ ঢেকে গেছে। তাজা বোমা পাওয়া গিয়েছিল ঐখানে, আর বোমা তৈরির নানারকম মশলা। বাইরে যেমন জঙ্গল তেমনই—চৌবাচ্চার ভিতরটা সাফসাফাই করে নিয়েছিল। তাজ্জব হয়ে গেল এ অঞ্চলের লোক—বহুদৃষ্ট তুচ্ছ কুঠির জঙ্গল অকস্মাৎ সকলের চোখে রহস্যময় হয়ে উঠল। এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোক এসে নূতন করে দেখে যায় অতি সন্তর্পণে। ভাল করে চোখ তুলে দেখতে সাহস করে না—পাছে পুলিসের নজরে পড়ে। পুলিস গিসগিস করছে, সারা জঙ্গল তোলপাড় হচ্ছে। বুনো-

শুয়োরের দল সাহেবদীঘির মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে বাঁশবনের দিকে। খুব ধরপাকড় চলল দিনকতক। ছেলেছোকরা যত আছে, তাদের বাপ-মায়ের শঙ্কার অবধি নেই। কখন না জানি বাড়িতে পুলিস হানা দেয়।

নির্মল ইস্কুলের ছেলে—তাকেও ধরল। ঘোষপাড়ার মধ্যে তাদের বাড়ি। বাপ সম্পত্তিশালী ছিলেন একদা। সমস্ত ঘুচিয়ে কলকাতায় মার্চেন্ট-অফিসে চাকরি নিয়েছিলেন। খবর পেয়ে তিনি এসে পড়লেন, ধান-জমি বিক্রি করে বাড়ি-ঘরদোর বন্ধক দিয়ে মামলা চালালেন সুদীর্ঘকাল।

বয়স কম থাকায় এবং তার উপর বাপের স্থানে-অস্থানে দু-হাতে টাকা ছড়ানোর দরুন শেষ পর্যন্ত নির্মল ছাড়া পেয়ে গেল। কিন্তু মার্চেন্ট-মালিকরা নির্মল হেন ছেলের বাপকে বরখাস্ত করে দিলেন। তারপরে গ্রাম ছাড়লেন তাঁরা—একমাত্র ছেলেকে বিষাক্ত সংসর্গ থেকে কোথায় নিয়ে চলে গেলেন, কেউ খবর রাখত না।

সবাই ভুলে গিয়েছিল তাদের কথা। হঠাৎ এই মাস ছয়েক আগে নির্মলকে দেখা গেল আবার। গ্রাম ছাড়বার পরেই নাকি বাপ মারা যান, মা মরেছেন অতি-সম্প্রতি। মায়ের শেষকৃত্য চুকিয়ে নিরঙ্কুশ হয়ে ন্যাড়া মাথায় কুড়ি বছর পরে পিতৃপুরুষের গ্রামে ফিরেছে। সে আমলের ডাংপিটে বালক ভদ্রলোক হয়ে পণ্ডিতি করতে এসেছে।

চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে এসে নির্মল বুঝিয়ে দিচ্ছে, গরুর গাড়ি বোঝাই নীলের বাণ্ডিল নিয়ে আসত নীলখোলায়। ওজনদার ওজন দিত। তারপর সমস্ত বাণ্ডিল এনে ফেলত চৌবাচ্চার খোলে।

অশোক উঁকি দিয়ে দেখে বলে, ইটে-গাঁথা ছোটখাট পুকুর বললেই হয়—

নির্মল বলে, তা কম বাণ্ডিল পচান দিত না তো! সাহেবদীঘি থেকে কপিকলে কলসি কলসি জল তুলে চৌবাচ্চা ভরতি করত।

অশোক বলে, আর আপনারা কি কায়দায় ওঠা-নামা করতেন, সেইটে বলুন দিকি। সে-ও কি কপিকলে?

নির্মল হাসতে লাগল।

নইলে ভদ্রলোকের উপযোগী রাজবর্ত্মের কোন নমুনা তো দেখছি না। বলুন না নির্মলবাবু, গমন ও নির্গমের উপায় কি ছিল ?

নির্মল বলে, যে এত সমস্ত খবর বলেছে তার কাছ থেকে ওটুকুও জেনে নিন না।

এতক্ষণে অমলা একটি কথা বলে।

মন্ত্রগুপ্তির কি দরকার আর এখন ?

নির্মল প্রশান্ত চোখে তার দিকে তাকাল।

যা চুকে-বুকে গেছে, কি লাভ সেইসব অতীত কথা শুনে ? একটু স্তব্ধ থেকে দৃঢ়কণ্ঠে আবার বলে, সেইসব মাতামাতির রোমান্টিক ছবি চোখের উপর তুলে ধরা শুধুমাত্র অনাবশ্যক নয়—অন্যায়ও।

অন্যায় কেন ?

নির্মল বলতে লাগল, তখন ইংরেজ-রাজত্ব ছিল। সংগ্রাম করতে হয়েছে পরাধীনতা-মোচনের জন্য। শৃঙ্খলা ভাঙতে শেখানো হয়েছে সকলকে। শিখেছেও সকলে তাই। এখন উল্টো কথা বলছি, ভেঙো না—গড়ে তোলো এবার ভাই। অনভ্যাস—সে আর কারও মনে ধরে না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা পর্যন্ত দুঃখ করে, বয়সে বুড়িয়ে অন্যরকম হয়ে গেছি নাকি আমি।

বরকন্দাজের দল এসে গেছে। লাঠি-সোটা নিয়ে ছোটখাট এক সৈন্য-বাহিনী। কিন্তু ভবতারণ বিমর্ষ ; নির্লিপ্ত ভাবে তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে। প্রতিপক্ষের অভাবে সম্ভবত। আরও কারণ আছে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ইস্কুলের ছেলেদের ভাব জমে গেছে ইতিমধ্যে। আবার প্রসন্নও জুটে পড়েছেন ওদের মধ্যে। প্রতিযোগিতা যতই থাক, তাঁরই মতো আর একজন ছেলেপুলে নিয়ে রয়েছে—সামনা-সামনি এসে পড়ে প্রসন্ন চোখ বুঁজে থাকেন কি করে ? দুটো হিত-কথা না বলেও বা কেমন করে পারা যায় ?

ছেলেরা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। নির্মল দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে চলে এল।

খুব যে বকবক করছে! এরা ভাবে, এদের ইস্কুলের মতো ভূভারতে আর একটি নেই। কিন্তু দেখছেন তো—কিচ্ছু গড়ে তুলতে পারি নি, একেবারে কিছুই না।

খান চারেক চালাঘর সারি সারি। দ্রষ্টব্য এমন কিছু নয়—সাধারণ কারিগরি ইস্কুলে হামেশাই যেমন দেখা যায়। চাষের যন্ত্রপাতি, তাঁত-চরকা, ছুতোরঘর—সেখানে সদ্যসমাপ্ত টুল ও তক্তপোষ, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় খানকয়েক চার্ট এক জায়গায়, কয়েকটা মৌমাছির বাক্স—তার মধ্যে নূতন চাক বেঁধেছে···

মৌমাছির বাক্স খুলে মহোৎসাহে অতুল দেখাচ্ছে, কি ভাবে মৌমাছি এসে চাক বাঁধে এবং মধু জমলে কেমন কৌশলে সেইটুকু ভেঙে নিতে হয়।

ভবতারণ অমলার কাছে গিয়ে তাকে মধ্যস্থ মানেন। হচ্ছে তো এক পাঠশালা। তা অত জায়গাজমি বেড় দিয়েছে কোন্ কর্মে, ঘরই বা অত লাগবে কিসে? জিজ্ঞাসা কর তো দিদি। হাটবাজার বসাতেও তো এত লাগে না।

ভবতারণকে বিস্মিত করে ঝাঁঝালো স্বরে অমলা বলে, জিজ্ঞাসা আপনি করুন না। মারফতি কথা কেন?

তবু ভবতারণ নিরস্ত হলেন না।

আমি কে? এস্টেট দানপত্র করে দিন গে—আমার কি? পুরানো চাকর—মনে লাগে, তাই বলতে যাই।

নির্মলের কানে গিয়েছে। সে জবাব দেয়, আপনাদের ভদ্রপাড়ার বাতিল ঐ যে ওরা সব—সেদিন যাদের ভূতপ্রেত বললেন, ওরা এসে জুটছে। কাপড় বুনবে, কাঠের কাজ বেতের কাজ লোহার কাজ করবে। আর কি কি করানো যাবে, ঠিক করতে পারি নি এখনো। এত ব্যাপারে জমি তো বেশি লাগবেই। বর্ষা আসবার আগে ঘরের ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে, তখন কোন-কিছু বাইরে রাখা চলবে না। তাই ম্যানেজার বাবুর কাছে বাঁশখড় চেয়েছিলাম—

তাঁতঘরে ছেলেরা ইন্দ্রাণীকে ঘিরে আছে। ভবতারণ চকিতে সেইদিকে চেয়ে সংশোধন করে দেন, ম্যানেজার নয়—হরিতোষ বাবু।

নির্মল বলতে লাগল, নিতান্ত যেটুকু প্রয়োজন, তার এক কণিকা বেশি নেবো না। খড় তো গরু-মোষে কতক খেয়ে, কতক ডলেমলে নষ্ট করে। শুকিয়ে থাকে, পচে যায় বর্ষার জলে। আমাদের ঘর-ছাওয়ার কাজে লাগছে। ঘানিঘর, কামারঘর, গোয়ালঘর—তিনটে এখনো পুরোপুরি বাকি। বিজলী-ঘর করবার ইচ্ছে—ইলেট্রিসিটি সম্পর্কে ছেলেদের হাতে-খড়ি দেবো, কিন্তু এবারে হয়ে উঠবে না।

ভবতারণ শ্লেষের সুরে বললেন, বোঝা গেল—

অশোক দুষ্টামি করে বলে, কি বুঝলেন চাটুজ্জে মশায় ?

দেড় বুড়ি মানুষের তিন বুড়ি কথা ! কাস্তে ভেঙে উনি কত্তাল গড়াবেন—চাষার ছেলেপুলে বিদ্যাদিগ্‌গজ হবে।

তাঁতঘরে নিয়ে অতুল বোঝাচ্ছিল, দড়ি টেনে মাকু চালাতে হয় কেমন করে। নির্মল ছুটে এসে পড়ে।

চালাস না রে—সুতো ছিঁড়ে তছনছ হবে।

প্রসন্ন বললেন, দু-খানা তাঁত খোলা পড়ে রয়েছে। ব্যবস্থা কর। নয় তো অমনি-অমনি লয় পেয়ে যাবে।

নির্মল বলে, ঘর বাড়াবার জন্য তাই তো ছটফট করছি। আর ঝুড়ি ঝুড়ি গালি দিচ্ছেন চাটুজ্জে মশায়।

ইন্দ্রাণীকে বলে, ডাব খান—

অমলা বলে, আবার আজকে ?

নির্মল মৃদুকণ্ঠে বলে, কিছু বিক্রি হয়ে যায়। যেমন সেদিন হয়েছিল—

ইন্দ্রাণী বললেন, অবেলায় পথে ঘাটে খেতে পারি কি আমি ? এতজনকে কাঁদি কাঁদি ডাব খাওয়াবার কোন দরকার নেই। ছেলেদের কথা শুনছি—বড় ভাল লাগছে।

নির্মল বলে, দরকার আপনাদের নেই—আমার আছে। আর দেখাতে দিতে চাই নে। হাসবেন ছেলেখেলা দেখে। তার চেয়ে ডাব-টাব খেয়ে—এবং মহৎ ও উচ্চ আদর্শের ধারণা নিয়ে সুভালাভালি ফিরে যান। যেমন ডাব

খাইয়ে এঁদের বিদায় করেছিলাম সাহেবদীঘি থেকেই। আমার পুরানো কৌশল।

হো-হো করে প্রচণ্ড হাসি হেসে উঠল। শাদা দু-পাটি দাঁত ঝিকমিকিয়ে উঠল মুক্তার মতো।

অমলা বলে, আঃ—থামুন তো! বিশ্রী হাসেন আপনি। কানের পর্দা ছিঁড়ে যায়।

নির্মল বেকুব হয়ে হাসি থামাল।

ইন্দ্রাণী বলেন, না হে, বেশ হাসি তোমার। ভিতরটা অবধি দেখা যায় হাসির আলোয়। আমার বেশ লাগে।

তাঁতের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ধুলো জমে আছে কেন?

ঐ তো মুশকিল করেন।

ঠিকমতো চলে না বুঝি?

নির্মল বলে, ঠিক ধরেছেন। টাকার অভাব তো বটেই—তার চেয়ে বেশি অসুবিধে হচ্ছে লোকের অভাবে। কাজের লোক নেই। গ্রামের নাম তাঁতিহাট—কত ভরা সাজিয়ে তাঁতের কাপড় চালান যেত একদিন। এখন একটি তাঁতের লোক জোটাতে পারি নে। একজনকে নিয়ে এলাম, মুখে খুব লম্বা লম্বা বুলি—কিন্তু কাজে বসিয়ে দেখি, তার চেয়ে আমাদের হাত ভাল চলে।

অমলার দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

তাঁত চালাতে জানেন আপনি?

চালানো কঠিন কি! দড়ি টানলেই মাকু চলে।

অতুল ফাঁস করে দেয়।

নির্মল-দা খাসা বোনেন।

নির্মল তাড়া দেয়, যাঃ—

কাপড়-টাপড় নয়, শুধু গামছা বোনেন।

নির্মল ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন, ওদিকে ষড়যন্ত্র হল। অমলা বলে, কি কি বোনা আছে, আমায় একবার দেখাবে ভাই?

অতুলের হাত ধরে টিপিটিপি সে সরে পড়ল।

ইন্দ্রাণী বলছিলেন, ছেলেপুলে কত হল ?

নির্মল বলে, বিস্তর। ঐটেরই অভাব নেই শুধু। বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে জোটে। আমিই আমল দিই নে। কাজের ব্যবস্থা করতে পারছি নে, চালাব কোত্থেকে ?

বাড়ি থেকে খরচপত্র দেয় না ?

খরচ দেবে! উল্টে ইস্কুল থেকে কিছু দিলে ভাল হয়। দেওয়া উচিত, বুঝতে পারি। গরিব দেশে কাজ কামাই করে বিদ্যার বিলাসিতা চাষী মা-বাপ সহ্য করবে না। সঙ্গতি হলে ছাত্রের আয়ের ভাগ আমরা বাড়িতেও পাঠাব। কিন্তু কোথায় বা আয়, আর কোথায় কি!

ম্লানমুখে বলতে লাগল, আখ চাষ করলাম—ঘন-গিরে লিকলিকে গাছ—তা-ও পোকা ধরে গেল। ভাল করে পাকবার আগেই কাটতে হল তাড়াতাড়ি। দীঘির খোলে পূবদিকটায় ধান হবে মনে করে ধান রোয়া হল। ভাদ্র মাসে কোমর জল হল ক্ষেতে—ধান পচে গোবর। বীজপাতা কেনার টাকা ক'টাও ঘরে এলো না।

প্রসন্ন পরম ব্যথিত হয়ে বললেন, কি ধান রুয়েছিলে বল তো ?

তা কে জানে! অন্যের বীজতলা থেকে পাতা কিনে রোওয়া—যেসব বড়ান-ধান রুয়ে থাকে, তার কোন একটা হবে।

কালোবয়রা রুতে যদি!

নির্মল বলে, কি ?

এই দেখ, নামটাও শোন নি। তোমরা যাও চাষের কাজে! ধানের আবাদ বাবুভেয়ের কর্ম নয়। কালোবয়রা ধান—পাতা সওয়া হাত দেড় হাত বড় হলে তবে বীজতলা থেকে নিয়ে রুতে হয়। ভারি মজার ধান—জল যত বাড়বে, ধানচারাও বেড়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। ডুবে থাকবে না। আট-দশ হাত জলের উপরেও মাথা জেগে থাকে।

নির্মল বলে, আপনি তো দেখছি পণ্ডিত মশায়, অনেক জানেন শোনেন। লেখাপড়া-শেখা আকাট মুখ্যু অনেক মেলে, চৌপিঠে লোক দুর্লভ।

নিজের অস্থিসার বুকে থাবা মেরে সগর্বে প্রসন্ন বললেন, হেঁ হেঁ—বাঙলা ইস্কুলে পড়াশুনো আমার—ত্রিভুবনের সমস্ত শিখতে হত। এখনকার এই ফুক্কুড়ি মেরে লেজুড় আদায় করা নয়।

তারপর মোলায়েম কণ্ঠে নির্মলকে আশ্বস্ত করলেন।

আমার কাছে যেও, আমি জোগাড় করে দেবো কালোবয়রা। রুয়ে দেখো। জলে ডুববার ভয় নেই। ফলনও হবে ভাল।

শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ উঠেছে, শান্ত জ্যোৎস্না লুটিয়ে পড়েছে আরণ্যভূমিতে। নীলকরদের পরিত্যক্ত বাসভূমি কতকাল পরে ধীরে ধীরে জীবন্ত হচ্ছে—নবীন জনালয়ের পত্তন হচ্ছে। বিরক্ত ভবতারণ ফিরবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। ইন্দ্রাণী কানে নেন না। নির্মলের সঙ্গে ধীর পায়ে ঘুরছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন ইস্কুলের নানা কথা···

উচ্ছ্বসিত হাসি এল অমলার। হাতে রঙিন গামছা।

নির্মল কপট ক্রোধে অতুলকে বলে, গামছা কে বের করে দিল? তুই?

তোমার বোনা কি কি আছে, দেখতে চাইলেন। এই জোড়া নিয়ে নিলেন, কিছুতে দিচ্ছেন না।

নির্মল বলে, ইস্কুলের জিনিস—নেওয়া চলবে না তো!

অমলা বলে, বিনামূল্যে নেওয়া যায় না। কাঁকুড়ের ব্যাপারে দেখেছি। কত দাম, বলে দিন।

কিন্তু কাজে আসবে কি কিছু?

অমলা ভাঁজ খুলে গামছা মেলে ধরল। আবার হাসি।

কি বাহার বুননের! টানায় সুতো নেই, পোড়েনে গিঁঠের পর গিঁঠ—

নির্মল অপ্রতিভ মুখে বলে, সুতো ছিল বই কি! যথেষ্ট ছিল—মাকুর ঘায়ে ছিঁড়ে গেল। আমার প্রথম বোনা—সেইটাই বের করে নিয়েছেন—

অমলা বলে, মুখে যাদের যত লম্বা কথা—হাতের কাজে তারা তত আনাড়ি। এ গামছা দেখাতে হবে দশজনকে। দাম নিয়ে নিন। আর—

ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে ধবধবে একখানা রুমাল বের করে বলে, রুমালখানা দিচ্ছি ফাউ।

নির্মল বলে, চাষাভুষো মানুষ—রুমাল আমার কি দরকারে লাগবে ?

রেখে দেবেন। আপনিও দেখাবেন দশজনাকে।

নির্মল বলে, রুমাল দোকানে ঢের পাওয়া যায়, দশজনে দেখে থাকে। গামছা যতই খারাপ হোক, আমার নিজের হাতে-বোনা—দোকান চুঁড়ে পাবেন না ও-জিনিস।

ইন্দ্রাণী বললেন, রুমালও ওর নিজের হাতে-কাটা সুতোয় তৈরি। এই যে পরে আছে—এ খদ্দরের শাড়ি, দেখে কিন্তু ধরা যায় না।

বটে !

মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্মল হাত বুলিয়ে রুমালের কোণের দিকটা ঈষৎ পাকিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল।

অমলা মুখ টিপে হেসে বলে, আপনার তাঁতের মাস্টারকেও দেখান না। তিনি কি বলেন !

সে বলবে, বাজে ধাপ্পা দিচ্ছেন। চরকায় এমন মিহি সুতো হতেই পারে না।

ডাকুন দিকি কোথায় সে মাস্টার—

বাপ রে ! মেজাজ দেখে মাস্টার সাহসই করবে না এগুতে।

আমার কিন্তু সন্দেহ, তাঁত-বোনা, অ-আ পড়ানো—সকল বিদ্যের মাস্টার একজন, একটিমাত্র মানুষ।

নির্মল হেসে বলে, আরও আছে। ঘণ্টা-বাজানো দপ্তরি, হিসাব-রাখা কেরানি, লোহা-পিটানো কামার, রেঁদা-ঘষা ছুতোর—সমস্তই আপাতত একজন। চরকা-শেখানোর চাকরিটা কেউ যদি নেন—ধরুন সপ্তাহে একদিন কি দু-দিন, তা হলে দু-জন হয়ে যায়। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে রাজি, আছেন কেউ জানাশোনা ?

ফিরে আসছেন সকলে। ইন্দ্রাণী নিবিষ্ট মনে কি ভাবছিলেন। সহসা বললেন, পণ্ডিত মশায়ের পূজো হল। আমিও সরস্বতীপূজো করব খুব জাঁকিয়ে।

প্রসন্ন ঘাড় নেড়ে পরম উল্লাসে সায় দেন।

ভালই তো! মায়ের উপযুক্ত কথা। আমি কীটস্য কীট—আমার কথা কেন? পূজো কি আমার? মায়ের আনুকূল্য না হলে—

ইন্দ্রাণী বললেন, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শুধু একটা দিনের পূজো নয় কিন্তু—

ভবতারণ সহজভাবে বললেন, হবে তাই। সেজন্য তাড়াতাড়ি কিসের? পুরো বছর এখনো বাকি।

অশোক মৃদু হেসে বলে, ততদিন থাকছেন কিনা! চিঠি এসে গেলে আমি পালাব। এঁদেরও রেখে যাচ্ছি নে। বাবা যখন এখানে থেকে সব ব্যবস্থা করেন, তখন কোন মানে না এরকম নির্বাসনে পড়ে থাকার।

ইন্দ্রাণী বললেন, আমিও তাই বলি। শরীরের যা দশা হচ্ছে, বেঁচেও না থাকতে পারি। যা করতে হবে, এখনই।

প্রসন্ন বলেন, মা-জননীর হুকুমে বাঘের দুধ মিলবে। কিন্তু পাঁজিতে যে দিন বেরুবে না, সেটার উপায় কি?

ইন্দ্রাণী বললেন, সরস্বতীর আসল পূজা বিদ্যাচর্চা। একটা ইস্কুল গড়ব। নির্মলের আইডিয়া আছে, কিন্তু পেরে উঠেছে না—

প্রসন্ন বলেন, ভিতরে এদিকে যে ঢনঢন! বিদ্যেসাধ্যি নেই—

ভবতারণ বলেন, বুদ্ধিও লবডঙ্কা। স্বদেশি করে সবাই এই মওকায় গুছিয়ে নিল—ও কি করছে বলুন দিকি? তবে আখেরের বুদ্ধি না থাক, এমনি শয়তানি আছে। ন্যাকা শয়তান।

প্রসন্নর সত্যিই আনন্দের সীমা নেই। সকলের অনাদর ও অবহেলার মধ্যে পাঠশালা চালিয়ে আসছেন—রায়গিন্নির সুনজরে পড়ে বড়-ইস্কুল হয়ে যাবে এবার। মহোৎসাহে তিনি বললেন, পূজোর অতি উত্তম অর্থ করেছেন মা-জননী। কি করতে হবে, হুকুম দিয়ে দিন—কোমর বেঁধে লেগে যাই। বুড়ো হাড়ে ভেলকি খেলিয়ে দেবো।

ইন্দ্রাণী গভীর কণ্ঠে বললেন, আপনারই তো কাজ পণ্ডিতমশায়। সেই কবে উনি পাঠশালা বসিয়ে গেছেন। আপনি একটি মানুষ টিমটিম করে বাতি জালিয়ে রেখেছেন।

বিচার-বিবেচনা করে ভবতারণও খুশি হলেন। ইস্কুল কতটা কি হবে, বলা যায় না—বেদখল জমি নির্গোলে উদ্ধার করবার ভাল এক পন্থা বটে! সব ছেলেপুলে যদি ভেঙে চলে আসে—সকলের চেষ্টা থাকলে আসবেও তা—তখন তো চামচিকেয় বাসা বাঁধবে নির্মলের ইস্কুল-ঘরে। স্রোতের শেওলা ভেসে এসেছে, আবার ভেসে চেলে যাবে। মতলব যদি এই হয় তো বলতে হবে পাকা বুদ্ধি ধরেন রায়গিন্নি।

দেখলেন মা, আমি মিছে কথা বলি নি—

ইন্দ্রাণী অন্যমনস্কভাবে বললেন, যা বলেছিলেন চাটুজ্জেমশায়, অনেক বেশি তার চেয়ে।

জুত পেয়ে ভবতারণ বলতে লাগলেন, তবেই দেখুন—ইস্কুল না হাতী। বিষম ধড়িবাজ—ভাঁওতা মেরে দখলি স্বত্ব সাব্যস্ত করছে।

তারপর একটু ইতস্তত করে ইন্দ্রাণী মনের গূঢ় অভিপ্রায় কতটা ব্যক্ত করেন—জানবার জন্য বললেন, আপনি কোন কথা বললেন না, চুপচাপ ফিরে আসছেন—বরকন্দাজগুলো তাই বড় মুষড়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, জঙ্গল সাফ করছে, করে যাক না—যা করবার আমরা পরে করব। এখন কিছু বললে কাজ বন্ধ করে উল্টে জঙ্গল-কাটার মজুরি দাবি করতে পারে। ঐ যে বললেন—ধড়িবাজ কম নয় তো!

ভবতারণ তাকালেন ইন্দ্রাণীর মুখে। সত্যি—না রহস্য করে বলছেন? বিশ্বাস কতকটা হয়, আবার হয়ও না। স্ত্রীলোক হলেও অথই জলের মাছ ইনি।

১৬

প্রসন্ন পণ্ডিত পড়াচ্ছেন। অমূল্য গোমড়া মুখে পড়ে যাচ্ছে। ঘাম দেখা দিয়েছে পণ্ডিতের কপালে। অবশেষে পরীক্ষা করছেন, এটা কি, বল্ তো—

হ্রস্ব উ—

তোমার মুণ্ডু-উ-উ—

রাগের সীমা-পরিসীমা নেই। ঘণ্টা দুই একটানা পরিশ্রমের এই ফলাফল! বলেন, মুণ্ডু তোমার। আর মুণ্ডুর মধ্যে ঘিলু নয়—জগদ্দল পাথর। সে পাথর নড়ানো বুড়ো মানুষের কর্ম নয়।

অমূল্য বলে, জল তেষ্টা পেয়েছে পণ্ডিতমশায়।

পাবেই তো! ধকলটা কম নয়। এগারো দিন একাদিক্রমে অ-আ'র কসরৎ চলছে। মা-লক্ষ্মীর খেয়াল হয়েছে, ছাগল দিয়ে ক্ষেত চষবেন। তাই সই—হুকুমের নফর—হালে জুতে দিয়ে হৈ-হৈ করছি।

ছুটি নিয়ে অমূল্য জল খেতে বেরুল।

সর্দার-পোড়ো পুঁটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরে তাকিয়েছিল। সে চেঁচিয়ে ওঠে, পালাল কিন্তু পণ্ডিত মশায়—

সে কি?

পুকুরঘাট ওদিকে কোথা? ও যে রাস্তা বেয়ে চলল।

পণ্ডিতও দেখলেন তাই বটে।

ছুটে যা তোরা ক-জন। এমনি না আসে, চ্যাংদোলা করে আনবি।

অমূল্য মরীয়া। নিশ্চিত বুঝেছে, ভবতারণের সজাগ নজর এড়িয়ে রাতে পালানোর কিছুমাত্র উপায় নেই। যদি কোন উপায় থাকে—সে দিনমানে দশের চোখের উপর দিয়েই। রাত্রে ভবতারণ-বলবন্ত এবং দিনে প্রসন্ন পণ্ডিত—ডাঙায় বাঘ জলে কুমীরের মতো। নির্ঘাৎ এরা

যমালয়ে পাঠাবে। বাঁচার এই শেষ চেষ্টা। গাঙ পাড়ি দিয়ে মাঠ ভেঙে সোজা স্টেশনে গিয়ে গাড়ি চাপবে। যদি ধরে ফেলে কিংবা ইন্দ্রাণী ক্ষেপে গিয়ে যদি হুলিয়া বের করে দেন—যা হয় হোক, জেলখানা খারাপ কিসে এই অবস্থার তুলনায় ?

ভেবেছিল, খোঁজ হবার আগেই সে গাঙ পাড়ি দিয়ে বেরিয়ে যাবে। পুঁটে শত্রুতা সাধল। পা-দুটোর উপর অসীম আস্থা—এদের শক্তিমত্তায় অনেকবার অনেক বিপদ থেকে ত্রাণ পেয়েছে। তাই প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—কোনখানে আত্মগোপন করতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু পাঁচ-ছ'টা ছেলের গণ্ডা তিনেক চোখ এড়াবার মতো অন্তরাল কোথাও নেই। চষা-ক্ষেত, একটা দুটো চাষির বাড়ি, উলুখড়ে-ঢাকা মাঠ···

নদীর ধারে পৌছল। নৌকোও আছে একটা। তবে হিঞ্চে-কলমির দাম যে রকম এঁটে আছে, ঐ বন্ধন ছিঁড়ে পারে পৌছনো সময়সাপেক্ষ। কুঠির জঙ্গল অনতিদূরে। জঙ্গলে ঢুকে পড়ে নিশ্বাস নেবার ফুরসৎ পায়। অনুসরণকারীরা ফিরে চলে যাক—তারপর গাঙ পার হবার উপায় ভাববে।

জয় মা কালী!

বুকে হেঁটে নীলখোলার নাটাবনের নিচে চলে গেল। ঠাহর করে দেখে, এর চেয়েও উৎকৃষ্টতর জায়গা আছে—পাকা চৌবাচ্চা। কাছে গিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখল, দেখে ভারি আনন্দ হল। তারই পরিত্রাণের জন্য যেন বস্তুটা তৈরি। দেয়াল বেয়ে উঠে দাঁড়াল গাঁথনির উপর। চারিদিক কা জায়গা-জমির চেয়ে অনেকটা উঁচুতে এখন সে।

শিউরে উঠল—চৌবাচ্চার আড়াল থাকায় এতক্ষণ নজরে আসে নি—ডালপালা-মেলা বৃহৎ এক তেঁতুলগাছের তলায় অনেকগুলি ছেলে। তার পিছনে ছুটেছিল পাঁচ-ছয়টা মাত্র—এরা গোটা কুড়িক। অত্যন্ত নিকটে—দেখে ফেলল নাকি ?

জয় মা কালী!

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে অমূল্য লাফিয়ে পড়ল চৌবাচ্চার গহ্বরে।

কে রে? দেখ্ তো, কে পড়ল। আমাদের কেউ নয় তো?

নির্মল দৌড়ল। আরও অনেকে ছুটল পিছু পিছু। সহজে কি নজরে আসে? অমূল্য গুঁটিসুটি হয়ে পত্রপুঞ্জের মধ্যে যথাসম্ভব নিজেকে ঢেকে আছে।

এই? কে রে তুই?

ভঙ্গি দেখে হাসি পায়। খরগোসের রীতি আছে, ছুটতে ছুটতে অবশেষে নিরুপায় হয়ে ঝোপের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে নিঃসাড় হয়ে থাকে। চোখ-মুখ ঢেকে থাকে—নিজে যখন দেখতে পাচ্ছে না, তখন তাকেও কেউ দেখছে না—এই ধারণা। অমূল্যর সেই অবস্থা।

নির্মল বলে, দেখতে পেয়েছি। কে তুই—উঠে আয় বলছি। কাঁটার জঙ্গলে এমনভাবে আছিস কেন রে?

নড়াচড়া নেই।

কেনারাম বলে, বাঁশ নিয়ে আসি। বুনো-শুয়োর যেমন খুঁচিয়ে বের করে, তেমনি করে তুলব।

চুপচাপ থেকে লাভ নেই, অমূল্য বুঝল। সেদিনের সেই সহানুভূতির পর নির্মলকে দেখে ভরসাও পেল মনে মনে। সে মুখ তুলল।

চিনতে পেরে নির্মল বলে, যাত্রার দল কবে চলে গেছে—তুই এখনো আছিস যে পড়ে?

যেতে দেয় নি বাবু—

কেন? কুল-চুরির জের চলেছে নাকি এখনো?

অমূল্য কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল।

নির্মল বলে, উপরে উঠে আয়। ভয় নেই—আমি বাঁধব না।

অমূল্য বিরক্ত হয়ে বলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুকুম করা সোজা। উঠি কেমন করে এখান থেকে? লাফ দেবার সময় উঠে আসবার কথা ভাবি নি তো! মিছে বকাবকি না করে বন্দোবস্ত করে দেন কোন-একটা।

কেনারামকে নির্মল বলে, বাঁশই নিয়ে আয় তবে। গেরোওয়ালা দেখে আনিস।

চৌবাচ্চার তলা অবধি বাঁশ নামিয়ে দিল। অমূল্য উঠে এল বাঁশ বেয়ে। রক্ত ফুটেছে দেহের স্থানে স্থানে, বিছুটি লেগে ফুলে ফুলে উঠেছে।

নির্মল বলে, মানুষ না কি তুই? কোন্ আক্কেলে ওর মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিলি?

অমূল্য বেকুব হয়ে রক্ত মুছে ফেলে। বলে, কিছু না বাবু, ও কিছু না। কাঁটায় ছড়ে গেছে।

নির্মল বলে, এমন আহাম্মক দেখি নি। সাপ-টাপ থাকতে পারত। পালিয়েছিস কেন? কি হয়েছে?

অমূল্য কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ইস্কুলে দিয়েছে বাবু—

সেইজন্যে?

অ-আ ক-খ পড়তে বলে—

নির্মল হেসে ফেলল।

ভয়ের কথাই বটে! একে ইস্কুল, তার উপর অ-আ ক-খ। এ অবস্থায় প্রাণের মায়া সত্যিই থাকে না।

নীলখোলা অতিক্রম করে তেঁতুলগাছ-তলায় তারা এল। হৈ হৈ করে পুঁটের দল এসে পড়ল এমনি সময়।

সারা গাঁ পাতি-পাতি করছি—এখানে তুই?

পুঁটে অমূল্যর হাত এঁটে ধরল।

পণ্ডিতমশায় জোড়া-বেত নিয়ে গর্জে বেড়াচ্ছেন। আজ আর রক্ষে নেই।

অমূল্য হাত ছিনিয়ে নেয় একটানে। পুঁটে চোখ পাকিয়ে বলে, যাবি নে?

অমূল্য দৌড়ে নির্মলের পাশে দাঁড়ায়। কাতর চোখে তার দিকে চেয়ে বলে, আমি যাব না বাবু।

নির্মল বলে, টানাটানি করিস নে। আমাদের আস্তানার মধ্যে এসে পড়েছে—ও যাবে না।

পুঁটের দলের একটি ছেলে রাখাল বলে, মোটেই যাবে না? তোমার ইস্কুলে পড়বে নির্মল-দা?

অমূল্য সভয়ে বলে, এখানেও ইস্কুল ? ওরে বাবা !

অতুল বলল, ভারি মজার ইস্কুল রে ! পড়তে হয় না।

নির্মলও বলে, কেউ এরা পড়ে না। শুধুই খেলা। কাজ-কাজ খেলা। পড়া-পড়া খেলা। খেলার অবধি নেই।

দু'টি ছেলে উনুন খুঁড়ছে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে নির্মল বলে, চড়ুইভাতি হচ্ছে আজ। সকলের নেমন্তন্ন—সবাই তোমরা খেয়ে যাবে। বেলা হবে অবিশ্যি। এখন চলে যেতে পার। আবার এসে খেয়ে যাবে—কেমন ?

পুঁটের সঙ্গী ছেলে ক'টি পরমোল্লাসে ঐ দলে জুটে গেল।

এখন গেলে আর কি আসতে দেবে ? খেয়ে-দেয়ে একেবারে যাবো আমরা।

পুঁটে একলাই ফিরে যাচ্ছে।

নির্মল বলে, তোর কি হল ?

আমার বলে কত কাজ ! গিয়ে শ্রুতলিপি লেখাতে হবে।

খেতে আসিস—

ঘাড় নেড়ে পুঁটে বলে, সময় কখন ? ও বেলা আবার পাঠশালা। এখানে এসে খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।

হনহন করে সে চলল।

নির্মল বলে, খুব ভাল ছেলে বুঝি ?

কচু। মোড়লি করে বেড়ায়। পণ্ডিত মশায়ের কাছে চুকলি কাটতে গেল। সবসুদ্ধ মার খাওয়াবে।

আর একটি ছেলে বলে, দেখে নেব ওকে আমরা। বড্ড বাড় বেড়েছে।

নির্মল বলে, ছিঃ ! একসঙ্গে পড় তোমরা—অমন বলতে নেই। আমি নেমন্তন্ন করলাম—পণ্ডিত মশায় আমার দোষে তোমাদের মারবেন কেন ?

ভিজে কাপড়ে গামছা দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে একটি ছেলে এল।

হয়ে গেছে নকুল ?

কেউটেফণা আর একগাছিও নেই সাহেব-দীঘিতে। জল টলটল করছে। সমস্ত শেওলা নাকি রেখে দিতে বলেছ নির্মল-দা ?

হ্যাঁ। শুকিয়ে এলে মাটি চাপা দিতে হবে। জমির খুব ভাল সার। বুঝে নিতে পারলে সংসারে কোন জিনিষ ফেলা যায় না।

নকুল বলে, শেওলা উঠে গেছে—কই-সিঙি এখন খইয়ের মতো ফুটছে। চিল-মাছরাঙার মচ্ছব—ছোঁ মেরে মেরে ধরে গাছে গিয়ে বসছে।

নির্মল বলে, খেপলা-জাল বাইতে পারিস? চড়ুইভাতিতে খিচুড়ির সঙ্গে কইমাছ-ভাজা হত!

অমূল্য তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে।

আমি পারি। আছে পাশখেওলা? তিনটে কলাগাছে ভেলা করে দেবেন—সব মাছ ছেঁকে ডাঙায় তুলব।

১৭

প্রসন্ন রাস্তার দিকে তাকিয়ে। না অমূল্য, না পুঁটেরা—একটি প্রাণী ফিরল না অতগুলির মধ্যে। একজোট হল নাকি? বিচিত্র নয়—অসদ্দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখে তা-বড় তা-বড় লোকে বিগড়ে যায়, এরা তো ছেলে-মানুষ! বিশ বছর পাঠশালা চালাচ্ছেন—এ রকম উড়ো-আপদের পাল্লায় পড়েন নি কখনো।

অবশেষে পুঁটেকে দেখা গেল। পণ্ডিত উঠানে নেমে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

কি হল? একা এলি যে নাচতে নাচতে?

পুঁটে হাঁপাচ্ছে। অমূল্য তো আছেই—সহগামীদের নামেও রকমারি নালিশ। সমস্ত এক সঙ্গে বলবার আগ্রহে কথা জোগায় না তার মুখে। বলে, এলো না পণ্ডিত মশায়। কেউ এলো না। জঙ্গুলে পাঠশালায় জুটেছে। আমাকেও আটকাচ্ছিল। সে আর পারতে হয় না! ড্যাং-ড্যাং করে বেরিয়ে এলাম।

আদ্যোপান্ত শুনে প্রসন্ন রাগে গরগর করতে লাগলেন। চল্ দিকি আমার সঙ্গে, রায়-গিন্নিকে বলতে হবে সমস্ত। চল্—

ছেলে ক'টিকে বললেন, এখন পড়া নেওয়া হবে না। যার যতটা পড়া, খাতায় ভাল করে লেখ্ কালি দিয়ে। ধরে ধরে লিখবি। একটা বানান ইদিক-ওদিক হয়েছে তো ফিরে এসে পিঠের ছাল তুলব।

উত্তেজনায় দুম-দুম পা ফেলে পুঁটেকে নিয়ে তিনি চললেন।

নূতন ইস্কুলের দ্রুত আয়োজন চলেছে। ঐ যে বলেছিলেন, যা করতে হবে এখনই—সে শুধু মুখের কথা নয়, ইস্কুল-ইস্কুল করে ক্ষেপে উঠেছেন ইন্দ্রাণী। এই তাঁর এক স্বভাব—কোন-কিছু মাথায় এসে গেলে এস্পার-ওস্পার না হওয়া পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই।

কাছারি-দালান ও পার্শ্ববর্তী দুটো কামরা খালি করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কাছারি পেট-কাটা ঘরে বসছে। তিনটে কামরায় আপাতত ইস্কুল বসবে—ছাত্র-বৃদ্ধি হলে পূর্বদিকে আম-কাঁঠাল গাছ মেরে টানা লম্বা ঘর বাঁধা হবে, তারও মাপজোপ হয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী সোনাকুঠুরিতে। জমিয়ে আছেন—ভবতারণ, অশোক, অমলা সকলেই সেখানে। অতএব ইস্কুলেরই প্রসঙ্গ না হয়ে যায় না। প্রসন্নকে দেখে সবিস্ময়ে বললেন, এমন অসময়ে—পাঠশালা হচ্ছে না?

প্রসন্ন বিরক্ত মুখে বলেন, হচ্ছে এখনো—কিন্তু হতে দেয় আর কই?

সহানুভূতিপরবশ হয়ে নির্মলকে সেদিন বিস্তর হিতকথা বলেছিলেন, এমন কি কালোবয়রা-বীজধান সম্পর্কে বলে রেখেছেন ক-জন মাতব্বর চাষীকে —কিন্তু আজকের ব্যাপারের পর মন বিষিয়ে গেছে। বিদ্যাদান ব্রতবিশেষ—মন সরল ও পবিত্র হওয়া উচিত। যে লোকের এত শয়তানি, পণ্ডিতি না করে সে উকিলের মুহুরি হল না কেন?

প্রসন্ন বললেন, ভুজুং-ভাজাং দিয়ে যদু্র পারে ছেলে ভাঙিয়ে নিয়েছে—আজ ফিষ্টি খাওয়াচ্ছে, মা। এর উপর কোন্ হতভাগা আমাদের পাঠশালায় পড়ে থাকবে বলুন।

ইন্দ্রাণী অধীর কণ্ঠে বলিলেন, হল কি তাই বলুন না—

অমূল্যচন্দোর লম্বা দিয়েছেন—

পুঁটে বলে, জল-তেষ্টা পেয়েছে এই না বলে—

প্রসন্ন বাকিটুকু বলে দেন, এক দৌড়ে সাহেবদীঘি। এ তল্লাটের জলে ওদের আর তেষ্টা মেটে না।

ইন্দ্রাণী আন্দাজে বুঝে নিয়ে বললেন, নির্মলের ইস্কুলে গেছে?

ইস্কুল কোথায়? বললাম তো—সাহেব-দীঘিতে মাছ ধরতে লাগিয়েছে।

অশোক শিউরে ওঠে।

সর্বনাশ, সে যে অতি সাংঘাতিক জায়গা!

পুঁটে বলল, খেপলা-জাল বাইছে কলার ভেলায় চড়ে।

ইন্দ্রাণী হাঁক দিলেন, বলবন্ত!

সাড়া না পেয়ে ভবতারণকে বললেন, বলবন্তকে পাঠিয়ে এখুনি নিয়ে আসুন তাকে। সহজে না আসতে চায়, জোর করে ধরে আনবে।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে তারপর প্রসন্নকে প্রশ্ন করলেন, এর আগেও তো পালিয়েছিল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ নিয়ে তিন দিন হল।

কঠিন স্বরে ইন্দ্রাণী বললেন, রাখতে পারেন না কেন পাঠশালে?

অকারণ তাড়নায় প্রসন্ন অবাক হলেন।

আমার কি দোষ? আমি তাড়িয়ে দিই?

হ্যাঁ, দোষ আপনারই। যাতে পাঠশালায় থাকে, লেখাপড়ার প্রতি ভালবাসা জন্মে, তার কোন উপায় ভেবে থাকেন? শুধু ছেলেদের গালিগালাজ করলেই কর্তব্য শেষ হয় না।

ভবতারণ ফিরলেন বলবন্তকে পাঠিয়ে দিয়ে। কথার শেষ দিকটা কানে গেছে। বললেন, পণ্ডিতকে বকে কি হবে? ছেলে কি দরের, সেটাও ভাবুন। কোন পুরুষে কোন দিন পাঠশালে বসেছে যে, বিদ্যেয় মন বসবে? বাঁদরে না জানে কর্পূরের গুণ—শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধবনুন।

প্রসন্ন বলেন, তার উপর নির্মলটা লেগেছে। নেমন্তন্ন খাওয়াবে, মাছ ধরাবে, ছেলে-বুড়ো এক সঙ্গে এক মাঠে খেলা করবে, হরেক রকম বাঁদরামিতে প্রশ্রয় দেবে—

ইন্দ্রাণী বললেন, ওর চেয়ে ভাল খাওয়াব আমরা, বেশি খেলা দেবো—

অশোককে বললেন, বিনা মাইনেয় ছেলেরা পড়বে। সদর-বাড়ির সমস্ত পূব দিকটা নিয়ে ইস্কুল হবে। সদর-উঠান হবে খেলার মাঠ।

অশোক বলে, কিন্তু কাকিমা, বড্ড জড়িয়ে পড়ছেন ক্রমশ। কলকাতা ফিরতে দেরি পড়ে যাবে।

দেরি যাতে না হয়, তাই করো তোমরা। তোমার মতো কাজের ছেলে উপস্থিত আছে—আমি তো খুব বল-ভরসা পাচ্ছি। তোমার বাবা এসে পড়বার আগেই ঠিকঠাক করে ফেল। নতুন বছরে শুভ পয়লা বোশেখে ইস্কুল বসিয়ে দিয়ে আমরা পালাব।

প্রসন্নকে বলেন, জানেন পণ্ডিত মশায়, পয়লা থেকে বসবে আমাদের হাই-ইস্কুল। যখন এসে পড়েছেন, একটুখানি বসে যান। আপনাকে খাটাব।

প্রসন্নও থাকতে চান। ইস্কুল সম্বন্ধে বিশেষ রকম ঔৎসুক্য আছেই—তা ছাড়া বলবন্ত গ্রেপ্তার করে আনার পর অমূল্যর শাস্তি-বিধান স্বচক্ষে দেখে পরিতৃপ্ত হবার ইচ্ছা। চেপে বসে পড়ে পুঁটেকে বললেন, চলে যা তুই পুঁটিরাম। লেখা হয়ে গেলে ওদের ছুটি দিয়ে দিবি।

ভবতারণকে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলেন, চেয়ার-বেঞ্চির কি হল?

তক্তা ফাড়ছে, শুনতে পাচ্ছেন না? তিনটে জামগাছ কাটা হয়েছে। কাল হয়তো হয়ে উঠবে না—পরশু থেকেই ছুতোর-মিস্ত্রি কাজে লাগবে।

ইন্দ্রাণী বললেন, দেরি হয়ে যাবে। আমি বলি, সদরে অর্ডার দিয়ে আসুন গে, বড় বড় কাঠের গোলা আছে—টপ করে হবে। দু-পয়সা বেশি লাগবে—তা কি করা যাবে! আমাদের তাড়াতাড়ি গরজ।

অমলার উৎসাহ নেই। বলে, চেয়ার-বেঞ্চি হলে কি হবে? ছেলে কোথায়—পড়বে কে মা?

ভবতারণ বলেন, চক্ষের পলকে গাঁয়ের সব ছেলে কুড়িয়ে মুড়িয়ে নিয়ে আসতে পারি, মা যদি আদেশ করেন। খরচ যৎসামান্য—সিকি পয়সারও কম।

ইন্দ্রাণী চকিতে তাকালেন ভবতারণের দিকে। সে মুখে কি দেখলেন, কে জানে! দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, উঁহু—জোর-জবরদস্তি নয়। নির্মল যদি খেলা দিয়ে ছেলে বশ করে, আমরা তার দুনো—তে-দুনো খেলা দেবো। ওর সম্বল কতটুকু—কি-ই বা খাওয়াতে পারে! ডাক্তারের ব্যবস্থামতো আমরা স্বাস্থ্যকর ভাল ভাল খাবার দেবো। এ সমস্ত নিয়ে দেশবিদেশে অনেকে ভাবছেন; শিক্ষার নতুন নতুন পথ বাতলাচ্ছেন। নির্মলের অনেকগুলো কথা অতি চমৎকার লাগছিল।

ভবতারণ তৎক্ষণাৎ বললেন, বদ হজম। বারো ঘাটে জল খেয়ে বেড়িয়েছে তো—দু-চারটে ভাল ভাল জবান শিখে রেখেছে। আপনার কাছে বুকনি দিয়ে পশার বাড়াল। এতটুকু বয়স থেকে ওকে দেখছি।

ইন্দ্রাণী বললেন, ভাল শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া যাক সব কাগজে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ কাউকে হেডমাস্টার করে আনতে হবে, আদর্শ-ইস্কুল গড়ব। কাজ করতে নেমে টাকার জন্য পিছুলে চলবে না।

অমলা বলে, এই যে শুনি, এস্টেটের অবস্থা ভাল নয়—

মেয়ের প্রতিবাদে ইন্দ্রাণী অতিমাত্রায় বিরক্ত হইলেন। বললেন, তোর বাবা এই ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। গ্রামে তারপর আর আসেন নি, কিছু করবারও অবসর পান নি। কিন্তু মনে মনে ইচ্ছে ছিল। কথাবার্তায় কত সময় বলতেন গ্রামের কথা!

দেয়ালের ছবিতে দেখলেন নবকিশোরকে। বলতে লাগলেন, তাঁর কাজে গেলই বা তাঁর এস্টেটের কতকটা আয়! তাঁতিহাটের অনেক নিয়ে নিয়ে খেয়েছি। এবারে তাঁতিহাটের ছেলেপুলে যদি কিছু পায়, তার জন্য মুখ ভারি করলে চলবে কেন?

পুঁটে ইতিমধ্যে পাঠশালার ছুটি দিয়ে দিয়েছে। মলয় এসে দরজায় দাঁড়াল। কলহের আবহাওয়া কেটে গেল তার মূর্তি দেখে। ইন্দ্রাণী হেসে ফেললেন।

ওরে বাস্ রে! হাতে কালি, মুখে কালি—কত বিদ্যে শিখে এলেন মলয়বাবু! ...এই যে—ওরাও এসে গেছে।

বলবন্ত হাত ধরে যেন উড়িয়ে নিয়ে আসছে অমূল্যকে। প্রসন্ন বলেন, দেখেন মা-জননী—ইস্কুল করে এলো। অমন বাহারের ইস্কুল থাকতে আমার পড়ানো মনে ধরবে কেন?

জলে-কাদায় চেহারা অপরূপ খুলেছে সত্যি। কিন্তু রাগ কোথা ইন্দ্রাণীর—হাসতে হাসতে তিনি বললেন, তা বেশ হয়েছে, উনি কালি মেখে এলেন, ইনি কাদা মেখে। যা যা—হাঁ করে থাকিস নে। শিগ্‌গির চান করে আয়—

মলয় গেল। অমূল্য বেয়াড়া ঘোড়ার মতো ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্দ্রাণী তাড়া দিলেন, যা—

দু-পা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে অমূল্য বলে উঠল, স্পষ্ট কথা বলি ঠাকরুন, পণ্ডিতের পাঠশালায় কক্ষণো আমি যাব না। মেরে ফেলেন, সে-ও স্বীকার—আমি যাব না।

চোখের মণি দুটো ধ্বক করে জ্বলে উঠল যেন। প্রসন্ন শিউরে উঠলেন।

অনতিপরে অতুল আধ-খালুই মাছ নিয়ে এল।

অমূল্যর মাছ। কষ্ট করে ধরেছে। চড়ুইভাতি খেতে দিলেন না—তাই নির্মল-দা মাছ পাঠিয়ে দিলেন।

ইন্দ্রাণী রাগ করে উঠলেন।

এইসব কর তোমরা ইস্কুলে? ছোট ছোট ছেলেপুলে—দীঘির গাদের মধ্যে ডুবে যেত যদি কেউ?

প্রসন্ন বলেন, বুঝুন মা-জননী। লোকে যে কোন্ বিবেচনায় ছেলে সঁপে দেয় ওর কাছে!

ভবতারণ মুখ বাঁকিয়ে বলেন, সঁপে আবার দিতে যায় কে? কোন কূলে কেউ নেই, তারাই গিয়ে জোটে। সব মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো।

ইন্দ্রাণী অতুলকে বললেন, মাছ ফেরত নিয়ে যাও। বোলো তোমাদের মাস্টারকে—মাছ ধরতে ছেলেপুলে ভেলার উপর মাঝ-দীঘিতে ভাসিয়ে দেবে, এ আমার পছন্দ নয়। অমূল্য চান করতে গেছে—এসে চড়ুইভাতিতে যাবে।

অতুল আনন্দিত মনে চলে গেল। অমূল্যর কর্মপটুতায় এই সামান্য ক্ষণের মধ্যেই ওরা তার অনুরাগী হয়েছে।

ভবতারণ বললেন, আবার পাঠবেন মা ওখানে? সঙ্গ অতি বদ্—দেখলেন তো?

ইন্দ্রাণী বললেন, মায়ে-খেদানো, বাপে-তাড়ানো—আপনিই তো বললেন—ওদের ঐ জায়গা।

ভবতারণ আমতা-আমতা করেন।

তবে কিনা আপনি ছোঁড়াটাকে ছেলের মতো করে দেখছেন—

ইন্দ্রাণী বললেন, দুই ছেলে যাক না দু-জায়গায়। দেখা যাক, কালি মাখিয়ে পণ্ডিত মশায় কি করতে পারেন—আর কাদা মাখিয়ে নির্মলই বা কি করে!

প্রসন্ন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

সেই ভাল মা। আমারও হাড়ে বাতাস লাগে। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। স্বচ্ছন্দে ওখানে মাছ ধরে লাঙল চষে রেঁদা ঘষে বেড়াক—

ভবতারণ রসান দেন, ঐ সমস্ত পারবে ভাল। যার যে বৃত্তি। 'ক' চিনতে হবে না ইহজন্মে। পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হলেন বক্ক, গেঁড়িগুগলি আস্বা করেন আমরা হব শঙ্খ! যার যা নয়, তাই হতে পারে কখনো?

১৮

বিকালের পড়ন্ত রোদ দাওয়ায় এসে পড়েছে। বই পড়ছে নির্মল, তন্ময় হয়ে পড়ছে। অমূল্য একটা চাদর নিয়ে এসে চালের বাতায় টাঙিয়ে দিল।

নির্মলের নজর পড়ল। হেসে বলে, কি হচ্ছে?

বেশ মানুষ তুমি নির্মল-দা। চোতের রোদ পোয়াচ্ছ—গা পুড়ে যাচ্ছে, তা হুশ নাই।

ভারি পাজি জিনিষ এই বই। মজে গেলে হুঁশ-জ্ঞান থাকে না।

অমূল্য বলে, কিসের বই? কি আছে ওতে?

ইতিহাস। দেশ-বিদেশের মজার মজার কথা। খানিক পরেই তো তোরা ধরে বসবি! আজকের গল্প এই বই থেকে।

মুহূর্তকাল অমূল্য চুপ করে থাকে। তারপর—যেন কত বড় লজ্জার কথা—তেমনি ভাবে বলল, আমি বই পড়ব নির্মল-দা।

নির্মল হাত ধরে টেনে খুব কাছে নিয়ে এল। চাদর টাঙাতে গিয়ে মাথায় খড়কুটো পড়েছিল, সযত্নে খুঁটে ফেলে দিল। স্মিত মুখে বলে, সত্যি পড়বার ইচ্ছে? কিন্তু ইচ্ছেটা থাকবে ক'দিন?

থাকবে। ও আর শক্তটা কি? কোন কাজটা আমি পারি নে, বলো নির্মল-দা?

নির্মল সহাস্যে বলে, সমস্ত পারো তুমি। বজ্জাতি পারো, ভাল কাজও পারো।

সহসা অমূল্য উত্তেজিত হয়ে উঠে।

প্রসন্ন পণ্ডিত কুচ্ছো করে বেড়াচ্ছে। ভবতারণও সেই সঙ্গে। আমায় দিয়ে নাকি লেখাপড়া হবে না!···পাঠশালা থেকে পণ্ডিত যখন বাসায় ফিরবে, ইট মেরে ঠিক মাথা ফাটিয়ে দেবো।

অমূল্যর বাঁ-হাত পিছন দিকে-লুকানো। নির্মল লক্ষ্য করেছে। বলে, হাতে কি রে?

দেখায় না অমূল্য। সরে গিয়ে দাঁড়াল।

নির্মল জোর করে হাত সামনে আনে। বই। বর্ণ-পরিচয়—প্রথম ভাগ।

হেসে নির্মল বলে, বই নিয়ে এসেছ একেবারে? আমি মনে করলাম ইট। এ ভাল—ইটের চেরে বেশি জব্দ করতে পারবে লেখাপড়া শিখে ফেলে। তখন ওঁদের আর মুখ তুলবার উপায় থাকবে না।

অক্ষরগুলি যেন নানা আকারের খোঁটার বেড়া। পার হতে পারলে তবেই গল্পকথা, ইতিহাস, রকমারি পালাগান এবং তার সঙ্গে সর্বত্র খাতির-সম্মান। সাংঘাতিক বেড়া! আর অমূল্য এখনো মনে মনে যে প্রত্যাশা লালন করছে—নূতন দল গড়তে হলে বই পড়া তো বটেই—হিসাবপত্রের জ্ঞান থাকাও আবশ্যক।

শুধু টাকার জোগাড় থাকলে দল চলে না—দশ জনে ফাঁকি দিয়ে খায়। লক্ষ্মণেরই দেখ না—হিসাব-বোধ কেমন টনটনে। ছ-টাকা মাস-মাইনে হলে বিশ দিনের প্রাপ্য মুখে মুখে বলে দিতে পারে। পাওনাদার এক পয়সা কম পাবে তো বেশি নয়। দল করা অমনি মুখের কথা নয়।

যাত্রাদলের কথা মনে পড়ে অমূল্য খানিক উন্মনা হয়ে থাকে। ভাল ভাল দলের কথা শুনেছে—অজ পাড়াগাঁয়ে নামই শুনেছে কেবল—গান শোনে নি তাদের। সেকালে ছিল নাকি বউ-মাস্টরের দল, নীলকণ্ঠের দল। বউমাস্টার —নামটা বড় মজার। দলের মাস্টার কোন ঘরের বউ নাকি? মথুর সা'র কথাও লোকে খুব বলত—সে দল উঠে গেছে এখন। কত ভাল ভাল দল উঠে গেল, দল টেঁকে না কেন কে জানে! সদরের সরকারি মেলায় সেবার নাম-করা এক যাত্রার দল এসেছিল—খবর শুনে অমূল্য সাত ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়েছিল গান শুনবার আশায়। গিয়ে শোনে, গাওনা শেষ করে সে যাত্রার দল বিদায় নিয়েছে আগের দিনই। লেখাপড়া শিখে সে দল গড়বে—ছোটখাটো নয়—ঐ মথুর সা বা বউ-মাস্টারের দলের মতো। দেশ-বিদেশে নাম ছড়িয়ে যাবে—কোন্ দল আসছে? না, অমূল্য অধিকারীর দল। কত ইজ্জত! অ্যাক্টো করবে না সে দলের অধিকারী হবার পর। মেডেলের মালা গলায় ঝুলিয়ে দু-একটা কেবল গান গেয়ে যাবে। তাতেই ধন্য-ধন্য পড়বে। লক্ষ্মণের মতো হাতে মাথা কাটবে না লোকজনের—ভাল ব্যবহার করবে, দরদ দিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ বুঝবে।

কিন্তু ভরসা তো বড় হয় না! কত অক্ষর, কত রকমের ছাঁদ! এতগুলো বিচিত্র অক্ষরে ঘিরে দুরধিগম্য করে রেখেছে লেখাপড়ার রাজ্য। পৌঁছতে পারবে কি সেখানে?

বর্ণ-পরিচয় খুলে নির্মল বলে, ছবিটা দেখছ—বইয়ের গোড়ার এই ছবি? কে ইনি, বলতে পার?

কয়েকটি ছেলে ঝুঁকে পড়ল।

অতুল বলে, আমি জানি নির্মল-দা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ইনি লিখেছেন এ বই।

কেনারাম বলে, বিদ্যের সাগর—ওরে বাবা! অনেক বিদ্যে ছিল?

নির্মল বলে, শুধু বিদ্যে কেন, সকল গুণের সাগর। তুই ছিলি নে—একবেলা ধরে বিদ্যাসাগর মশায়ের অনেক গল্প করেছিলাম একদিন।

অতুল বলে, হ্যাঁ নির্মল-দা। খাসা খাসা গল্প। এমন ভাল লাগল!

নকুল ফাঁস করে দেয়।

সেই সব গল্প নিয়ে অতুল ছবি এঁকেছে তোমার রং-তুলি চুরি করে।

নির্মল বলে, চুরি হল কিসে? এখানকার যা-কিছু সমস্ত যেমন আমার, তেমনি তোমাদের সকলকার। নিজের জিনিস নিলে চুরি করা হয় না।

অতুলকে বলে, কি এঁকেছ—এনে দেখাও আমাকে।

সলজ্জে অতুল বলে, এখন থাক নির্মল-দা। বাজে—যাচ্ছেতাই হয়েছে।

তাকে লাগল না—নকুলই নিয়ে এল ছবিগুলো। নকুলের জানা আছে, অতুল যে জায়গায় তার এমনিতরো ধনসম্পত্তি রাখে।

নির্মল সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, বিদ্যাসাগর মুটে হয়ে চলেছেন ছোকরা-বাবুর পিছু পিছু। খাসা হয়েছে তো! রেলগাড়ির খানিকটা দেখানো হয়েছে দূরে—তার মানে, ওঁরা স্টেশন থেকে আসছেন। একটা জিনিস ভুল করেছ—রাত্রিবেলার ঘটনা, তার কিছু চিহ্ন থাকা উচিত। এই ধরো—আকাশে চাঁদের ফালি, আবছা অন্ধকার—

অতুলের সঙ্কোচ কেটে গেছে নির্মলের প্রশংসায়। আর একটা ছবি বের করে বলে, অন্ধকার—ঝড়বৃষ্টি এইটেয় রয়েছে, দেখ। 'মা'—বলে সেই যে বিদ্যাসাগর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

অমূল্য সবিস্ময়ে চেয়ে আছে ছবিটার দিকে। প্রশ্ন করে, ঝাঁপ দিলেন কেন?

নির্মল বুঝিয়ে দেয়, মা বাড়ি আসতে লিখেছিলেন। উপরওয়ালা ছুটি দেবে না—তখন চাকরি ছেড়ে দিতে গেলেন। শেষটা ছুটি মিলল তো দুর্যোগের অন্ত নেই। খেয়া বন্ধ—ঝড়-তুফানের মধ্যে সাঁতরে নদী পার হচ্ছেন, এই দেখ—

অমূল্যর মনের মধ্যে দুলে ওঠে। তিন বছর আগেকার এক পুরানো স্মৃতি। মস্ত এক বড়লোকের বাড়ি আধা-চাকরের মতো থাকত সে। বদরাগি সেজ বাবু মাঝে মাঝে বেদম ঠ্যাঙাত। সন্ধিপূজার দিন ঐ সেজ বাবুরই তরুণী বউয়ের কানপাশা—চুরি করে নি, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠার পাশে পড়ে ছিল, কুড়িয়ে নিয়েছিল সে। নিয়ে উল্টা-ট্যাকে গুঁজে রেখেছিল। মস্ত গুণীন নিয়ে এল তারা। শোনা গেল, তিনি চাল পড়ে দিচ্ছেন—সবাইকে দু-চার দানা করে খেতে হবে। যে লোক জিনিস সরিয়েছে, গল-গল করে রক্ত বেরুবে ঐ চাল মুখে ঠেকানো মাত্র। এর উপরে আবার বাটি-চালান হবে সকালবেলা। তুলা-রাশিতে জন্ম এমনি কেউ মন্ত্রপূত বাটিতে হাত রাখবে—বাটি তীরগতিতে গিয়ে উঠবে যে জায়গায় হারানো জিনিস রয়েছে, সেইখানটায়। অব্যর্থ এই মন্ত্র। শুনে অমূল্য কাঁটা হয়ে গেল ভয়ে। সুযোগ হল রাত দুপুরে ক্রিয়াকর্মের বাড়ি নিশুতি হয়ে যাবার পর। সে কি দুর্যোগ সেদিন—শখের থিয়েটার হবার কথা, ঝড়-বাদলের জন্য তা হতে পারল না। তিন ক্রোশ দূরের রেল-স্টেশনে গিয়ে তিনটের গাড়ি ধরবে—গাঙ ঝাঁপিয়ে পার হয়ে গেল, টানের চোটে এক বাঁক সরে গিয়ে কপালীতলার শ্মশানে গিয়ে উঠল। ভাবতে গিয়ে আজও গাঁ কাঁপে। আর কপাল এমনি—ডাঙায় এসে ঠাহর হল, ট্যাকের সেই বস্তু জলে পড়ে গেছে। স্টেশনে গিয়ে দেখল, তিনটের গাড়ি চলে গেছে অল্প একটু আগে। ছুটোছুটি সার হল শুধু। সাত-ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে লক্ষ্মণের দলে এসে জুটল। মা নেই তো—ঝোড়ো নদী উত্তীর্ণ হওয়ার কিছুমাত্র গৌরব নেই, তার কাহিনী কেউ ঢাক পিটিয়ে বলবে না জনসমাজে। জানবেই বা কি করে—অমূল্য সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখে পলায়নের এই কলঙ্ক-কথা।

নকুল একটা ছবি নিয়ে বলে, মোষ কাঁধে করে যাচ্ছেন নাকি ?

অতুল রাগ করে বলে, মোষ দেখলি কোথা ?

এই—এই যে! শিং রয়েছে।

কালো কম্বল উঁচু হয়ে শিঙের মতো দেখাচ্ছে। কম্বলের মধ্যে মানুষ—মাথার একটুখানি বেরিয়ে আছে, এই দেখ। কলেরা হয়েছে মানুষটার।

নির্মল বলে, মানুষটা রাস্তায় পড়েছিল—অনাথ, অসহায়। অত বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত—তবু অজানা অচেনা একজনকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছেন। মানুষের দুঃখে পাগল হয়ে উঠতেন, তাই তো দয়ার সাগর তাঁর নাম।

অমূল্য বলে, এতই দয়া—তবে আমাদের জন্য এই কাণ্ডটা কেন করে গেলেন?

নির্মল বুঝতে পারে না, মুখ তুলে তাকাল।

পাতা ভরতি এই যে—এই যে অ-আ ক-খ সাজিয়ে রেখে গেছেন। একটা-দুটো নয়—এতগুলো কায়দা করা সোজা?

নির্মল হো-হো করে হেসে ওঠে।

অমূল্য বলে, হেসো না। সত্যি আমার দিশে হারিয়ে যায়, গোলকধাঁধার মতো ঠেকে।

নির্মল বলে, জো-সো করে একবার ঢুকে পড়্ দিকি গোলকধাঁধায়। কত মজা আছে দেখতে পাবি। যারা ঢুকতে পারে নি, দুঃখ হবে সেই সব অভাগার জন্য।

অমূল্য বলে, আমার দ্বারা হবে না।

কেন?

ঘাড় নেড়ে বিরস মুখে জোর দিয়ে বলে, না—হবে না। মাথায় আমার গোবর-পোরা।

নির্মল বলে, গোবর নয়—গুবরেপোকা হতে পারে। কট-কট করে কামড় দেয় আর প্রাণ ছটফটিয়ে ওঠে, কোথায় কি দুষ্টুমি করে বেড়াবি। বিদ্যাসাগরও এমনি ছিলেন ছেলেবেলায়—ঠিক এই রকম।

কেনারাম ঠাট্টা করে বলে, অমূল্য বিদ্যাসাগর হবে তা হলে!

নির্মল বলে, কে কি হবে, আগে থাকতে বলা যায় কিছু?

নজর পড়ে গেল অমূল্যর অপ্রতিভ মুখের দিকে। কাছে টেনে এক হাতে তার গলা জড়িয়ে গভীর কণ্ঠে বলল, বিদ্যাসাগর আকাশ থেকে পড়েন নি। একদিন তিনিও এমনি গাঁয়ের পাঠশালার দুষ্টু ছেলে ছিলেন। সবাই তোমরা বিদ্যাসাগর হতে পারো—সেই ভরসায় তো আছি তোমাদের সঙ্গে!

এক মুহূর্ত থামল সে। আবার বলে—কণ্ঠস্বর যেন অশ্রুনিষিক্ত—তোরাই ভরসা বাংলার। তা ছাড়া আলোর রেখামাত্র নেই কোন দিকে। তোরা বড় হয়ে দুর্ভাগ্য বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করিস।

১৯

অসময়ে বাদলা নেমেছে ক'দিন। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পাশাপাশি দুই মশারি। ভবতারণ মশারির বাইরে এসে টেমি জেলে টিকে ধরাচ্ছেন। বেশ ভরাট করে তামাক দিয়েছেন কলকেয়। দুটো টান দিতে না দিতে পুড়ে শেষ হয়—এ রকম তামাক খেয়ে জুত হয় না বৃষ্টিবাদলার দিনে। শরীর গরম হওয়া চাই।

ভুড়ুক-ভুড়ুক করে টানছেন। আয়েশ লাগছে। আজ সন্ধ্যাবেলা মাখা দা-কাটা তামাক। বলবন্ত মেখেছে—ভবতারণ দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিয়েছেন। তামাক-পাতা এমনই তলোক ছিল—আর চিটেগুড় হুঁকোর জল ইত্যাদি মসলা সহযোগে উৎরেছে অতি চমৎকার।

টানতে টানতে কর্তব্যবুদ্ধি সজাগ হল। অমূল্যটা কি করছে? পাশের মশারি উঁচু করে তুললেন একটুখানি। ঠিক আছে—এদিকটায় বলবন্ত আর দেয়ালের ধারে অমূল্য। আচ্ছা জব্দ! বলবন্ত দেহের প্রাচীরে ঘিরে রেখেছে তাকে।

টেমি নিভিয়ে দিলেন। এ তামাক অনেকক্ষণ ধরে চলবে, মিছামিছি কেরোসিন পুড়িয়ে লাভ নেই। তেলও নেই বেশি। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধূম উদ্গীরণ করছেন। মন-প্রাণ পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়েছে। বলবন্তর কথা মনে পড়ল। বেচারি অনেক খেটেছে তামাক-মাখার ব্যাপারে। তার কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাওয়া উচিত।

বলবন্ত, ওরে বেটা বলবন্ত—

হুঁ—বলে সাড়া এল মশারির ভিতর থেকে।

দিবি নাকি দু-টান ?

হুঁ-উ—

নে—

ভবতারণ হুঁকো এগিয়ে দিলেন। মশারি থেকে হাত বাড়িয়ে হুঁকো নিয়ে নিল। কষে টানছে, দম দিচ্ছে ঘন ঘন। অন্ধকারে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ভবতারণের আবার মুখ চুলবুল করে। বলেন, দে এইবার আর এট্টু। শেষ টান টেনে শুয়ে পড়ি।

অনুরোধক্রমে হুঁকো এগিয়ে এল।

অমূল্যর দুর্গতিতে ভবতারণ আত্মশ্লাঘায় ফেটে পড়ছেন। বললেন, বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে শয়তানটা। দু দু-জনে পাহারায় আছি—ভয়ে বেটা পাশ ফিরেও শোয় না।

হ্যাঁ—

আর খাবি নাকি রে ?

সোৎসাহে জবাব আসে, হুঁ-উ-উ—

খেয়ে রেখে দিস।

হুঁকো দিয়ে ভবতারণ শুয়ে পড়লেন। অপর মশারির ভিতরে প্রবল হুঁকো টানার শব্দ। পালোয়ান লোক—কলকে ফাটিয়ে না ফেলে! শুনতে শুনতে ভবতারণ ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে ঘুম ভাঙল বলবন্তর চিৎকারে। এবারে এসে ইন্দ্রাণী ভাল একটা বিলাতি কম্বল দিয়েছিলেন—শীত-শীত করছিল বলে বলবন্ত সেটা বের করে গায়ে দিয়েছিল। সেই মূল্যবান কম্বলে বিঘতখানেক পরিমাণ ছিদ্র।

ক্ষেপে গিয়েছে বলবন্ত। ভবতারণের গা ঝাকিয়ে বলছে, নির্ঘাৎ এ তোমার কাজ। ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাও, টিকের আগুন পড়ে আমার সর্বনাশ হয়েছে।

ভবতারণ ধড়-মড় করে উঠে বসলেন। দেখলেন, ক্ষতি নিদারুণ বটে !

বলবন্ত বলে, নতুন কম্বল তোমাকে কিনে দিতে হবে। কিছুতে ছাড়ব না।

ভবতারণ চটে গেলেন।

টিকের বোধ-জ্ঞান আছে—গুঁড়ি মেরে মশারির ভিতর ঢুকেছে কম্বল পোড়াতে?

বলবন্ত বুঝল যুক্তিটা। কি ভাবে তবে ঘটতে পারে?

ভবতারণ বলেন, কম্বলের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে হুঁকো টানছিলি—সেই সময় কখন পড়েছে। দোষ এখন পরের ঘাড়ে চাপাচ্ছিস।

বলবন্ত আকাশ থেকে পড়ে।

হুঁকো টানছিলাম আমি?

হাঁ রে, হাঁ। হাত বাড়িয়ে একবার নয়—দু দু-বার হুঁকো নিয়ে নিলি।

ঠাট্টার স্বরে বললেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খাচ্ছিলি কিনা—এখন মনে পড়বে না।

আরও রেগে যায় বলবন্ত। মলয় বারান্দায় দাঁত মাজছিল, গণ্ডগোল শুনে ঘরে এল।

অমূল্যও বিরক্ত হয়েছে।

কি লাগালে তোমরা? নাঃ—সকালবেলা একটু পুষিয়ে নেবো, তারও জো নেই। না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁহাতক টেকা যায়?

বলবন্ত বলে, ওরে আমার যাদুমণি! ভক করে কিসের গন্ধ বেরুল মুখ দিয়ে? হুঁকো কে নিয়েছে, বোঝ তবে এইবার।

মলয় বলে, দেখি—শুঁকে দেখি—

অমূল্যর মুখের কাছে মুখ নিয়ে আসে। তারপর ঠাস করে চড় মারল অমূল্যর গালে।

ভবতারণ বলেন, পেট থেকে ছেলে পড়ে—উপুড় হয়ে হুঁকো ধরে! কদ্দিন চালাচ্ছিস এ রকম? উঃ, ব্রাহ্মণকে দিয়ে সাজিয়ে দিব্বি মৌজ করে খেয়ে নিলি—ঘুণাক্ষরে টের পেলাম না?

২০

ইন্দ্রাণীর কাছে ভবতারণ রসালো ভাবে আগাগোড়া বিবৃত করে শেষটায় মন্তব্য করলেন, দুষ্ট গরু ভিন্ন গোয়ালে দিয়েছেন—অতি উত্তম কাজ করেছেন। আমি বলি কি মা, বাড়িতে থাকতে দেওয়াও উচিত নয়। খোকাবাবু হাজার হোক ছেলেমানুষ তো! চোখের উপর এমনি সব হতে থাকলে—

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হয়ে শুনছেন।

গতিক ভাল বোধ হল না। তাড়াতাড়ি ভবতারণ সংশোধন করে নেন, তবে মলয়বাবুর কথা হল গে আলাদা। সোনার থালে মা, মাছি বসে না। এইসব দেখে এমন থাপ্পড় কষে দিয়েছেন যে, চোখে আঁধার দেখল অমূল্য।

মলয় মেরেছে অমূল্যকে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। নোংরা কাজে ওঁর বড্ড ঘেন্না!

ইন্দ্রাণী বললেন, কোথায় সে? ডেকে দিন তো!

ভবতারণ তটস্থ হয়ে মলয়কে ডেকে দিলেন।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, অমূল্যকে নাকি মেরেছিস?

মলয় সগর্বে বলে, তামাক খায় যে!

ভবতারণ টিপ্পনী কাটেন, জাত-কেউটের বাচ্চা মা-লক্ষ্মী। ছোট হলে বিষ কি কিছু কম থাকে?

ডাক-পিওন হৃদয় এসে পড়ায় প্রসঙ্গ চাপা পড়ল। তিন ক্রোশ দূরে বিপ্রকোণা গ্রামে ডাকঘর। ইতিপূর্বে হাটে হাটে এখানকার ডাক বিলি হত। সপ্তাহে দু-দিন হাট—অতএব চিঠি আসত তিন-চার দিন অন্তর। চিঠির সংখ্যাও ছিল নগণ্য—এক এক হাটে দু-পাঁচখানার অধিক নয়। চিঠির জন্য মাথাব্যথাও নেই কারো। এখানকার জীবন-কক্ষপথে চিঠিপত্র ধূমকেতুর মতো নিতান্তই বাড়তি অপ্রয়োজনের জিনিষ।

কিন্তু ইন্দ্রাণীর আসবার সঙ্গে অবস্থা বদলেছে। হৃদয় রোজই আসে। আগের সন্ধ্যায় যে চিঠি ডাকঘরে আসে, সকাল আটটার মধ্যে সে চিঠি পৌঁছে যায় এখানে। এখানকার চিঠি দিয়ে হৃদয় আরও দূর-দূরান্তরের গ্রামে চলে যায়। ফিরবার মুখে দুপুরে খেয়ে যায় এখান থেকে। খাওয়াটা উপাদেয় হয়, বলা বাহুল্য। এর উপর টাকা-সিকেটা প্রাপ্তির আশ্বাসও আছে। এইসব মুনাফার লোভে তিন ক্রোশ ভেঙে রোজ আসে রায়-বাড়ি। এমন কি চিঠিপত্র না থাকলেও আসে।

পিওন দেখে অশোক ছুটে এল।

একগাদা চিঠি। তার মধ্য থেকে পরমাগ্রহে সে একখানা নিয়ে নিল।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, ডক্টর দত্তর চিঠি?

উহুঁ, বাবার—

একবার নজর বুলিয়ে সে বলল, ডক্টর দত্ত এখনো মনস্থির করে উঠতে পারেন নি—নানা জনের খোঁজখবর করছেন—

তাই তো! চিন্তিতভাবে ইন্দ্রাণী বললেন, গিয়ে আর একবার ধরাপাড়া করে দেখবে নাকি?

অশোক বলে, ধরে কিছু করানো যাবে—সে মানুষ ডক্টর দত্ত নন। বাবাই পারতেন তা হলে। তাঁর অনেক দিনের বন্ধু। আর আমার বিশ্বাস, খোঁজাখুজি যতই করুন—কলকাতার ছাত্রের মধ্যে আমার চেয়ে যোগ্যতর কাউকে পাবেন না। বাইরের খবর অবশ্য সঠিক বলতে পারি নে।

আমাদের কথা লিখলেন কিছু?

অশোক পড়তে লাগল—

'একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি। কিছু দেরি হইবে। উহাঁরা ব্যস্ত না হন। যদি এই তাক লাগিয়া যায়, তবে কলিকাতার বাড়ি খরিদ করিয়াও বেশ-কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে...'

ইন্দ্রাণী বললেন, এখন কিন্তু আর কলকাতার বাড়ির সম্পর্কে উৎসাহ নেই—বলেন কি?

নানা কথা ভাবছি। কলকাতায় আমাদের কে চেনে? এখানে শ্বশুরকুলের পুরুষানুক্রমে বসতি। যে দিন এলাম, নৌকো থেকে মাটিতে পা দিতে লোকের কি আনন্দ! কত জনের কত কি জিজ্ঞাসা! মুখের নয়—অন্তরের সত্যিকার ভালবাসার স্বাদ পাচ্ছি এখানে।

অশোক আশ্চর্য হয়ে বলে, কি যে বলেন কাকিমা! কলকাতা শহর আর এই জলজঙ্গল!

না, তাই ভাবছি। মানুষ এ জায়গাতেও তো বসবাস করছে। তবে আমরা আঁৎকে উঠি কি জন্য?

অপর চিঠিগুলো দেখা হচ্ছে। শিক্ষকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, তারই সব দরখাস্ত। একখানা খুলে পড়ে উল্লাসের দীপ্তি ফুটল ইন্দ্রাণীর মুখে। চিঠিটা অশোকের হাতে দিয়ে বললেন, পড়ো। হাসি—হাসি গাঙ্গুলির নাম শুনেছ তো? সে জবাব দিয়েছে।

অশোকের কিন্তু মনে পড়ে না।

ছবি বেরিয়েছিল সেই যে রবিবারের কাগজে। আমি বললাম, আমার বন্ধু।

অশোক পড়ছে। আনন্দে ইন্দ্রাণী চুপচাপ থাকতে পারেন না। ভবতারণের দিকে চেয়ে বলেন, হাসি লীডস য়্যুনিভার্সিটির ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছে। নানা দেশ-বিদেশ ঘুরেছে। তাকে লিখেছিলাম। আমাদের ইস্কুলের ভার নিতে সে রাজি।

ভবতারণ দু-পংক্তি দন্তবিস্তার করে হেসে বললেন, বলেন কি? এ যে হাতি দিয়ে লাঙল চষার ব্যাপার! এমন ধাপধাড়া জায়গায় আসবেন তিনি?

স্মিত মুখে ইন্দ্রাণী বললেন, আমার পরম বন্ধু যে! ছেলেবেলায় ওরা আমাদের পাশের বাড়ি থাকত। এক সঙ্গে ইস্কুলে যেতাম। সে ভালবাসা এখনো বজায় আছে। ভাল সরকারি চাকরি পেতে পারত, সে লোভ ছেড়ে দিয়ে আসছে। আমি লিখেছিলাম—একজন ভাল লোক জোগাড় করে দিতে, তার কথা লিখি নি—কোন্ সাহসে লিখব? সে নিজে থেকে আসতে চাচ্ছে। আমি রয়েছি বলে আসছে, আর কারও ক্ষমতা ছিল না তাকে আনবার।

মৃদু হেসে অশোক বলে, সরকারি চাকরির ডবল মাইনে আপনি তো কবুল করেছেন। এত টাকা আর কেউ দেবে না।

পড়া শেষ করে চিঠি ইন্দ্রাণীকে দিল। বলে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, উনি একটা ভুল ধারণা নিয়ে আসছেন। কোথাও কিছু নেই—শূন্যের উপর ইমারত গড়তে হবে—এতখানি বুঝতে পারেন নি। ভাবছেন, একটা চালু ইস্কুল রয়েছে—

চলছেই তো ইস্কুল—

বারান্দায় মাদুর পেতে বসে গোটা কয়েক ছেলে যার যেমন খুশি খানিকটা গুলতানি করে যায়। আপনার কথায় সেদিন গিয়ে খুঁটিনাটি দেখলাম সমস্ত। ব্ল্যাকবোর্ড কালো চকচক করছে—পণ্ডিত মশায় প্রাণ ধরে তার উপর একটা খড়ির দাগ দিতে দেন না। খাতাপত্রেরও সেই অবস্থা, হাজিরা বইটা অবধি নেই। লেখাজোখার ধার ধারেন না উনি।

ভবতারণ টিপ্পনী কাটেন, ওর বাংলা ইস্কুলে এ রেওয়াজ ছিল না—তাই বলে প্রসন্ন।

ইন্দ্রাণী হাসি গাঙ্গুলির চিঠি পড়লেন আর একবার। অশোক ঠিকই বলেছে—এই ধরনের ইস্কুল বুঝতে পারলে এত উৎসাহ কখনো সে দেখাত না।

বললেন, তেইশে রওনা হবে লিখেছে। আমি বরঞ্চ লিখে দিই, গ্রীষ্মের ছুটির পর এসে যেন যোগ দেয়। মাস দু-তিন হাতে পাওয়া যাবে। তার মধ্যে সকলে মিলে চলতি গোছের ইস্কুল একটা খাড়া করে ফেলা যাক। পয়লা বোশেখে হয়ে উঠবে না—যাক গে, কাজ নেই এত তাড়াহুড়ো করে।

অশোক হাসতে হাসতে বলে, নাঃ—আপনাদের উদ্ধারের আশা নেই। তাঁতিহাট অক্টোপাসের মতো আষ্টেপিষ্টে বাঁধছে। আমি পালাব কাকিমা।

ইচ্ছে করলেই আর পালানো যায় না বাবা। গ্রামের জমিদার আমরা, চোখ টিপে দিলে কোন মাঝি নৌকোয় তুলবে না। হাই ইস্কুল না হওয়া পর্যন্ত ছুটি নেই।

কিন্তু অত ছেলেই বা কোথায় যে হাই ইস্কুল করবেন?

ভবতারণ ফোঁস করে ওঠেন, আমি তো চেঁচিয়ে মরছি মা-জননীর কাছে—হুকুম দিয়ে দিন, ছেলে কি করে জোগাড় হয়—দেখিয়ে দিই।

ইন্দ্রাণী শান্ত কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয় জোগাড় হবে—সে জন্যে আপনারা ভাববেন না। এই গ্রামেরই তো সব! আমাদের প্রজাপাটক।

অশোক দ্বিধাগ্রস্তভাবে তবু বলে, তা ছাড়া এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আমাদের একটুও নেই—

অভিজ্ঞতা আকাশ থেকে পড়ে না অশোক। কাজের ভিতর দিয়ে আসে। আজকেও এই এক গাদা দরখাস্ত এল। অভিজ্ঞ ও বিদ্বান জন চার-পাঁচ মাস্টার চটপট বাছাই করে ফেল।

দরখাস্ত অনেক পড়লাম। সত্যিকার কাজের লোক বলে তার মধ্যে কাউকে তো মনে হয় না। কোথাও পাত্তা না পেয়ে পেটের দায়ে আসছে।

ইন্দ্রাণী কিছু বিরক্তভাবে বললেন, কিন্তু উপায় একটা করতেই হবে। কাজ শুরু করে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। তোমরা আছ—তাই এত করে সাহায্য চাচ্ছি।

অশোক বলে, হাতের কাছে একজন আছে, ইস্কুল গড়ে তোলার আশ্চর্য ক্ষমতা। তার সাহায্য নিচ্ছেন না কেন?

ইন্দ্রাণী বুঝতে পারলেন।

নির্মলের কথা বলছ? শিক্ষা-দীক্ষা তেমন কিছু নয়—তবু একবার তো বলেছিলাম তাকে।

ভবতারণ বলেন, অমন বলার কর্ম নয়। আঙুল বাঁকালে তবে ঘি ওঠে। বলে দিন, জায়গা-জমি দেওয়া হবে না—ইস্কুল তুলে এখানে আসুক। এইটুকু গ্রামে ছেলে ভাগাভাগি হতে দেওয়া হবে না, জোর করে বলুন দিকি এই কথা।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ইন্দ্রাণী ভাবতে লাগলেন।

২১

একটি প্রাণীর দেখা নেই। না ছাত্র, না মাস্টার। অথচ অমূল্য ইন্দ্রাণীর উঠবার অনেক আগে চলে এসেছে। ইস্কুলে আসবার এমনি চাড় হয়েছে ইদানীং।

ইন্দ্রাণী, অশোক ও অমলা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বলবন্তও আছে। আজকের প্রাতর্ভ্রমণ এখানে।

অবশেষে অতুলকে পাওয়া গেল। ছুতোর-ঘরের কোণে বসে একটা বই পড়ছিল। পদশব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলল সে বইটা।

তোমাদের মাস্টারমশায় কোথা ?

বুনোপাড়ায়। রবিবার কিনা—পথঘাট পরিষ্কার হচ্ছে। সবাই সেখানে।

তুমি যাও নি ?

অতুল ব্যথিত কণ্ঠে বলে, সর্দি হয়েছে বলে রোদে নিয়ে গেলেন না।··· ডেকে আনি নির্মল-দাকে ?

ইন্দ্রাণী এরই মধ্যে প্রশ্ন করলেন, ইস্কুল ভাল লাগে তোমাদের ?

ঘাড় নেড়ে হাসিমুখে অতুল বলে, খুব ভাল। পড়তে হয় না কিনা !

অমলা বলে, ঐ যে পড়ছিলে—

দেখি—

বইটা হাতে নিলেন ইন্দ্রাণী। সীতার বনবাস।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন, বুঝতে পার ?

কেন পারব না ? গল্পের বই—পড়ার বই তো নয় !

ইন্দ্রাণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, পৃথিবীতে এই সব বই-ই তো বেশি। পড়ার বই আর ক'খানা—ক'দিনই বা পড়তে হয় ? বেশ বাবা, ভারি খুশি হলাম।

কিন্তু এত সমস্ত শুনবার ধৈর্য্য অতুলের নেই। বলে, আপনারা বসুন। এক দৌড়ে আমি নির্মল-দাকে ডেকে আনছি।

নির্মল এলে ইন্দ্রাণী বললেন, যে জন্যে এসেছি শোন। চিঠি পড়ো আগে—বলছি।

হাসি গাঙ্গুলির চিঠিটা দিলেন। নির্মল পড়ে দেখে বলে, বাঃ, চমৎকার!

ইন্দ্রাণী বললেন, শুধু শুধু মুখে তারিফ করলে কি হবে? অতবড় একজনকে নিয়ে আসছি—টাকা-পয়সার দায়টা না হয় আমি নিলাম—কিন্তু সে যাতে উৎসাহ পায়, লেগে পড়ে থাকতে পারে—এসব ব্যবস্থা গ্রামের মানুষদের করতে হবে।

নির্মল সবিনয়ে বলে, আপনাদের এত বড় ব্যাপারে আমি কোন্ কাজে আসব, বুঝতে পারি নে। হাসি দেবী যেমন ভাবে যা-সমস্ত শেখাবেন, আমি তার কিচ্ছু বুঝি নে।

সরল স্বীকৃতিতে ইন্দ্রাণী প্রীত হলেন। বললেন, সে যাই হোক—আমি বলছি, তুমি এসো আমাদের হাই-ইস্কুলে। এইটুকু তাঁতিহাটে দুটো ইস্কুলে থাকবার প্রয়োজন নেই—

অমলা বলে, ঢাকের কাছে ডুগডুগি—রাখতেও কি পারবেন?

মৃদু হাসি ফুটল নির্মলের মুখে।

তা বটে! চিঠি পড়ে সত্যি ভয় হচ্ছে। এত বনজঙ্গল কাটা নিরর্থক হয়ে যায় বুঝি!

ইন্দ্রাণী বললেন, বলছি তো তাই। জঙ্গলে পড়ে থাকতে হবে না—চলো তোমার ছেলেদের নিয়ে—

কি কাজ দেবেন আপনার ইস্কুলে?

ইন্দ্রাণী বললেন, ভেবে দেখতে হবে সেটা। তোমার চাষবাস আর কারিগরি ব্যাপারের কতটা কি রাখবে, সে হাসি বলতে পারবে। তবে মাইনে দেবার মালিক আমি। এ্যাদ্দিন ধরে খাটাখাটনি করেছ তো—তোমার ওসব না-ও যদি চলে, মাইনে আমি ঠিক ঠিক দিয়ে যাব।

কত দেবেন?

প্রগল্‌ভ অমলা প্রশ্ন করে, কত পেলে খুশি হন আপনি?

নির্মল বলে, মানুষের লোভের কি অন্ত আছে? বড়লোক আপনারা—

পাহাড়, সমুদ্দুর কোন্‌টা মনে মনে আঁচ করে রেখেছেন, কে জানে? বলে ফেলে ঠকে যাব শেষটা?

অশোক বলে, খাতায় দেখলাম, প্রসন্ন পণ্ডিত মশায় পেয়ে থাকেন মাসিক বারো—

বারো টাকায় চলে মানুষের?

অমলা মুখ টিপে হেসে বলে, তা বলে লাখ-পঞ্চাশ এখন কে দেবে? যার যেমন বিদ্যে। হাসি দেবী দুধে চান করেন, ঘিয়ে আঁচান—সকলের সে লোভ করলে চলবে কেন?

ইন্দ্রাণী বাধা দিয়ে বললেন, না—না, পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে তোমার তুলনা হচ্ছে না। তোমায় বেশি দেবো। খালি হাতে এসে একলা জঙ্গল কেটে এত সমস্ত করেছ—

নির্মল বলে, একলা কেন করব? কত ছেলে আমার সঙ্গে খাটছে!

ইন্দ্রাণী বললেন, তা তোমায় পুষিয়ে দেবো। না পোষালে দু-দিন পরে পালাই-পালাই করবে। তাতে কাজ হয় না। তোমায় পঞ্চাশ করে দেবো—যদি এখানকার মতো এমনি মন লাগিয়ে কাজকর্ম করো।

আশাতিরিক্ত পেয়ে পোষা কুকুরের মতো পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়বে, এই ইচ্ছায় বাড়িয়ে বলে দিলেন ইন্দ্রাণী। বলে সগর্ব দৃষ্টিতে নির্মলের ভাব লক্ষ্য করছেন। চুপচাপ আছে সে।

রাজি তো?

রাজি না হওয়া শক্ত বটে!

তবে?

অনেক খাটনি হয়েছে। অনেক কষ্টে কসাড় জঙ্গল সাফ-সাফাই করেছি—

এবার একটু বিরক্তস্বরে ইন্দ্রাণী বললেন, খাটনির ফলও তো পেয়ে যাচ্ছ। তুমি কি মনে কর, জঙ্গলে পাঠশালা চালিয়ে এত টাকা পাবে তুমি মাসে মাসে?

না, কক্ষণো না। জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে নির্মল বলে, পঞ্চাশ টাকা কি

বলছেন—খরচখরচা মিটিয়ে পাঁচটা টাকাও যদি মজুত খাতে আসত, মনের অনেকটা দুশ্চিন্তা কাটত।

কলরব করতে করতে ছেলেরা এল। কাজ শেষ হয়েছে। আবর্জনা সাফ করছিল—পরনে এক এক গামছা। রোদে মুখ বিবর্ণ, কিন্তু হাসিতে ঝিকমিক করছে।

নির্মল-দা, যা ক্ষিধে পেয়েছে—জালা ভরতি মুড়ি চাই। এক-আধ মুঠোয় হবে না।

নির্মল বলে, কারা এসেছেন দেখ্। কাপড়-চোপড় পরে ভদ্র হয়ে আয় শিগগির।

হেসে উঠল সে। কিন্তু ইন্দ্রাণী হাসলেন না। বললেন, আচ্ছা—এই সব তো করে বেড়ায় কেবলি। লেখাপড়া করে কিছু কিছু?

ইচ্ছে হলে নিজেরাই বই-টই নিয়ে বসে। আমার চাপাচাপি নেই।

ইন্দ্রাণী বললেন, বসবার ইচ্ছে হবে কোত্থেকে এত হৈ-চৈর মধ্যে। অমূল্য এখানে আসছে—তা মাসখানেক তো হতে হতে চলল। অ-আ'টা শিখতে পেরেছে?

নির্মল ডাক দিল, অমূল্য!

শুকনা কাপড় পরে অমূল্য বেরিয়ে এল।

নির্মল বলে, হাসি গাঙ্গুলি আসছেন—তাঁতিহাটের ভাগ্য। পড়ে শোনাও তো কি লিখেছেন।

অমূল্য সলজ্জে পড়তে লাগল—'তেইশ চৈত্র, মঙ্গলবার আমি ওখানে পৌছিব। ইস্কুল সম্পর্কে তোমার সকল আয়োজন সেই সময়ে স্বচক্ষে দেখিয়া আনন্দলাভ করিব। চিরদিনই তোমায় কর্মিষ্ঠা বলিয়া জানি। সেবারে কলিকাতায়—'

থামিয়ে দিলেন ইন্দ্রাণী।

থাক—থাক—আমার সম্বন্ধে যা-তা চলল এখন পাতাখানেক ধরে। হাসিটা চিরকাল অমনি। এমন বেকুব করে আমায় যখন তখন!

অশোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, কি মন্তোর জানেন আপনি নির্মলবাবু? কি কায়দায় পড়ান?

পড়াই না তো! নানা খেলার মধ্যে ওরা পড়া-পড়া খেলা করে কখনো কখনো।

নমস্কার নিন মশায়—

নির্মল সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

সত্যি বলছি, আমি কিচ্ছু না। ওরাই শেখে। ওরা বড় ভালো।

আমরা তো বরাবর আর এক রকম শুনে আসছি। লাঠি ছাড়লেই শিশু বিগড়ে যায়।

নির্মল বলে, ঠিক উল্টো। শিক্ষার কৌতূহল ও আগ্রহ অসীম ওদের। লাঠি ধরেই আমরা মাটি করি।

গভীর স্নেহে ইন্দ্রাণী তাকিয়েছিলেন অমূল্যর দিকে। উল্লসিত স্বরে বলে উঠলেন, তোমার কাছে নালিশ আছে নির্মল। সকালবেলা কিছু না খেয়ে আমাকে দেখা না দিয়ে চলে এসেছে। জিজ্ঞাসা করো তো, কেন এ-রকম করে—

নির্মল বলে, কেন রে?

রোদ উঠবার আগেই যে আসতে বলেছিলে নির্মল-দা। অত সকালে উনি ওঠেন না।

ইন্দ্রাণী বললেন, এই আর এক নালিশ। ইনি-উনি বলবে, ঠাকরুন বলে পরিচয় দেবে—কিছুতে মা বলবে না। একটু শাসন করো নির্মল—

মা বলিস না কেন রে?

অমূল্য হেসে ফেলে, ধ্যেৎ—

ইন্দ্রাণী অনুযোগ করেন, শোন—শুনলে তোমার ছাত্রের কথা?

অমূল্য বলে, বড্ড হাসি পায়। মেনি-বিড়াল ম্যাও-ম্যাও করে, সেই রকম মনে হয়। কিছুতে মুখে আসে না—কি করব?

এক ছুটে সে পালিয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হলেন। বললেন, আমি জানি কেন ও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ক'দিন। কিছুতে আমার সামনাসামনি হয় না। কি কাণ্ড হয়েছে—শুনেছ?

নির্মল অবহেলার ভাবে বলে, তামাক খেয়েছিল—সেই তো?

কার কাছে শুনলে?

চাটুজ্জে মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যাচ্ছে-তাই করে তিনি গালিগালাজ করলেন। মহা মুশকিল—নিন্দে শুনে শুনে আমার কান পচে গেল।

ইন্দ্রাণী বলেন, হাসছ তুমি?

মুখ বেজার করতে যাব কেন? তামাক তো বরাবরই খায়। এখানে এসে নতুন শেখে নি।

এ্যাদ্দিন তোমার সঙ্গে বেড়াচ্ছে। মানা করো নি?

জোর-জবরদস্তি নেই—আমি হিতোপদেশ দিতে যাই নে। যখন খারাপ বুঝবে, আপনিই ছেড়ে দেবে।

ছাড়বে কি?

ওরা বড় ভাল। আমি ভালবাসি ওদের। যা সৎ, যা শ্রেষ্ঠ—তার উপর ভালবাসা ক্রমশ জাগবেই।

ধীরে ধীরে কথা ক'টি বলল নির্মল। প্রত্যয়ের দৃঢ়তা ফুটে বেরুচ্ছে তার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে। ইন্দ্রাণী বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালেন।

নির্মল মৃদু হেসে বলে, ছেলেমানুষ এরা—ঘাট-অন্যায় করবেই। তার জন্য লজ্জা পাবার কি আছে? ব্যাকুল হয়ে এত ছুটোছুটিই বা কি জন্য?

ইন্দ্রাণী বলেন, বেশি লজ্জা আমার পেটের ছেলে মলয়কে নিয়ে। ঐটুকু ছেলে চড় মেরে বসল অমূল্যকে। আমি এ ভাবতেও পারি নে—ঘৃণায় আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

নির্মল সান্ত্বনা দেয়, মলয় তো আরও ছেলেমানুষ! সামান্য জিনিষে বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েন। তার কারণ, আস্থা করতে পারেন না ছোট

ছেলেদের উপর। ওরা নিষ্পাপ। একটু-আধটু হয়তো ভুলপথে যায়—কিন্তু পুণ্যের দিকেই ওদের স্বাভাবিক গতি।

অমূল্যকে নিয়েছ, মলয়ের ভারও তুমি নাও নির্মল।

তার হাত জড়িয়ে ধরলেন। ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নির্মল বলে, এই জমি চাষ-করা কাঠ-কোপানো তাঁত-বোনা খোড়োঘরের ইস্কুলে ছেলে দিতে ভরসা পাবেন? আপনার আত্মীয়জনেরাই বা কি বলবেন?

ইন্দ্রাণী বললেন, তাই তো এত করে তোমায় চাচ্ছি আমাদের ইস্কুলে। এমন উত্তম আর পরিশ্রমের শক্তি—তোমায় যদি হেডমাস্টারি দেওয়া চলত, কখনো হাসিকে আনতাম না।

ভালই তো হচ্ছে। নানা দেশ ঘুরে অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছেন, হাই ইস্কুলের জন্য এমন মানুষ সত্যিই দুর্লভ।

কিন্তু তোমার কথা···আসছ তো তুমি?

না—

ইন্দ্রাণী ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সহসা কিছু বলতে পারেন না।

অশোক বলে, কল-কারখানার যুগে ঠুক-ঠুক করে একটু কাঠ কুপিয়ে কিংবা ঠকঠকি তাঁতে দু-খানা গামছা বুনে চতুর্বর্গ-লাভ হবে—কি করে বিশ্বাস করেন আপনি? সময় ও শক্তির অপব্যয়। অমলা শৌখিন সুতো কাটে, কার্পেটে ফুল তোলে। এসব ওদেরই মানায়। গরিব ছেলেদের শিল্পকর্ম বলে চতুর্গুণ দামে আপনার ইস্কুলের মাল বাজারে বিকোবে না। কিন্তু তেমন দাম না পেলে তো পোষাতেও পারবেন না।

নির্মল হাসে।

হেসে উড়িয়ে দিলে হবে না। জবাব দিন।

নির্মল বলে, হাতে-কলমে না করলে ঠিক ধারণায় আসে না। এই ধরুন—ছেলেরা আখ চাষ করে। তার বাজার-দর কত, সেটা তেমন বিবেচ্য নয়। কে কতগুলো আখ কাটল—তারা গুণতে শিখেছে, মাটির প্রকৃতি চিনেছে, চাষ-উপলক্ষে আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস জেগেছে তাদের মনে।

অঙ্ক, প্রকৃতিপাঠ—ছাপা বইয়ে নীরস শব্দের কচকচি মাত্র নয় আর তাদের কাছে। একে বলা যেতে পারে জীবন-কেন্দ্রিক পাঠক্রম…

থেমে গেল। বুঝতে পারল, বক্তৃতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হেসে ফেলল লজ্জায়। মুক্তার মতো দু-পাটি দাঁত ঝিকমিক করে উঠল।

অশোক বলে, আপনি অনেক বুঝি ভাবেন?

আমি কি বুঝি? দেশের যাঁরা শিক্ষা-নেতা তাঁরাই ভাবছেন। এসব তাঁদেরই কথা।

ইন্দ্রাণী তিক্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, তোমার কথা মোটের উপর দাঁড়াচ্ছে—ভিন্ন ইস্কুল চাইই চাই। এই একেশ্বর রাজত্ব ছাড়বে না কিছুতে।

অমলা হেসে টিপ্পনী কাটে, বনগাঁয়ের শিয়াল-রাজা—

নির্মল বলে, ইস্কুল গড়ছি, কিন্তু প্রতিযোগিতা নয়—সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে। প্রতিযোগিতার কথাটাই সকলের আগে মনে আসে, ঐভাবে ভাবতে অভ্যস্ত আমরা। ছেলেদেরও তাই শেখাই। ক্লাসে কান মলে একজন আর একজনের উপরে ওঠে। জীবনেও তাই।

ইন্দ্রাণী বললেন, তা-ই যদি হয়—আলাদা হয়ে থাকবার তবে তো কোন মানে হয় না। তোমার খুশি মতো তাঁতঘর-ছুতোরঘর বানিয়ে দেবো না হয়। ও-সবের রেওয়াজ হচ্ছেও বটে ইদানীং! তা হলে আর আপত্তি থাকতে পারে না।

একটু ইতস্তত করে নির্মল বলে, দেখুন—দেশের শতকরা নব্বুইটি ছেলে খোড়ো-ঘরে থাকে। বড়লোকের অট্টালিকার আনাচে-কানাচে ঘুরিয়ে খানিকটা শুধু আত্ম-অবমাননা হবে, সত্যিকার কোন লাভ হতে পারে না।

ইন্দ্রাণীর মুখ আরক্ত হল। সামলে নিয়ে তবু শান্ত কণ্ঠে বললেন, আনাচে-কানাচে কেন? সমস্ত সদরবাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছি। গাঁয়ের জমিদারির কতকটা লেখাপড়া করে দেবো ভাবছি ইস্কুলের জন্য।

নির্মল বলে, টাকা থাকলে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু টাকার চেয়েও লোকের বেশি দরকার। যে লোকের দরদ আছে, গাঁয়ের নাড়ি-নক্ষত্রের সঙ্গে

পরিচয় আছে। অনেক দুঃখ-ধান্দায়—মায়ের গায়ের গয়না ক'খানা অবধি বিক্রি করে এই সব জোগাড় করেছি, কিন্তু দেখলেন তো—তাঁতে ধুলো জমেছে, চাষ করে বীজধানটা অবধি ঘরে আসে না—

তবু কোথায় তোমার বাধছে, আমায় খুলে বলো—

নির্মল বলে, মাপ করুন। যথেষ্ট হয়েছে। কাজ নেই আর অপ্রীতিকর আলোচনায়।

ইন্দ্রাণী জেদ করলেন, শুনবই আমি। না শুনে এক-পা এখান থেকে নড়ছি না।

নির্মল বলে, বড়লোকের সদরে সেকালে পিলখানায় হাতি, আস্তাবলে ঘোড়া বাঁধা থাকত। একালে সদরবাড়িতে এই যে ইস্কুল করবার রেওয়াজ, এরও মূলে রয়েছে বড়মানুষি জাহির করা। শান্তভাবে বুঝে দেখুনগে মনে মনে, ছেলেপুলের কচি কচি মন হেলাফেলার বস্তু নয়—হাই-ইস্কুলের বাঁধা ছকে পোষাবে না আমার।

কথাগুলো বলছে, হাসছে তবু মিটিমিটি। কিশোর বয়সে একদা সাহেবের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা মেরেছিল, সেদিনও কি হেসেছিল এমনি?

সমস্ত পথ ইন্দ্রাণী একটি কথা বললেন না কারও সঙ্গে। হাসিকে বিশদভাবে সমস্ত জানিয়ে চিঠি লিখলেন—কিছু রেখে ঢেকে লিখলেন না। চিঠির জবাবও এল। ইন্দ্রাণী এর মধ্যে রয়েছেন—সকল অসুবিধা স্বীকার করেই হাসি আসবেন। ভালই তো—একেবারে গোড়া থেকেই শুরু হবে। পূর্বনির্দিষ্ট তেইশে তারিখেই আসছেন তিনি। পুরোপুরি হাই-ইস্কুল পয়লা বৈশাখ থেকে না-ই বা চলল, তাঁরা কাজে নেমে পড়বেন ঐ তেইশে থেকেই।

হাসি গাঙ্গুলি আসছেন—এ-ও এক বিচিত্র-পার্বণ। সরস্বতী পূজোর চেয়েও চমকদার। বিলাত-ফেরত মেয়ে ইতিপূর্বে আর কখনো তাঁতিহাটে আসে নি। এসে সর্বপ্রথম হাসি পাঠশালাটা পরিদর্শন করবেন। প্রসন্ন পণ্ডিতের ঐ গণ্ডা চারেক ছাত্র নয়—গ্রামের সব ক'টি এবং গ্রামের বাইরেরও ছেলে জুটোবার

প্রাণপাত চেষ্টা চলছে। ইতর-ভদ্র নিয়ে এক সভার অনুষ্ঠানও হবে—শিক্ষার মহিমা হাসি দেবী বুঝিয়ে বলবেন সকলের কাছে।

আপাতত এই অবধি ঠিক হয়েছে। হাসি এসে আর যে রকম বলেন, করা যাবে।

ভবতারণ খুব ভরসা দিচ্ছেন। খাটছেনও খুব।

কিচ্ছু ভাববেন না মা। হাটে কাড়া দিয়েছি। পাইক-বরকন্দাজরা ছাপানো বিজ্ঞাপন ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সভায় লোক ভেঙে পড়বে।

প্রসন্ন বলেন, আপনি হলেন ভূস্বামিনী—আপনার খাতির হবে না, খাতির হবে ঐ ইটেভিটেশূন্য বাউণ্ডুলেটার? ছেলেপুলে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসছে, কুঠির ইস্কুলের চালে দেখতে পাবেন অতঃপর চামচিকে ঝুলছে।

ভবতারণ বলেন, সবাই তো প্রজাপাটক—যে ছেলে না পাঠাবে, কিস্তিতে কিস্তিতে তার নামে খাজনার নালিশ দায়ের হবে। তারপর ধরুন গে, আমাদের হরিতোষবাবু ফুড-কমিটির সেক্রেটারি—শাসিয়ে এসেছি, ছেলে না পাঠালে কাপড়-কেরাসিন একদম বন্ধ হয়ে যাবে।

ইন্দ্রাণী বললেন, ছি-ছি! ওসব বলতে কে বলেছে আপনাদের? আমাদের আদর্শ আর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝান—তাতেই কাজ হবে।

২২

চারিদিক সাফ-সাফাই। দেবদারু-পাতা, ফুল ও কলাগাছে গেট তৈরি হয়েছে কাছারি-দালানের পৈঠার উপর। দালানের ভিতরে সারি সারি বেঞ্চি পড়েছে—খান কয়েক চেয়ার সামনের দিকে। ফর্সা কাপড়চোপড়-পরা ছেলেরা বেঞ্চিতে। চেষ্টা বিফল হয় নি—ছেলে অনেক জুটে গেছে। গমগম করছে কাছারি-দালান।

হাসি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে এসে ঢুকলেন। শ্যামবর্ণ—স্থূলাঙ্গী। আরও তিনজন মাস্টার আনা হয়েছে ইতিমধ্যে—তাঁরা উপস্থিত আছেন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে হাসিকে অভ্যর্থনা করল।

সব চেয়ে বড় চেয়ারটায় বসানো হল হাসিকে। ইন্দ্রাণী তাঁর পাশে। প্রসন্ন হাত কচলে হেঁ-হেঁ করছেন।

ইয়েস ম্যাডাম। হেডমাস্টার বলুন, হেডপণ্ডিত বলুন—একাধারে আমিই ছিলাম এতাবৎ কাল। এই তিন জন নতুন এসেছেন—পাঁচকড়িবাবু মোহিতবাবু আর অম্বুজাক্ষবাবু। আমাদের পাড়াগাঁয়ের পড়াশুনার গতিক রপ্ত করে নিতে এঁদের সময় লাগবে। বাংলা ইস্কুলে আমার শিক্ষা—সেখানে ভূভারতের সমস্ত কিছু শিখতে হত। সে কি আজকের কথা? ম্যাডাম জন্মান নি তখনো। বিদ্যেয় বড়, বুদ্ধিতে বড়—আজ্ঞে হ্যাঁ, আকৃতিতেও বড়। সব দিক দিয়ে বড় আপনি। একটা বিষয়ে কেবল ছোট আছেন আজ্ঞে। বয়সে। অনেক ছোট।

অমূল্য বেঢপ লম্বা। নজরে পড়ে গিয়ে দুর্ভোগ না ঘটে, এই আশঙ্কায় সকলের পিছনে গুটিশুটি হয়ে সে আত্মগোপনের চেষ্টায় ছিল। তাতেই বিপদ ঘটল আরো—প্রশ্নের প্রথম ধাক্কা পড়ল তার উপর।

এই, উঠে দাঁড়াও তো! নাম কি তোমার?

অমূল্য জড়িত কণ্ঠে নাম বলল।

আচ্ছা, দিবারাত্রি হয় কেন—বলতে পার? প্রসন্নর দিকে চেয়ে হাসি জিজ্ঞাসা করলেন, ভূগোল শেখান না? বাংলা ইস্কুলে তো শুনেছি ভূগোল আর শুভঙ্করী নিয়েই মাতামাতি।

প্রসন্ন শুষ্ক মুখে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। শেখানো হয় বই কি!

হাসি বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, বলতে পারছে না কেন তবে? দিনরাত্রি কি ভাবে হয়—এর চেয়ে সোজা প্রশ্ন আর কি হতে পারে?

প্রসন্ন উৎসাহ দিয়ে বলেন, বল্—বল্ না রে—ভয় কিসের? সূর্যদেব সকালবেলা উদয় হয়ে আকাশ ঘুরে সন্ধ্যেয় অস্ত যান। তাইতে দিনমান হচ্ছে। সবই তো পড়ানো আছে।

হাসি চমকে প্রশ্ন করলেন, সে কি পণ্ডিত মশায়, সূর্য ঘোরে—এই পড়ান আপনি?

ঘোরে না?

না। পৃথিবী ঘোরে। সূর্য চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাংলা-ইস্কুলে কি এই শিখে এসেছেন? ছি-ছি!

পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে বললেন, কিন্তু চোখে তো দেখা যায়—

হাসি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন।

চোখে যা দেখেন, সব মিথ্যে। ছেলেদের আপনি ভুল শিখিয়ে আসছেন। ইন্দ্রাণীকে বললেন, পাকা চুল দেখেই পণ্ডিতি দিয়েছ? কচি মাথাগুলো চিবিয়ে খাচ্ছেন, তাকিয়েও দেখ নি কোন দিন?

ইন্দ্রাণী বড় বেকুব হয়েছেন, মুখ-চোখের ভাবে বোঝা যাচ্ছে। পণ্ডিত কাতর কণ্ঠে বললেন, বিশ বছর পড়াচ্ছি ম্যাডাম। বেশি হবে তো কম নয়। বেশ তো—আপনাদের বিলাতি মতে পৃথিবী ঘোরে তো ঘুরুক না যত খুশি! এবার থেকে সেই রকমই পড়াব। সূর্য না ঘুরে পৃথিবী যদি ঘোরে, আমার তাতে কি ক্ষতি বলুন?

হাসি হেসে ফেললেন। অতএব হাসতে পারেন তিনি। এ অবস্থায় না হেসে পারে না কেউ। নূতন মাস্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ভাবে হবে না। এক কাজ করুন আপনারা—প্রত্যেক ছেলেকে আলাদা আলাদা একটু বাজিয়ে নিয়ে মোটামুটি স্থির করুন, কাকে কোন্ ক্লাসে ফেলা যেতে পারে। সেই মতো ক্লাস ভাগ হোক। দিন কয়েক পরে একটা লিখিত-পরীক্ষা হবে। প্রশ্নপত্র আমি তৈরি করব। সেই পরীক্ষার ফল দেখে পাকাপাকি ব্যবস্থা করা যাবে। গোটা পাঁচ-ছয় ক্লাস নিয়ে কাজ শুরু হোক এমনিভাবে—কি বলেন আপনারা?

নূতন মাস্টারেরা ঘাড় নেড়ে সমর্থন করলেন। এ ছাড়া উপায়ই বা কি?

হাসি তারপর আরও কয়েকটি ছেলেকে প্রশ্ন করলেন। মলয়ই ভাল জবাব দিল সকলের মধ্যে। নিঃসন্দেহ মেধাবী ছেলে। আর একটা গুণ—সকলে ঘাবড়ে গিয়েছে, তার দৃকপাত নেই কিছুমাত্র।

পাঠশালা ছুটি দিয়ে বাড়ির ভিতর চললেন বিশ্রামের জন্য। বিকালে সভা আছে; সদর উঠানে এরই মধ্যে দু-জন চারজন করে লোক জমতে শুরু হয়েছে।

ইন্দ্রাণীর নজরে পড়ল, নির্মল জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল এতক্ষণ। আহ্বান করা হয় নি তাকে—এমনি চলে এসেছে।

কাছে গিয়ে ইন্দ্রাণী রুক্ষ কণ্ঠে বললেন, তুমি এখানে?

বাক্সর চাবি অমূল্যর কাছে। হঠাৎ ক'টা টাকার দরকার পড়ে গেল, তাই চাবি নিতে এসেছিলাম। এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। ঐ অবস্থায় চাবি চাওয়া যায় না তো!

ইন্দ্রাণী শিউরে উঠলেন মনে মনে।

চাবি অমূল্যর কাছে দিয়েছ? কত টাকা আছে বাক্সে?

নির্মল বলে, আমাদের আবার টাকা! গয়না-বিক্রির হাজার খানেক থেকে খরচপত্র হয়ে হয়ে শ' দুই-তিনে ঠেকেছে বোধ হয়। ঠিক জানা নেই, অমূল্যই গুণে গেঁথে রাখে।

চাবি নিয়ে নাও ওর কাছ থেকে।

নির্মল সদুঃখে বলে, নিতেই তো হবে—আর যখন যেতে দিচ্ছেন না। এদিককার সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম—চাপ এবার থেকে একটু বেশি পড়বে। কি করা যাবে—আপনি বড়-ইস্কুল করছেন, ওকে তো পড়তেই হবে এখানে।

গর্বিত কণ্ঠে ইন্দ্রাণী বললেন, সকলকেই পড়তে হবে। মানে, আসবে সকলে নিজের ইচ্ছেয়।

নির্মল হেসে বলে, তা তো দেখতে পাচ্ছি। আমার চাষাড়ে ইস্কুল একেবারে সাফ করে নিয়ে এসেছেন। বেকার করে ফেলেছেন, কাজকর্ম নেই। নইলে কি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি? ভারী চঞ্চল কিন্তু এরা—টিকিয়ে রাখা শক্ত। সেইটে দেখবেন। জোর-জবরদস্তিতে হবে না।

প্রসন্ন এসে পড়লেন। অপমানে জ্বলছেন তিনি যেন। বললেন, শুনলেন তো মা-লক্ষ্মী? এতকাল পড়াচ্ছি—আর কালাপানি-পারের কি বিদ্যে শিখে এসে ফট করে মুখের উপর বলে বসলেন, কাঁচা-মাথা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছি আমি।

চোখে জল এসে গেল। বলতে লাগলেন, ঈশ্বর জেনে বিচার করবেন—

হিত ছাড়া অহিত কারো কখনো করেছি কিনা! এই যে নির্মল ছোঁড়া এমন আড়ে-হাতে লেগেছে—এরও ভাল চেয়েছি আমি।

নির্মল গাঢ়স্বরে বলে, হ্যাঁ পণ্ডিত মশায়, আমরা বুঝি—কত ভালবাসেন সকলকে আপনি। সেই যে কালোবয়রার সন্ধান দিলেন—বীজধান জোগাড় হয়ে গেছে। সাহেব-দীঘির ধান রাখতে গোলা বাঁধতে হবে এবার। আমার ছেলেদের ভাতের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ইন্দ্রাণী প্রসন্নকে বললেন, অতি সামান্য সাধারণ একটা জিনিষ জানেন না—আমি কি লজ্জায় পড়লাম, ভাবুন তো!

নির্মল বলে, সূর্য আর পৃথিবী সামান্য জিনিষ হল? পৃথিবীই ঘোরে, সূর্য নিশ্চল—তা-ও কি ঠিক?···সত্যি বলছি, বিস্তর কৌতূহল ছিল—অত বড় একজন শিক্ষাবিদ্ সদ্য স্বাধীনতা-পাওয়া দেশের ছোট ছোট ছেলেদের কি জিজ্ঞাসা করেন, শোনবার জন্য। কিন্তু মান্ধাতার আমলের সূর্য আর পৃথিবী—আর কিছু নয়।

ইন্দ্রাণী ব্যঙ্গস্বরে বললেন, সূর্য-পৃথিবী বাদ দিয়েই বুঝি তোমার ইস্কুল চলবে?

নির্মল বলে, কাছের যারা, তাদের কথা সকলের আগে। তা ছাড়া সূর্য-পৃথিবীর সম্পর্ক মুখস্থ করে শিখবে না কেউ। চোখের উপর যথাসম্ভব দেখিয়ে দিতে হবে, কারো যাতে ধাঁধা না থাকে এ সম্পর্কে। আমাদের ছুতোরঘর রয়েছে—ব্যবস্থা করাও কঠিন হবে না।

পণ্ডিত ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমি কিছু জানি নে, আমি মুখ্যু—এক-ঘর লোকের মধ্যে আমার পড়ুয়াদের সামনে রায় দিয়ে গেলেন। বলুন তো উনি মুখে মুখে, সতের টাকা আট আনা তিন গণ্ডা দু-কড়া মন হলে এক কাচ্চার দাম কত? পারেন?

ইন্দ্রাণী বললেন, মুখে মুখে নাই বা পারলেন, কাগজ-কলম আছে কি জন্য?

ব্রহ্মোত্তর-তায়দাদ বের করে দেন একখানা, কিম্বা পুরানো জরিপ-চিঠা। খুব তো বিদ্বান—দেখি, কেমন পড়তে পারেন? আর উনি তিন ছত্র লিখে যান,

আমিও লিখি। কে কত তাড়াতাড়ি লিখতে পারে, কার লেখা ছাপার মতো হয়—দশজনে দেখে বলুক।

ইন্দ্রাণী বলেন, ছাপাখানা রয়েছে, কষ্ট করে ঝকঝকে লিখবার দরকারটা কি?

প্রসন্ন বলতে লাগলেন, লেখা-পড়া-অঙ্ক কোন কিছুর দরকার নেই, সূর্য ঘোরে কি পৃথিবী ঘোরে—সেইটেই লাগবে শুধু?

নির্মল বলে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন পণ্ডিত মশায়। তাঁতে ধূলো জমছে, চাষে জুত করা যাচ্ছে না—একটা হিসাব ঠিক করতে কাগজ-কলম নিয়ে দু-ঘণ্টা হিমসিম খাই। হাই-ইস্কুলে আপনার মর্যাদা বুঝবে না—কিন্তু আপনার মতো বিদ্বান মানুষের বড় দরকার আমাদের।

ইন্দ্রাণী আগুন হয়ে বললেন, এ্যাদ্দিন ছেলে ভাঙিয়েছ, এবার মাস্টার ভাঙাতে এলে? এ বাড়ির কর্তা ওকে চাকরি দিয়ে গেছেন। হাসি আসুক, যে-ই আসুক—ওঁর চাকরি যাবে না। ইস্কুলের কাজে না নিতে চায়, বাড়িতে বসিয়ে রেখে আমি মাইনে দিয়ে যাব। যেদিন জবাব দেওয়া হবে, সেই দিন এসে হাত ধোরো। তার আগে নয়। যাও, চলে যাও তুমি—

পৃথিবী শুধু ঘুরছে না—তার পৃষ্ঠে মানুষও ঘুরছে, ঘুরে ফিরে আবার এক জায়গায় এসে পড়ছে।

তারই এক প্রমাণ পাওয়া গেল হরিপদকে দেখে। গোকুলের পথের সেই দীর্ঘগুম্ফ গোপ হাসি দেবীর খাস চাকর হয়ে সঙ্গে এসেছে। ইস্কুলের হাঙ্গামটা চুকিয়ে অবশেষে ফাঁক পাওয়া গেল—অমূল্য নিভৃতে হাত জড়িয়ে ধরল তার।

হরিপদ বলে, এত করেও ভাই, লক্ষ্মণের সঙ্গে বনাতে পারলাম না। ছাড়িয়ে দিল। একলা আমায় নয়,—পাঁচু, অধরকেও ছাড়িয়েছে। তার মানে, বর্ষাকাল আসছে, দল এখন কিছু দিন বন্ধ থাকবে তো—ফালতুদের ছাড়িয়ে দিয়ে খরচা কমাচ্ছে। কেষ্ট-বিষ্টু দু-চারজন রাখবে শুধু। চুপচাপ বসে থেকে কি করা

যায়—এঁর সঙ্গে জুটেছি। যে ক'টা দিন কাটানো যায়, তাই লাভ।···তোর কি হল? দল-টল জোটাতে পারলি নে আজও?

অমূল্য সকৌতুকে বলে, দল জুটিয়ে ফেলেছি হরিপদ-দা। জবর দল।

মাইরি? যাঃ, মিছে কথা বলছিস। তা হলে কি জাবর কাটতিস ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে বসে?

অমূল্য বলে, শুধু দু-চার দিনের জন্যে। কি করব—ঠাকরুন শোনেন না। দল ছেড়ে থাকছি আমি এখানে—বয়ে গেছে!

সহসা গভীর কণ্ঠে বলল, এত ভাগ্যি হবে, কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি হরিপদ-দা—

উৎসাহে হরিপদর দু-চোখ চক-চক করে ওঠে।

যাত্রার দল? নাম কি দলের?

নবীন যাত্রা।

লক্ষ্মণ গিয়ে এবারে নবীন হলেন অধিকারী? লোক কেমন?

মাটির মানুষ। কিচ্ছু বলেন না—কোন ঝামেলা নেই। নাম হল নির্মল। অধিকারীর নামে দল নয়। এতকাল পার্ট করছ—নবীনের মানে জান না?

তা জানে বই কি! নবীন মানে নূতন—শক্ত কথা কিছু নয়। লক্ষ্মণ-যাত্রার দলে থেকে এসে ভেবেছে, নবীন হবে একটা কোন মানুষ। তা বেশ—অধিকারী লোকটা সৎ বলেই মনে হচ্ছে—নিজের ঢাক পেটাবার জন্য দল করে নি।

হরিপদ বলে, আমায় নেবে? বলে কয়ে দে না একটু—

সবাইকে নেন, কাউকে ফেরান না। গেলেই হল। আমি তো গিয়ে পড়লাম—সে ভারি মজার—প্রাণের পরোয়া না করে চৌবাচ্চার গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম হরিপদ-দা—

হাসি, ইন্দ্রাণী ও দলবল দেখে সুরুৎ করে সরে পড়ল। সভায় যাচ্ছেন ওঁরা। থাকগে এখন—এক বাড়িতে রইল, অনেক সময় পাবে কথাবার্তার।

ইন্দ্রাণী সংক্ষেপে দু-চার কথা বললেন। হাই-ইস্কুল হবে সমস্ত সদরবাড়ি জুড়ে, বিনা মাইনেয় ছেলেরা পড়বে। এস্টেট থেকে বই-কাগজ-পেন্সিল সরবরাহ করা হবে বিনা খরচায়। খেলাধুলার ব্যবস্থাও থাকবে প্রচুর। এঁদের যা-কিছু করণীয়, এঁরা করবেন—কিন্তু গ্রামবাসীরা শিক্ষার ব্যাপারে যদি সজাগ না হন, ফল কিছুই হবে না।

ইস্কুলের নামকরণ হয়েছে—নবকিশোর হাই ইস্কুল। লাল শালুর উপর তুলোর উঁচু অক্ষরে লেখা।

অধ্যক্ষের নামও আছে। নামের সঙ্গে ডিগ্রিগুলা এবং যাবতীয় গুণপনা কাগজে লিখে শালুর নিচে এঁটে দেওয়া হয়েছে।

ইন্দ্রাণীর পর হাসি উঠলেন। গুঞ্জন উঠল তিনি বলতে শুরু করলে। যেন চাপা হাসি। ইন্দ্রাণী হাত উঁচু করলেন। কিন্তু কমে না। হাসি আরম্ভ করেছিলেন মৃদুভাবে—ক্রুদ্ধ হয়ে জোরালো কণ্ঠে গালি দিতে লাগলেন। ডিসিপ্লিনের অভাব সমাজের সর্বক্ষেত্রে—স্বাধীনতার ফলে কোনই কল্যাণ আসবে না, দেশের মানুষ যদি শৃঙ্খলা ও নিয়মনিষ্ঠা না শেখে। লেখাপড়ার চেয়ে তিনি ডিসিপ্লিনের দিকে মনোযোগ দেবেন বেশি। তাঁর ছেলেরা এক তালে পা ফেলে চলবে, এক সঙ্গে হাত তুলবে, এক সঙ্গে একই কথা বলে উঠবে, ইঙ্গিত মাত্রে নিঃশব্দ হবে পলকের মধ্যে। ছেলেদের পোশাকও এক হবে এই তিনি চান—ধরুন, খাঁকি হাফ-প্যাণ্ট আর সাদা হাফ-সার্ট। আজকেই নয়—ধীরে ধীরে এসব প্রবর্তন করতে চান তিনি।

বলতে লাগলেন, সকলের ভাবনা-চিন্তাও একমুখী হবে ক্রমশ। সমস্ত মিলে এক বিশাল শক্তিমান জাতি—কেউ বিচ্ছিন্ন একক নয়। মানুষ একটা বড় মেশিনের অংশবিশেষ—পৃথকভাবে একেবারে মূল্যহীন...

কিন্তু গোলমাল তুমুল হয়ে উঠেছে। রীতিমত হাস্যরোল। হাসি সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে উঠানের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। জামরুল-তলায় কতকগুলো ছেলে আঙুল দিয়ে হাসিকে দেখাচ্ছে, আর কি দেখাচ্ছে পিছনদিকে। হাসি পিছন ফিরলেন। দু-চোখে আগুন ছুটল। বক্তব্য

থামিয়ে ধপ করে বসে পড়লেন তিনি চেয়ারে। পরমুহূর্তে সভা ছেড়ে চলে গেলেন।

নবকিশোর হাই ইস্কুলের অধ্যক্ষের নাম হাসি গাঙ্গুলির জায়গায় মোটা মোটা অক্ষরে কে হাতি গাঙ্গুলি করে দিয়েছে।

মলয় ও তিন-চারটে ছেলে লুটোপুটি খাচ্ছে। অমূল্য থাকতে পারে না—গিয়ে পড়ল তাদের মাঝে।

খুব অন্যায় কাজ করেছ।

মলয় থতমত খেয়ে বলে, কি ?

ঐ রকম লিখে রেখে ওঁর অপমান করা—

মলয় রুখে ওঠে, কে বলেছে আমরা লিখেছি ?

অমূল্য বলে, তোমাদের মুখ-চোখ আর মুখের হাসি বলে দিচ্ছে। মিথ্যে বলে পাপ ঢাকতে যেও না।

ওরে আমার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! তবু যদি চাটুজ্জে মশায়ের হুঁকো খেয়ে ধরা না পড়তে!

অমূল্য শান্তকণ্ঠে বলে, আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! আমার কে আছে, কার মাথা হেঁট হবে আমি ছোট কাজ করলে? তোমার রয়েছেন মা—ভগবতীর মতো মা-ঠাকরুন। চিঠিপত্র লিখে তিনি হাসি দেবীকে নিয়ে এসেছেন। হাতি বললে মাকেই যে অপমান করা হয়!

অমূল্যর কথায় আমল দিল না তারা। জোরে হেসে উঠল।

সভাভঙ্গের হট্টগোলের মধ্যে হৃদয় পিওন হন্তদন্ত হয়ে বেড়াচ্ছিল। সঙ্গে ভীম সর্দার। অমলাকে দেখে ভীম বলে, মাস্টের আয়েলেন। কোয়ানে গেলেন তিনি?

অমলা বলে, দেখেছিলাম অনেকক্ষণ আগে। মা'র সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হল। তারপর চলে গেছেন।

উড়ে যাতি পারেন না। গেলেন কোয়ানে?…তা ওড়া দিদিঠাকরুনিরি দেও না তুমি।

হৃদয় ইতস্তত করে, দেবো ?

অমলা প্রশ্ন করে, কি ওটা ?

হৃদয় বলে, নির্মলবাবুর নামে টেলিগ্রাম এসেছে। তাঁকে কোথাও পাচ্ছি নে।

ভীম জোর দিয়ে বলে, দেও ওনারে, দেবা না তো কি ? ইংরাজিতি তার আয়েছে—মাস্টের ইংরাজির কি বোঝবেনে ? আবার দৌড়তি হবেনে ইদিক পানে পড়ায়ে নিবার জন্যি। তার চায়ে উনি পড়ে দেন, সেই কথাগুলো যায়ে মাস্টেররে কবানে।...ভাল-মন্দ কি হল, কেডা কবে ? বুকির মধ্যে ঢেকির পাড় পড়তিছে। পড়ে দেখদিনি দিদি—

অমলা বলে, কোন চুলোয় কেউ তো নেই জানি। টেলিগ্রাম করল কে ?

খুলে দেখে বলে, ভয়ের কিছু নেই ভীম। আনন্দের খবর—তোমাদের মাস্টার মশায়ের চাকরি হয়েছে।

আনন্দের খবরে ভীম আৎকে ওঠে।

অ্যাঁ ?

খুব বড় চাকরি।

আরে সর্বনাশ! চলে যাতি হবেনে এখেনতে ?

অমলা ব্যস্তসমস্ত হয়ে খোঁজ করে, অশোক-দা! অশোক-দা কোথায় ? তাঁকে যে বড্ড দরকার!

অবশেষে বলবন্তর কাছে খবর পাওয়া গেল। সে আর নির্মল একসঙ্গে বেরিয়েছে। গেছে কেঠোপুলের দিকে।

২৩

কেঠোপুলও নীলকরদের কীর্তি। খাল ছিল, বেশ বুঝতে পারা যায়—বর্ষাকালে জল-নির্গমের সঙ্কীর্ণ নালা হয়ে দাঁড়ায় এখনো। এদিকে-ওদিকে কাঠের সিঁড়ি—মাঝখানটা ধনুকের মতো। খাল মরে যাওয়ায় এখন লোকে নিচে দিয়ে যাতায়াত করে—সিঁড়ি ভেঙে পুলের উপরে উঠবার প্রয়োজন হয় না।

জায়গাটা রায়বাড়ির অনতিদূরে। অশোক সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই এসে বসে। বিশাল এক অশ্বত্থগাছ পাশে। বিলের অনেক দূর অবধি দেখা যায় পুলের উপর থেকে। চুপচাপ শান্ত মনে বসে সময় কাটাবার অতি উপাদেয় স্থান।

অশোক আর নির্মল পাশাপাশি বসল।

নির্মল বলে, হাসি দেবীর সভায় গেলেন না?

অশোক বলে, চিরকাল শহরে কাটিয়েছেন, বড় বড় জায়গায় বিদ্যে শিখেছেন—উনি যা বলবেন, না শুনেও বলে দিতে পারি। আপনার কথা বেশ নতুন লাগে।

কিন্তু নতুন নয় একটুও। আর কথা আমারও নয়।

অশোক বলে, আমি কিন্তু নতুন শুনলাম। কিংবা শুনেছি হয়তো—মনে দাগ কাটল এই প্রথম। কিছু আলোচনার আছে, নিরিবিলি তাই আপনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলাম।

নির্মল সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

আলোচনা আমার সঙ্গে? কি যে বলেন! তোতাপাখি হয়ে অন্যের কথা আউড়ে যাই—তাই বলে কি আপনাদের মতো মানুষের পাশে বসবার যোগ্যতা আছে? আমি যাই—

আচ্ছা, আচ্ছা—কাজ নেই আলোচনায়। বসুন না। অন্তত ভাল করে একটু আলাপ-পরিচয় করে যাই কলকাতা ফিরবার আগে।

নির্মল বলে, কবে যাচ্ছেন কলকাতা ?

এখন একটানা নাকি খারাপ দিন চলেছে। পরের সোমবারে রওনা হব ভাবছি। আগেই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কাকিমা ধরে বসলেন ইস্কুলের জন্য কিছু খাটাখাটনি করতে—

খাটনি শেষ হয়ে গেল, তাই মনে করছেন ? সবে তো শুরু ! প্রথম মহড়ায় এখন অনেককে পাওয়া যাবে। উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে তখনই মুশকিল।

অশোক বলে, একরকম যা-ই হোক চালু হয়ে গেল তো—ব্যস ! এখন হাসি দেবী দেখুন গে। আমার আর দেরি করা চলবে না। একটা জরুরি চিঠির প্রত্যাশায় আছি কিছুদিন থেকে। আসছে না। নিজে গিয়ে খোঁজ নেবো।

তারপর বলে, কলকাতায় গেলে যাবেন আমাদের বাড়ি। নিশ্চয় যাবেন। বড় খুশি হব।

নির্মল বলে, গেঁয়ো-পাঠশালার কাজে শহরের মতো ছুটিছাটা নেই তো ! তা ছাড়া পাড়াগেঁয়ে অভ্যাস আমাদের—শহর যেন জল-বিছুটি মারে !

দিনকতক দেখবেন না থেকে। থেকেছেন কখনো কলকাতায় ?

থেকেছি দু-দিন পাঁচ দিন। একটু হেসে বলে, একবার মাত্র ছিলাম বছর দেড়েক।

কোথায় ? কোন্ ঠিকানায় থাকতেন ?

হরিণবাড়ির জেলে। হেসে উঠে নির্মল বলে, কলকাতার স্মৃতি খুব মনোরম নয়। ভাবতে আতঙ্ক লাগে।

সভার ফেরত দু-পাঁচ জন নির্মলকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বলে, ও মাস্টের, ছেলেপিলে নাকি প্যাণ্টালুন পরায়ে ইস্কুলি দিতি হবে ?

যেন ভারি একটা কৌতুকের কথা—তেমনিভাবে হাসছে তারা। বলে, শহুরে বিবি—আমারগে পাড়াগাঁর গতিক তো জানেন না—

রসিকজনের অভাব নেই। একজন মন্তব্য করল, মা'য়েমানষের জুতো পায়—ভাত-ব্যান্নন পুড়ে যায়।

নির্মল তাড়া দিয়ে ওঠে, ছি-ছি—ও কি বলছ তুমি ?

লোকটা চুপ করল। আর একজন বলে, বোঝেন না যে ওঁয়ারা! পরনের একটা তেনা জুটোতি পারি নে—

রসিক লোকটা পুনশ্চ ফোড়ন দিয়ে ওঠে, পান্তাভাতে নুন জোটে না বেগুন-পোড়ায় বিষ্টুতেল!…তবে গিন্নিমা বলেছেন ভাল—মাইনে দিতি হবে না, বইপত্তোর ওঁয়ারা কিনে দেবেন—

নির্মল বলে, না—ভাল বলেন নি এটাও। আমাদের কুঠির ইস্কুলে অন্য নিয়ম। দয়ার দান নেবে না কেউ—সব ছেলে মাইনে দিয়ে পড়বে।

লোকটা রহস্য করে বলে, নবাব খাঞ্জে খাঁর নাতিপুতি তোমার ইস্কুলি পড়ে, তারা মবলব টাকা দেবেনে। অঢেল মাইনে তুমি পা'য়ে থাকো—তা জানি।

নির্মল বলে, নিশ্চয় দিয়ে থাকে। তোমরা খবর রাখ না। বাপ-খুড়োর ট্যাঁকের কড়ি গুণে দেয় না, নিজেরা গায়ে খেটে দিয়ে থাকে।

অশোক বলে, কোন রোগা অশক্ত ছেলে যদি যায় আপনার ইস্কুলে?

তার শক্তিতে যতটা কুলোয়, সেই পরিমাণ দেবে। মাইনে আমাদের ক্লাস হিসেবে নয়, শক্তি হিসেবে। আসল হল আন্তরিকতা। নিজের খরচ নিজে চালাচ্ছি—এই আত্মবিশ্বাস বড় করবে ছেলেদের। আর ঐ যে খাটছে ইস্কুলের জন্য—তাদেরই ইস্কুল, এই মমত্ববোধ জাগবে মনে। আজকের দিনে আমাদের সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সম্পর্কেও ঠিক এই মনোভাবের প্রয়োজন কিনা বলুন—

অমলা এল বলবন্তকে সঙ্গে নিয়ে।

রিসার্চ ল্যাবরেটরির কাজটা আপনি পেলেন না অশোক-দা—

অশোকের মুখ কালিবর্ণ হয়ে গেল।

ডক্টর দত্ত চিঠি দিয়েছেন নাকি?

আপনাকে নয়—নির্মল বাবুকে। টেলিগ্রামে এঁকে অনুরোধ করেছেন কাজটা নেবার জন্য।

নির্মল আশ্চর্য হয়ে বলে, আপনি কোথা শুনলেন? আমি তো কিছু জানি নে।

পিওন আপনাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ইংরেজি পড়তে পারবেন না তো—ভীম সর্দার আমায় তাই পড়ে মানে বুঝিয়ে দিতে বলল। বাসায় গিয়ে দেখতে পাবেন, ভীম—আর হয়তো হৃদয়-পিয়নও—বসে আছে।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে অশোক বলল, এত দিকে এমন কৃতিত্ব! অদ্ভুত মানুষ আপনি নির্মলবাবু।

নির্মল বলে, কে বলল? ঐ তো শুনলেন—ইংরেজি টেলিগ্রাম পড়বার বিদ্যেটুকু আছে, ভীমেরা তা-ও মনে করে না।

অদ্ভুত বলছি তো সেইজন্যে। এমন প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকেন! কতজনের কথা ভেবেছি—কিন্তু আমার প্রতিযোগীটি যে তাঁতিহাটে পণ্ডিত সেজে আছেন, কেমন করে জানব?

নির্মল বলে, বিশ্বাস করুন—আমি বিন্দুবিসর্গ জানি নে এ ব্যাপারের।

অশোক ইতস্তত করে বলে, কলকাতা ইউনিভার্সিটির তো নন—তা হলে জানতে পারতাম। কোন ইউনিভার্সিটির আপনি? ডক্টর দত্তর কাছে পড়াশুনো করেছেন?

কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি নি কখনো। ঐ যে একটা ঠিকানা বললাম—অমনি নানা ঠিকানায় সরকারের আতিথ্যভোগ করেছি। ডক্টর দত্তর পায়ের কাছে বসব, সে ভাগ্য কোথায়? অল্পস্বল্প আলোচনা হয়েছে চিঠিপত্রে। বার দুয়েক কাছে গিয়েছি—সে-ও থাকতে পেরেছি কতক্ষণ বা!

অশোক বলে, ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন, কিন্তু ডক্টর দত্তর বিচারে ভুল হয় না কখনো।

নির্মলও গাঢ়স্বরে বলে, ডক্টর দত্ত অভ্রান্ত। যতই তিনি স্নেহ করুন, স্নেহের খাতিরে অন্যায় করবার মানুষ তিনি নন। আমার আত্মশক্তিতে আস্থা বেড়ে গেল।

অশোক কি ভাবছিল। স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করছে সে যেন। সহসা বলে ওঠে, নির্মলকুমার হালদার—তার মানে এন. কে. হালদার···আচ্ছা, আমেরিকান জার্নাল অব বটানিতে 'ফুড' বলে যে প্রবন্ধটা বেরিয়েছিল—

নির্মল বলে, পড়েছেন? সর্বনাশ—ছাইভস্ম কোন কিছু এড়ায় না আপনার নজরে?

কারেন্ট সায়ান্স, ইণ্ডিয়ান ফার্মিং—এসব কাগজেও তো আপনার নাম দেখেছি—

একাধিক গৃহে চুরির পর প্রমাণ সহ হাতে-নাতে ধরা পড়লে চোরের যে অবস্থা হয়, তেমনি নির্বাক অসহায় ভাবে নির্মল চেয়ে রইল।

অশোক বলে, অভিনন্দন জানাচ্ছি নির্মলবাবু। ডক্টর দত্তর নির্ভুল বিচার—আপনিই যোগ্যতম। উঃ, জেলে জেলে ঘুরেছেন—ল্যাবরেটারি নেই, হাজার রকম অসুবিধা—তার মধ্যে এত তথ্য কি করে বের করলেন? বয়সে আপনি ছোটই হবেন—কিন্তু আপনার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হচ্ছে নির্মলবাবু।

অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে সে দু-হাত তুলল।

আচ্ছা, আসি—

অমলা ডাকে, সবে তো সন্ধ্যে। একটু বেড়িয়ে বেড়াইগে চলুন। নিকারি-বাঁধালে গিয়ে ডোঙা চড়া হবে—কথা ছিল না?

অনেকগুলো চিঠি লিখতে হবে অমলা। সোমবারে চলে যাব, সমস্ত নয় ছয় হয়ে আছে। আজকে বেড়ানো হবে না।

অশোক কত বড় আঘাত পেয়েছে, তার কণ্ঠস্বর ও চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকট হল। যে ক'টি লোক জমেছিল, তারাও চলে গেছে অনেকক্ষণ। প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যায় কেঠোপুলের উপর মুখোমুখি অমলা ও নির্মল। বলবন্ত সর্বনিম্ন সিঁড়িতে লাঠিটা নামিয়ে রেখে অশ্বত্থগাছের অন্তরালে গিয়ে বিড়ি ধরিয়েছে।

নির্মল বলে, মন খারাপ করে চলে গেলেন অশোকবাবু—

অমলা বলে, আপনারই জন্যে—

কাজটা শেষ পর্যন্ত অশোকবাবুরই হবে। তাঁকে বলে দেবেন। আমি চাকরি নেবো না।

চমক লাগে অমলার। কেন?

নিলে ভীম ওরা কি আস্ত রাখবে? যেতেই দেবেনা—হয়তো বা খুন করে ফেলবে।

অমলা বলে, প্রাণের কত ভয় আপনার! ছোট্ট বয়স থেকে ইংরেজের গুলিগোলা, ফাঁসির দড়ির ভিতর দিয়ে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছেন। বাজে কথা রেখে দিন—

খাঁটি কথা। চাকরি ধাতে সহ্য হবে না। এখানেও তো চাকরি পাচ্ছিলাম।

অমলা আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে কোথা?

আপনার মা দিচ্ছিলেন। নির্ঝঞ্ঝাটের চাকরি—ছেলেদের নিয়ে বেশ থাকা যেত।

অমলা আগুন হয়ে ওঠে।

মাকে অপমান করছেন—

সন্ত্রস্ত হয়ে নির্মল বলে, না—না। সে কি কথা!

মা পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলেন। আপনি মনে মনে হাসছিলেন তখন। আজকে ব্যঙ্গ করছেন সেই কথা আবার তুলে।

কিন্তু একা একটি প্রাণী—পঞ্চাশের বেশি আমার লাগে কিসে?

ওরা পাঁচ-সাত শ' দেবে অন্তত। তাই তো অশোক-দা বলছিলেন।

নির্মল বলে, পাঁচ শ' দিক আর সাত শ' দিক—আমার পক্ষে একেবারে বাহুল্য। কোন কাজে আসবে না, ব্যাঙ্কে পচবে। পাশ-বইয়ে একটা মোটা অঙ্কপাত দেখে কি চতুর্বর্গ লাভ হবে? ভেবে দেখুন সত্যি, আমার পক্ষে পঞ্চাশ আর পাঁচ শ'য় কি তফাৎ, যার জন্য অদ্দূরে অত হাঙ্গামার মধ্যে যাব?

অমলা বলে, যাবেন না—তবে তাঁতিহাটে পচে মরবেন ইস্কুল-মাস্টার হয়ে সকলের অকথা-কুকথা সহ্য করে? চাটুজ্জে মশায় হেন লোকও মুখ বাঁকিয়ে কথা বলেন।...নিতেই হবে কাজটা।

কৌতুক-স্নিগ্ধ কণ্ঠে নির্মল বলে, স্বাধীনভাবে রয়েছি, কারো কোন ধার ধারি নে—আমার সুখ দেখে সহ্য হচ্ছে না আপনার?

অমলা আকুল হয়ে বলে, সুখ বলছেন এই জীবনকে? আপনি মানুষ, না কি? গণ্ডারের চামড়া আপনার—কিছুই বেঁধে না?

সবাই শহরে পালালে গাঁয়ে যে আলো জ্বলবে না!

চুলোয় যাক গ্রাম। যারা অপদার্থ, তারাই গ্রামে পড়ে থাকে। আপনার কিছুতেই থাকা হবে না এমন ভাবে।

কিন্তু অশোকবাবুরই কাজটা পাওয়া উচিত। অনেক আশা করে ছিলেন। আর, যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই।

আপনার পথ আপনি দেখুন। নিজের গুণে মনোনীত হয়েছেন। অশোক-দা কে আপনার যে তাঁর খাতিরে ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন? এত শক্তির অপচয় করছেন গেঁয়ো-পাঠশালায়—শালগ্রাম-শিলায় বাটনা বাটছেন। কে বোঝে এখানে আপনার মর্যাদা? পাগল আপনি—কাণ্ডজ্ঞানহীন!

বলতে বলতে হঠাৎ বুঝি খেয়াল হল, কিসের জোরে কাকে সে বলছে এত কথা! লজ্জিত হয়ে সে চুপ করল।

নির্মল কেমন আচ্ছন্নভাবে তাকিয়ে আছে অমলার দিকে। গভীর কণ্ঠে সে বলল, ঠিক এমনি কথা আমার মা-বাবা বলতেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার জন সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এতকাল পরে আজকে আবার আপনার মুখে এই সব শুনলাম।

অমলা বিচলিত হয়ে উঠল। বলে, শুনবেন তা হলে তো আমার কথা?

নির্মল সহাস্যে ঘাড় নাড়ল।

সেদিন তাঁরা ফেরাতে পারেন নি। আপনিও পারবেন না। আমায় স্নেহ করলে শুধু কষ্টই পেয়ে যেতে হয়।

২৪

হরিতোষের চিঠিও এসে গেল। ডক্টর দত্ত বলেছেন, অশোকের চেয়ে বেশি কৃতী যখন পাওয়া যাচ্ছে, তার মনোনয়ন কি করে সম্ভব হয়? চিঠির আসল বক্তব্য কিন্তু অশোকের চাকরি নয়—রায়-এস্টেটের এই তাঁতিহাট মৌজার ব্যাপার। অবশেষে আশাতীত রকম দাঁও জুটেছে, অবিনাশ বর্ধন দেড় লক্ষ টাকায় কিনবে! হরিতোষ কলে-কৌশলে গছিয়ে দিচ্ছেন বললেই ঠিক হয়।

অবিনাশকে দেখেছেন ইন্দ্রাণী। পুরাণো লোহা কেনা-বেচা করত—তাঁদের ভাঙা স্টিমলঞ্চ কিনেছিল সে-ই। দেড় মন দু'মন লোহা নিজে কাঁধে বয়ে নিয়ে যেত। লড়াইয়ের বাজারে লোহা সোনার দামে বিক্রি করে সেই মানুষ এখন মহাধনী। লক্ষপতি বললে তাকে গালি দেওয়া হয়। টাকা হয়েছে—এবার মান-প্রতিপত্তির জন্য সে উঠে পড়ে লেগেছে। জমিদার নাম পেতে চায় তাঁতিহাট মৌজা কিনে। জমিদারির আসন্ন পরিণাম হরিতোষ-ইন্দ্রাণীরা জানেন ভাল করেই। তাসের ঘরের মতো অচিরে এসব ভেঙে পড়বে। কিন্তু অবিনাশ বোঝে না। আর দেড় লাখ টাকা এমন-কিছু নয়ও তার কাছে।

হরিতোষ অদ্ভুতকর্মা বলেই এই অসম্ভব দর উঠেছে। রক্ষা পেয়ে গেলেন ইন্দ্রাণী—সকল সমস্যার সহজ সমাধান হয়ে যাচ্ছে। নবকিশোরের আমলের দেনা স্থদে স্থদে হাজার ত্রিশের কাছাকাছি পৌঁছেছে। কলকাতায় যে বাড়িতে বসবাস করেন, ষাট হাজারে সেটা পাওয়া যাবে। সমস্ত চুকিয়ে হাতে অনেক নগদ রইল। অমলার বিয়ে—তাতেও খরচপত্রের দায় বেশি নয়।

অমলার বিয়ের প্রসঙ্গও আছে চিঠিতে। হরিতোষ এতদিন টালবাহানা করেছেন অশোকের পড়াশুনার ক্ষতি হবে এই আশঙ্কায়। পড়াশুনা শেষ হয়েছে, আর দেরি করবার হেতু নেই।

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরতে লিখেছেন। তাঁতিহাটে এস্টেটের কর্মচারী ও প্রজাপাটকের মধ্যে কথাবার্তা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। জানাজানি হয়ে গেলে ইজ্জত থাকবে না। নানা রকম বাধাও আসতে পারে। অবিনাশ যদি চায়, হরিতোষ তাকে সঙ্গে করে বরঞ্চ একবার তাঁতিহাট ঘুরিয়ে আনবেন। রেজেস্ট্রিও কলকাতায় হবে বেশি ফী দিয়ে। আরও অনেকে অবিনাশের কাছে নানা সম্পত্তির খোঁজখবর দিচ্ছে, স্থতরাং সত্বর হওয়া প্রয়োজন।

এমন চিঠির পরও কিন্তু ইন্দ্রাণী মনে স্ফূর্তি পাচ্ছেন না। অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া সম্পর্ক গভীর আলিঙ্গনে যেন জড়িয়ে ধরেছে তাঁকে; সমস্ত তাঁতি-হাট জীবন্ত হয়ে স্থখ-দুঃখের কথা কইছে। তাঁর স্বামী, স্বামীর পিতা ও পিতামহের এই গ্রাম। অন্নপ্রাশনের ঢোলের বাজনায় বাওড়ের জল তরঙ্গিত

হয়েছে, আবার একদিন হরিধ্বনি দিয়ে কুঠিঘাটার পাশে শ্মশানে সেই মানুষেরই দেহ-চিহ্ন রেখে এসেছে। কিশোরী বধূ হয়ে একদা ইন্দ্রাণী আলতা-পরা পা রেখে এই প্রাচীন বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়েছিলেন—ক'দিন পরে চিরকালের মতো পা ফেলে যাবেন, আর আসতে পারবেন না মাথা খুঁড়ে মরলেও। শুয়ে শুয়ে কোন দিন দেখতে পাবেন না বাঁশবনের ভিতর দিয়ে উঁকি-দেওয়া চাঁদ। অজানা অচেনা নূতন মানুষেরা এসে ঘর-গৃহস্থালী পাতবে।

আর এক মুশকিল হয়েছে—এই ইস্কুল। গ্রামে শান্তি-লাভের জন্য এসে ধীরে ধীরে বিপাকে জড়িয়ে পড়েছেন। অনেক দিন থেকেই হরিতোষ মৌজা বিক্রির চেষ্টা করছেন। জমিদারি-ব্যবস্থা তুলে দেবার জন্য দেশ জুড়ে যে পাঁয়তারা চলেছে—তাতেই ইন্দ্রাণীর আশঙ্কা হয়েছিল, ক্রেতা জুটবে না আদৌ। আশঙ্কা নয়—আশা বললেই ঠিক হয়। সেই আশাতেই ইস্কুলের কাজে নেমে পড়েছেন।

কিন্তু মনের ভিতর যেমনই হোক, এমন সুযোগ পাগল ছাড়া কেউ ছাড়তে পারে না। ভেবে ভেবে ইন্দ্রাণী ঠিক করেছেন, অবিনাশ বর্ধনকে বুঝিয়ে দেবেন—ইস্কুল-স্থাপনায় কিরকম নামযশ হয় সমাজের মধ্যে। বিদ্যা না থাকলেও বিদ্যোৎসাহী খ্যাতি রটে যায়। ইস্কুলের যাবতীয় খরচপত্র চালাবেন এই চুক্তিতে হাজার কয়েক টাকা না হয় কমই নেবেন অবিনাশের কাছ থেকে—ঐ টাকার সুদে ইস্কুল চলবে। হরিতোষকে লিখে আরও সপ্তাহ দুয়েকের সময় নিয়েছেন। ইস্কুলটা পুরোপুরি চালু করে দিয়ে তবে যাবেন। অশোককেও আটকেছেন—সেই আগের কথাই ফলে গেল, একসঙ্গে যাওয়া হবে সকলের। হাসিকে জোর তাগাদা দিচ্ছেন এদিককার ব্যবস্থা দ্রুত সমাধা করবার জন্য; কাজ শুরু করে দিয়ে তারপর দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় চলে যাবেন। সম্পর্ক চুকিয়ে চলে যাবেন, সেটা বলেন নি।

তাই ঠিক হল—ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি খোলা হচ্ছে। এর উপরের ছেলে মিলল না এ অঞ্চলে। ষষ্ঠ শ্রেণীতেই বা ক'জন—জন আষ্টেক হবে সর্বসাকুল্যে। এই

নিয়ে কাজ চলুক—ইস্কুল ভাল হলে দূরের ছেলেও ক্রমশ এসে জুটবে। এই ক'টা মাস পরে বার্ষিক পরীক্ষার পর এরাও আর এক ক্লাস উঁচুতে উঠছে তো!

পাঁচকড়ি-মোহিত-অম্বুজাক্ষের ব্যবস্থাক্রমে মলয় ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য মনোনীত হয়েছে। হবে তো বটেই—সে-ই সর্বোত্তম ছাত্র ইস্কুলের মধ্যে। ভরতারণ কিন্তু খুশি নন। বলেন, উঁহু—শামুক চেনে না পদ্মফুল! ছোটবাবুর কদর বোঝে নি। পাকা পরীক্ষাটা হয়ে যাক—ওঁর একার জন্যই আলাদা ক্লাস খুলতে হবে, এই এক কথা বলে দিলাম।

সেই পাকা পরীক্ষা অর্থাৎ লিখিত-পরীক্ষা আজ। ভবতারণ বলেন, নির্ঘাৎ ফার্স্ট হবেন উনি। কলকাতার ছেলে হেঁ-হেঁ—প্রসন্নর উজবুকগুলো পারবে ওঁর সঙ্গে?

সকলেরই ঐ ধারণা। কলকাতায় এ যাবৎ বাড়িতে পড়ত, ইস্কুলে যায় নি। বাড়ির মাস্টাররা শতমুখে প্রশংসা করতেন তাকে। মলয় নিজেও নিঃসংশয়। তবে একটা মুশকিল এই হয়েছে—প্রসন্ন পণ্ডিত মশায়ের কাছে যা-হোক কিছু চর্চা ছিল, নূতন ইস্কুলের বন্দোবস্ত ও হাসি দেবীর আগমন ব্যাপারে দিন পনেরো আজ আদৌ ও-পাট হয় নি। সে যাক গে—তার জন্য সে ডরায় না।

সকালবেলা বইয়ের ডেস্ক খুলল। তলার ছেঁদা দিয়ে নেংটি-ইঁদুর ঢুকে পড়েছিল—পাটিগণিত খুলতে গিয়ে দেখে, খানিকটা কেটে দিয়েছে কোণের দিক থেকে।

ক'জন বন্ধু এখানেও এসে জুটেছে।

এক বট ধূলো জমে গেছে! বই খুলিস নি এর মধ্যে?

মলয় দেমাক করে বলে, ভারি তো পরীক্ষা—তার জন্য বই খুলতে হবে কেন?

কিন্তু পাতা কয়েক উলটে মুখ শুকাল। ভয় হচ্ছে মনে মনে। এতদূর স্মৃতিভ্রংশ ক'টা দিনের অবহেলায়? অথৈ জলে পড়ে গেছে, এমনি মনে হচ্ছে। রূঢ়ভাবে বন্ধুদের সরিয়ে দিয়ে সে দরজায় খিল এঁটে দিল।

জ্যামিতির উপপাদ্য ভীত হয়ে যত আবৃত্তি করছে, ততই গুলিয়ে যাচ্ছে সমস্ত। কোনদিন যেন সে এসব পড়েনি—একেবারে আনকোরা অপঠিত

বস্তু। অবশেষে এক সময় ডুবে গেল পড়ার মধ্যে। অঙ্কের পর অঙ্ক কষে যাচ্ছে···

দশটা বাজলে তবে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে ইন্দ্রাণীর কাছে এসেছে—মাকে প্রণাম করে পরীক্ষায় গিয়ে বসবে। হাসি সেখানে। বললেন, তোমার ঐ অতটুকু ছেলের একাগ্রতা দেখলাম বটে! সেই কখন দরজা দিয়ে বসেছে, একটু নড়াচড়া দেখলে তারপর ? বড় হবার লক্ষণ। এ পরীক্ষার কথা ছেড়ে দাও—ইউনিভার্সিটিতে কম্পীট করবে দেখো, যদি উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়া যায়।

লজ্জিত মাথা নিচু করে মলয় চলে গেল।

ইন্দ্রাণী বললেন, বইয়ের পড়াই সব নয় ভাই। বরাবর সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছে—

হাসি বলেন, সে তো আরো কত জনে পেয়ে থাকে!

ইন্দ্রাণী বললেন, কম্পীট করুক আর না করুক—তুমি আশীর্বাদ করো ভাই, ছেলে যেন মানুষ হয়। সত্যনিষ্ঠা শিষ্টতা সাহস দয়া এই সমস্ত যদি না থাকে, মরে গিয়েও আমি শান্তি পাব না। একদিন এর মধ্যে অমূল্যকে মেরে বসল। অপরাধ যত বড়ই হোক—মলয়ের হাত উঠল কেমন করে, তাই ভাবি। সত্যি বলছি হাসি, লজ্জায় তখন আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

হঠাৎ থেমে গেলেন তিনি। অমূল্য এসে দাঁড়িয়েছে।

হাসি ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করেন, কি ?

ঠাকরুনকে একটা প্রণাম করে যাব।

ইন্দ্রাণী হাসিমুখে বললেন, শুনলে ? শোন কথা একবার।···'মা' না বললে কক্ষণো আমি প্রণাম নেবো না।

হাসি তাড়া দিয়ে উঠলেন, বলোই না। ইনি যখন চাইছেন—তুমি 'মা' বলে ডাকবে।

অমূল্য মৃদু মৃদু হাসে।

আচ্ছা বেয়াদব ছোকরা তো তুমি! তোমার মহাভাগ্য, ওঁকে 'মা' বলে ডাকা।

অমূল্য তবু কিছু বলে না। হাসি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, বলো—

অমূল্য বলে, লজ্জা করে। মা মারা গেছেন তিন মাস বয়সে। 'মা' তো বলিনি কখনো!

ঢপ করে প্রণাম করে অমূল্য ছুটে পালাল।

পরীক্ষা শুরু—কিন্তু কাছারি-দালান খা-খা করছে। জন ত্রিশেক এসেছে সবসুদ্ধ।

পাঁচকড়ি বললেন, ঘড়ি ধরে চলাচল এদিককার লোকের অভ্যাস নেই তো! আর একটু দেখা যাক—কি বলেন?

হাসির গম্ভীর মুখ—তিনি কিছু বললেন না।

প্রসন্ন বলেন, দেখে হবে কচু। এতকাল এই কর্ম করছি, গাঁয়ের মানুষ চিনি নে? নিতান্ত এস্টেটে যাদের টিকি-বাঁধা, নড়াচড়ার জো নেই—তারাই ছেলে পাঠিয়েছে।

হাসি বললেন, সেদিন তো অনেকে এসেছিল।

প্রসন্ন বলেন, হুজুগে এসেছিল ম্যাডাম। আপনার শুভাগমনে সন্দেশ খাওয়ার ব্যাপার ছিল, আসবে না কেন? ছেলে এসেছিল, ছেলের বাপ-দাদারা এসেছিল, ভিতরে মা-মাসিরা এসেছিলেন। এক এক দল একুনে পাঁচ-সাত পাতড়া সাবাড় করে সরে পড়ল।

বারান্দার এক অংশ তক্তায় ঘিরে হাসির নিজস্ব অফিস হয়েছে, হাসি ঢুকে পড়লেন সেখানে।

প্রসন্ন বলতে লাগলেন, আজকে তো সন্দেশ নয়—সঙিন ব্যাপার। পরীক্ষা। আসবে কেন? যাই বলুন পাঁচকড়িবাবু, পয়লা মওকায় এই ধুন্দুমার লাগানো বুদ্ধির কাজ হয় নি। সইয়ে সইয়ে করতে হয়। ম্যাডাম ভুল করলেন।

পাঁচকড়ি রেগে বলেন, আপনারই তো কীর্তি মশায়। চালে-ডালে মিশিয়ে জগা-খিচুড়ি বানিয়ে রেখেছেন, পরীক্ষার কুলোয় ঝেড়ে বেছে না নিলে ইস্কুল শুরু করা যায় কি করে?

হাসি বেরিয়ে এসে পাঁচকড়ির হাতে প্রশ্নপত্র দিলেন। গটমট করে নেমে চললেন তিনি ইন্দ্রাণীর কাছে।

অপমানের ব্যাপার। শুনে ইন্দ্রাণী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। হাসিকে এনে আরও ভয়ানক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে গেছেন তিনি। অপমান তাঁর একার নয়—হাসিরও। কি রকম সব মানুষ এখানকার! তাদের জন্য এত করছেন, কিছুরই মর্যাদা বুঝল না। একটা আশঙ্কা হচ্ছে, নির্মল তলে তলে কোনরকম ঘোঁট পাকায় নি তো?

ভবতারণের খোঁজ করলেন। তিনি নেই—বেরিয়ে গেছেন কোন দিকে। কখন ফিরে আসবেন—অত বিলম্ব ইন্দ্রাণীর সহ্য হয় না।

চলো তো, দেখিগে—

কাছারি-দালানে ঢুকে ঘুরে দেখলেন একবার। দুঃখে লজ্জায় চোখে জল আসবার মতো। অনতিদূরে কর্মকার-পাড়া—ঘরের দুয়ারে বললে হয়।

হাসির হাত ধরে টানলেন, চলো। ঐ তো—ওরা পর্যন্ত পাঠায় নি। শুনে আসি, কি বলে—

বলবন্ত সঙ্গে জুটেছে। রাখাল কর্মকারের উঠানে গিয়ে বললেন, তোমার ছেলে ইস্কুলে যায় নি কেন রাখাল?

রাখাল বলে, আজ্ঞে মাঠান, গরু নিয়ে এখন মাঠে যাবেনে। ফিরে আ'সে হাপর টানতি বসপেনে। ইস্কুলি যাওয়া আমারগে পোষায়?

ছেলের দিকে তাকিয়ে হুমকি দেয়, হাঁ করে দাঁড়ালি কেন? যা যা—গরু বা'র করে আন, দিরিং করিস নে।

পাড়াময় ঘুরলেন তাঁরা। বলবন্ত পথে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, ওরে তিনে—

তিনকড়ি বলে, জর হয়েছে। উঠতি পারতিছি নে।

উঁকি দিয়ে দেখে বউকে চুপিচুপি বলে, কাঁথা চাপা দিয়ে দে শিগগির। আ'সে ভ্যানর-ভ্যানর করবেনে, ছেলে পাঠাতি কবেনে ওরগে ওখেনে—

বিরক্ত হাসি বললেন, ফিরে চলো। নতুন নতুন অজুহাত শুনে বেড়িয়ে কি হবে? পরীক্ষা নয়—প্রহসন হচ্ছে। কত উৎসাহ নিয়ে এসেছিলাম, উঃ—

বলবন্ত বলে, সা-পাড়াটা একটু দেখে যাবেন না?

হাসি বলেন, লাভ নেই। ইস্কুল চলতে পারে না এখানে। শিক্ষা সম্বন্ধে মাথাব্যথা নেই এখানকার লোকের। তোমার লম্বা লম্বা কথায় বিশ্বাস করে এলাম ইন্দ্রাণী, এসে সকল রকমে অপদস্থ হলাম। বন্ধুবান্ধব শুনলে আমায় ঠাট্টা করবে।

ভবতারণ ফিরছেন হন-হন করে। এঁদের দেখতে পেয়ে কাছে এলেন। বুঝলেন তিনি ব্যাপারটা।

ছেলে হবে কি করে বলুন? নির্মল, দেখে এলাম, আরও জাঁকিয়ে তুলেছে। তার ওখানে পঙ্গপাল। আগের চেয়েও বেশি।

ইন্দ্রাণী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, আমাদের দোষ হল কি? আমরা আনতে পারি নে কেন?

তা দোষই বলতে হবে! দোষ হল যে—পড়তে বলেন, পরীক্ষা করেন। ওখানে স্রেফ আড্ডা। ছুঁচোর কেত্তন—তাই যত ছুঁচো গিয়ে জোটে। দেখে এলাম, হৈ-হৈ করে লাঙল ঠেলছে সাহেবদীঘির খোলে, আর গান ধরেছে। আমায় দেখে আরো জোর দিল গানে। মুখ ফিরিয়ে চলে এলাম—পেছনে বক দেখাল কিনা, বলতে পারি নে।

ইন্দ্রাণী উত্তেজিত হয়ে বললেন, কার হুকুমে সাহেবদীঘিতে লাঙল নামায়?

খুঁটোর জোরে মেড়া লড়ে মা-জননী। ম্যানেজার—থুড়ি হরিতোষবাবু বলেছেন বোধ হয়।

এক ছটাকও জমি দেওয়া হবে না ইস্কুলের জন্য। আমি বলছি। আমাদেরই জমির উপরে থেকে আমার মুখ দেখাবার উপায় রাখল না?

হাসি বললেন, সেদিনকার ঐ যে—মিটিঙের মধ্যে সেই ব্যাপার···বোঝা যাচ্ছে, ওদেরই ষড়যন্ত্র। ওরাই কোন ছেলে দিয়ে লিখিয়েছিল। কিংবা হয়তো নিজেই ঐ নির্মল—

ভবতারণ বললেন, তা যা বলেছেন। ও লোক সব পারে। ধরুন, শাদা সাহেবকে তাক করে বোমা ছুড়েছিল—কতটুকু বয়স তখন! সে যে একটা কথার হেরফের করে লিখে রাখবে—এ আর বেশি কি!

হাসি বললেন, আমি চলে যাব ইন্দ্রাণী। মন ভেঙে গেছে। তোমার কথার উপর আস্থা করে এসে আমার সকল দিক যেতে বসেছে।

হাত-ঘড়ি দেখে তিনি চমকে উঠলেন। তাই তো, এতক্ষণ ঘোরাঘুরি চলছে! চললাম। গার্ড বদল করতে হবে গিয়ে, একটার সময় নতুন প্রশ্ন দিতে হবে।

হাসি এগিয়ে চললেন। ইন্দ্রাণী বোমার মতো ফেটে পড়লেন—

আপনারা পুরানো কর্মচারী, কিন্তু এস্টেটের উপর কোন দরদ নেই। ইস্কুল আজকে মান-অপমানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্মলের মতো সহায়-সম্বলহীন একটা লোক—কিছুতে তাকে জব্দ করা গেল না?

ভবতারণ ডাক দিলেন, বলবন্ত!

বলবন্ত বলে, হুকুম পেলেই হয়—

দু-জনে চোখাচোখি হল। ভবতারণ বলেন, দেখা যাক মা-লক্ষ্মী, কুঠির ইস্কুল কি করে টেকে!

ভবতারণের কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রাণী শিউরে উঠলেন। কি করতে চান?

অনেক রকম তো দেখলেন। কিছুতে কিছু হল না। সান্নিপাত ক্ষেত্রে সূচিকাভরণ প্রয়োগ করতে হবে।

২৫

প্রসন্ন ও পাঁচকড়ির গার্ড দেবার কথা। কিন্তু গায়ে ব্যথা প্রসন্নর, জর-জর ভাব হয়েছে নাকি। পাঁচকড়ি হাসলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলা বুড়ো মানুষের এ ধরনের ব্যাধি অস্বাভাবিক নয়। বললেন, আচ্ছা আচ্ছা—তাই সই। চেয়ারে বসে থাকুন আপনি। বসে বসে দেখুন। উঠতে হবে না।

চেয়ারে বসে পড়ে প্রসন্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। মাথা এলিয়ে পড়েছে টেবিলে পাঁচকড়ি হাসতে হাসতে বলেন দেখছেন তো—ও পণ্ডিত মশায়? কড়া নজর থাকে যেন, খবরদার! ধড়মড় করে প্রসন্ন খাড়া হয়ে বসেন। কিন্তু কতক্ষণ! দু-চোখ বুজে আসে অনতি পরেই।

কৌতুক লাগে পাঁচকড়ির। যাকগে। দরকার নেই অন্য লোকের, পাঁচকড়ি একাই এক শ'। তাঁর সঙ্গে চালাকি করে পার পেয়ে যাবে, তেমন ছেলে জন্মায় নি আজও।

অতুল হাই তুলছে এক কোণে। বাড়ির তাড়া খেয়ে তাকে এই ইস্কুলের পরীক্ষায় বসতে হয়েছে। কি করা যায়—হিজিবিজি কাটছে সে খাতার উপর। খানিকটা পরে দেখে মনটা প্রসন্ন হল। দিব্যি একখানা ছবি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানুষের মুখের আদল দেখা যায়। গোঁফ বসিয়ে দিল মুখের উপর। গোঁফ-সমন্বিত হয়ে পাঁচকড়ির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? হাতে বেত আঁকল। ব্যস, নিঃসন্দেহে এবার পাঁচকড়ি মাস্টার। ছবির নিচে লিখল নামটা।

পাশেই অমূল্য। খোঁচা মেরে শিল্পকর্মের দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। উপভোগ করছে অমূল্যও। প্রতিকৃতি আসলের সঙ্গে কতটা মিলছে—পরখ করবার জন্য আড়চোখে তাকায় সে পাঁচকড়ির দিকে।

তাকিয়ে স্তম্ভিত হল। ক্রূর দৃষ্টিতে পাঁচকড়ি লক্ষ্য করছেন সামনের বেঞ্চিতে বসা মলয়কে। মলয়ের দিকে চেয়ে অমূল্য চক্ষের পলকে বুঝে ফেলল অবস্থা। জ্যামিতি খুলে মলয় টুকে যাচ্ছে। কি আশ্চর্য, মলয় করছে এই কাজ!

ইন্দ্রাণীর কথাগুলো চকিতে মনে পড়ে যায়। এই একটু আগে যা সব তিনি বলছিলেন। সত্যনিষ্ঠা শিষ্টতা সাহস দয়া—সন্তানের জন্য এই সমস্ত তিনি বাসনা করেন। নয় তো মরে গিয়েও শান্তি পাবেন না।

ঝড় প্রত্যাসন্ন, ভাবনার আর সময় নেই। পাঁচকড়ি মুখ ফিরিয়ে উল্টা দিকে যাচ্ছেন। অপরাধী ধরবার এই এক কৌশল—বুঝতে দেবেন না, টোকাটুকি নজরে পড়েছে তাঁর। একেবারে হাতে-নাতে ধরবেন।

সুযোগ বুঝে অমূল্য ধাক্কা দিল মলয়কে। বই পড়ে গেল মাটিতে। পাঁচকড়ি দ্রুতবেগে এসে পড়লেন এই সময়। অমূল্য ইতিমধ্যে বইটা পা দিয়ে টেনে নিজের কাছে এনেছে। মলয় গোড়ায় ক্রুদ্ধ হয়েছিল, গতিক বুঝতে পেরে মুহূর্তে শান্ত ভালমানুষ হয়ে গেল।

পাঁচকড়ি বললেন, ওঠ্—উঠে দাঁড়া—

মলয় বলে, কেন স্যার ?

বই রয়েছে তোর কাছে—

তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন পাঁচকড়ি। এবার মলয়ের পালা। বলে, মিছামিছি আমার অপমান করলেন। ও সব আমি ভাবতেই পারি নে।

পাঁচকড়ি বললেন, তাই তো শুনেছিলাম—এ তল্লাটের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছেলে। কিন্তু চোখদুটোকে অবিশ্বাস করি কি করে? এ চোখ ভুল দেখে না। কোন্ ফাঁকে বই তুই চালান করে দিয়েছিস।

উত্তপ্ত স্বরে মলয় বলল, আন্দাজে যা-তা বলবেন না স্যার। মানা করে দিচ্ছি।

বলো বাবা, বলতে থাকো যতক্ষণ না আস্কারা করতে পারছি—

নাছোড়বান্দা পাঁচকড়িও।

এ-বেঞ্চির ও-বেঞ্চির সবাই তোরা উঠে দাঁড়া। সরে দাঁড়া—খানাতল্লাস করব এক একজন করে।

অমূল্যর পায়ের কাছে বই পাওয়া গেল। মলয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে পাঁচকড়ি বললেন, বই যে নেই? লম্বা লম্বা বচন, টনটনে অপমান-বোধ! যাকগে—মায়ের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি, কীর্তি দেখে আহ্লাদে তোকে মাথায় তুলে নাচান—

অমূল্য বলে, বই আমি এনেছি। ও দায়ী কিসে?

পাঁচকড়ি তাড়া দিয়ে ওঠেন। ঢাকাই সাক্ষি দিতে হবে না তোকে। তোর বাংলার পরীক্ষা—তুই কেন আনতে যাবি জ্যামিতির বই? বল্—জবাব দে—

যদি আর কারো দরকারে লাগে—

গোলমালে প্রসন্নর ঘুম ভেঙে গেছে। দায়িত্ব তাঁরও—উঠে চলে এসেছেন এদিকে। অমূল্যর কথায় হো-হো করে হেসে বললেন, ওঃ—জগদ্ধিতায়? বড্ড যে উপচিকীর্ষা দেখা যাচ্ছে!

মোহিত এলেন, অম্বুজাক্ষ এলেন।

ব্যাপার কি পাঁচকড়িবাবু?

অমূল্য বলে, বই আমি এনেছি। উনি মলয় বেচারার ঘাড়ে দোষ চাপাতে চান।
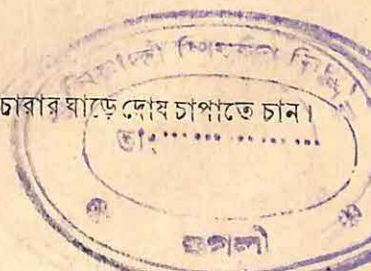
পাঁচকড়ি গর্জন করে ওঠেন।

চোপ রও! মিথ্যে কথা আমার সঙ্গে? স্পষ্ট দেখলাম নিজের চোখে—সত্যি কথা—

প্রসন্ন বলে উঠলেন, সত্যি কথা কোন পুরুষে বলেছিস তুই?

মোহিত বইটা উল্টাচ্ছিলেন। বললেন, এই যে—নামও লেখা রয়েছে, মলয়কিশোর রায়।

পাঁচকড়ি বললেন, তবে? ওরে বড়মানুষের ধামা-ধরা, এবারে কি কৈফিয়ৎটা দিবি?

গণ্ডগোলের মধ্যে হাসি এসে পড়লেন। রোদে তেতেপুড়ে মুখ-চোখ রাঙা হয়ে গেছে।

কি হয়েছে?

প্রসন্ন আগ বাড়িয়ে বলেন, বই নিয়ে টুকছিল ম্যাডাম। বড়-ইস্কুল বসতে না বসতে তার সকল রীতব্যাভার হতভাগারা রপ্ত করে নিয়েছে।

হাসির টেবিলের সামনে অমূল্যকে এনে দাঁড় করাল।

হাসি বললেন, সত্যি কথা বল্ এখনো। আমি সব চেয়ে চটে যাই মিথ্যে বললে।

বলেছি তো—

হাসির ধৈর্য রইল না। পাঁচকড়ির হাত থেকে বেতগাছা নিয়ে সপাসপ মারতে লাগলেন।

বল্—

মলয়ের জ্যামিতি চুরি করে নিয়ে এসেছিলাম ওকে জব্দ করব বলে। পা দিয়ে ওর দিকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছিলাম—সেই সময়টা মাস্টার মশায় ধরে ফেললেন।

হাসি প্রশ্ন করেন, কেন?

আমায় চড় মেরেছিল। গা রি-রি করে সেই থেকে। সকলের মধ্যে ওর হেনস্তা করে শোধ নেবো ভেবেছিলাম।

হাসি রায় দিলেন, বেরোও ইস্কুল থেকে। বেরিয়ে যাও। তোমার মতো ছেলের জায়গা এখানে নয়।

প্রসন্ন বলেন, যা—সং দিয়ে বেড়াগে আবার আসরে আসরে। যার যে কাজ!

২৬

পুকুর-ধারে বসে আছে অমূল্য। সেই পুকুর—ক্ষিধের চোটে একদিন অঞ্জলি ভরে ভরে জল খেয়েছিল যেখানে। হরিপদ-দা এসে বসেছিল পাশে। আজকেও হরিপদ রায়বাড়ি আছে, কিন্তু কত তফাৎ হয়ে গেছে! এখনো সে তক্কেতক্কে আছে আবার কোন দলে ঢুকবার। ঐ তার ধ্যান-জ্ঞান, দেখা হলে শুধুই ঐ কথা। অমূল্যর ভাল লাগে না। নূতন নেশায় সে মজে আছে। ঐ যে বলেছিল—নবীন এক যাত্রাপথের সন্ধান পেয়েছে।

কিন্তু আজকের ব্যাপারের পর কি করবে সে? নির্মলের কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কোন্ মুখে? দেবতার মতো নিষ্পাপ করুণাময় নির্মল—জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে তাকে? সে কি বিশ্বাস করবে? নিজেই তো জানে না, হঠাৎ কেন এমন কাণ্ড করে বসল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। অন্ধকারমগ্ন গাছপালার দিকে তাকিয়ে ভাবনাকুল মনে সে বসে ছিল চুপচাপ। বেতের আঘাত পিঠের উপর দড়ির মতো হয়ে ফুলে ফুলে উঠেছে। হাত বুলিয়ে দেখল অমূল্য। খুব কষ্ট হচ্ছে—তবে আঘাতের ব্যথায় তত নয়।

এসে বসল—চকিতে ভেবেছিল অনেক দিন আগেকার মতো হরিপদই বুঝি! উঁহু, হরিপদ নয়—মলয়।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে মলয় বলে, বড্ড মার খেয়েছিস তুই। আমারই জন্যে।

অমূল্য রাগ করে বলে, উপায় কি তা ছাড়া? তোর জন্যে ঠাকরুনের মাথা হেঁট হয়ে যেত, লজ্জায় মারা যেতেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। কম ঘেন্নার কথা! মানী লোকের কত বড় অপমান!

মলয় ঘাড় নিচু করে বসে রইল। তার ম্লান মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে অমূল্য বিচলিত হল।

খবরদার, খবরদার! আর এমন কাজ কোরো না কখনো। ভাল হোয়ো, মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো। ভাবো দিকি, কত বড় ঘরের ছেলে তুমি! আমার মতন তো নয়!

মলয় পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল। অমূল্য জ্বলে ওঠে। এতদূর উন্নতি? সিগারেট খাস?

মলয় থতমত খেয়ে বলে, আমি নই ভাই। তোর বড় কষ্ট হয়েছে—কিনে নিয়ে এলাম তোর জন্য।

অমূল্য বলে, ঘুষ? আমার জন্যই বা আনবি কেন তুই?

মলয় অবাক হয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলল, তুই তো খাস—

অমূল্য বলে, খাবই তো! আমার কে আছে, বকাবকি করবে বিড়ি-সিগারেট খেলে? মন্দ ছেলে আমি—খাব না তো কি করব? আমার যদি মাথার উপরে কেউ থাকত, আমি কি খেতে পারতাম এই সব?

হু-হু করে জল নেমে এল তার দু-চোখে। হাসির বেত খেয়ে কাঁদে নি এমন কান্না কাঁদতে দেখে নি তাকে কেউ কোনদিন। মলয় কি করবে ভেবে পায় না—চোখ মুছিয়ে দিল একবার। কিন্তু সে থামে না। কাঁদতে কাঁদতে সিগারেট কুচি-কুচি করে ছিঁড়তে লাগল।

মলয় বলে, ছিঁড়ে নষ্ট করিস কেন? না খাস, আর কাউকে তো দেওয়া যেত!

অমূল্য বলে, কেন অপমান করতে আসিস আমায়? তোরা যা খাস না, ঘেন্নায় ছুঁড়ে দিস আমার কাছে। আমি খাব না। আমার বয়সি ঐ যত সব—তারা খেয়ে থাকে? কেন আমি খেতে যাব?

কেঁদে কেঁদে অনেকক্ষণ পরে সে শান্ত হল।

মলয় চুপচাপ ছিল—সহসা সে অমূল্যর হাত জড়িয়ে ধরল।

শেষরক্ষে করতে হবে ভাই। কিচ্ছু লিখতে পারি নি। ডাহা ফেল হব।

অঙ্কের ভুলে প্রসন্ন পণ্ডিত মশায় যেমন ক্ষেপে যান, গোল্লাও দিয়ে দিতে পারেন।

প্রসন্ন পণ্ডিত মশায় দেখবেন বুঝি ?

অঙ্ক-জানা মাস্টার তাঁর চেয়ে কে আছে এদের মধ্যে ? বাজে খবর নয়—আমি নিজে গিয়ে সন্ধান নিয়ে এসেছি। তুই ভাই ব্যবস্থা কর্ একটা।

খাতা চুরি করতে বলছ ?

মুখ তুলে অমূল্য গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বলে, চোর ছ্যাঁচোড় বজ্জাত-মিথ্যেবাদী আমি সত্যিই। কিন্তু আর নয়। চলে যাও তুমি, আমার দ্বারা আর কিছু হবে না।

মলয় বলে, আমার জন্যে বলছি না। পড়াশুনো করি নি, নিন্দের ভাগী হব—সেটা আমার পাওনা। ভয় হচ্ছে মা'র কথা ভেবে। গাঁয়ে আমরা নতুন এসেছি, আমার জন্য সকলের মধ্যে মা কি রকম অপদস্থ হবেন—সেটা ভেবে দেখ। তাঁর শরীরের যে অবস্থা, রেজাল্ট দেখে হার্টফেলও করতে পারেন।

অমূল্য ভাবতে লাগল। তার যেখানে দুর্বলতা, মলয় আঘাত করেছে ঠিক সেইখানটায়।

কান মলছি ভাই, খুব মনোযোগী হব এবার থেকে। এবারের মতো বাঁচিয়ে দাও। কিছু না—এক মিনিটের কাজ মোটে। খাতাটা বের করে নিয়ে অন্য একটা খাতা ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে। বই-টই দেখে এই যে—এই লিখে নিয়ে এসেছি। এক শ' নম্বরের মধ্যে পুরোপুরি না হোক, নব্বুই পঁচানব্বই তো দিতেই হবে।

হাসি চলে যাবেন—ইন্দ্রাণীও আটকে রাখতে চান না তাঁকে। ইস্কুল নিয়ে এত উৎসাহ একটা দিনের ব্যাপারে স্তিমিত হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা যখন চায় না, তাঁর একার কি গরজ ? তার উপর অমূল্যর ঐ বৃত্তান্ত সারাদিন কত লোকে যে শুনিয়ে গেছে, তার অবধি নাই। পথের এক ছোঁড়াকে আশ্রয় দিয়ে বিষম ভুল করেছেন—পাকে-প্রকারে সবাই সেই কথা বলে গেল।

সন্ধ্যার পর নিরিবিলি হাসিও আবার ঐ প্রসঙ্গ তুললেন। শুনেছ?

ক্ষিপ্তের মতো ইন্দ্রাণী বললেন, দু-শ' বার শুনেছি—পাঁচ শ' রকম ডালপালা জুড়ে শুনিয়ে গেছে। ওর হাড় আর মাংস আলাদা করব দেখা পেলে।

হাসি বলতে লাগলেন, শয়তানিটা বোঝ। মলয় কবে মেরেছিল—ছেলেয় ছেলেয় এমন তো হয়েই থাকে—তার শোধ নিচ্ছিল দশের মধ্যে তোমাদের সুদ্ধ খাটো করে। পাঁচকড়িবাবু তো মলয়কেই সন্দেহ করেছিলেন। আসল ঘটনার আস্কারা না হলে এই নিয়ে লোকে কত কি বলত, মলয় বেচারি বিনা দোষে মাথা তুলতে পারত না কারো কাছে।

ইন্দ্রাণী ভালমন্দ কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন।

হাসি বলেন, কালসাপ ঘরে পুষে রেখো না—বাড়ি থেকে সরাও। তোমার মলয়ও কিন্তু গোল্লায় যাবে কুসঙ্গে পড়ে। হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো!

ভবতারণ সবেগে প্রতিবাদ করেন, উঁহু, তা ভাববেন না। ছোটবাবু আমাদের দেখতে ছোট হলে কি হয়—দেখতে বটে বিড়াল-ছানা, হাঁকডাকেতে প্রাণ বাঁচে না! নোংরা কাজে ওঁর বড় ঘেন্না। সেই যে মেরেছিলেন—তারও মূলে হচ্ছে অমূল্যর চুরি করে তামাক খাওয়া।

ইন্দ্রাণী অধীরকণ্ঠে বলেন, কোথায় গেল বলুন তো সে হতভাগা? এত রাত্রেও দেখা নেই!

ভবতারণ বলেন, আর কোথায়! এখন বড় মুরুব্বি হল গিয়ে নির্মল—সেইখানে আড্ডা জমিয়ে আছে।

ইন্দ্রাণী গুম হয়ে বললেন, হুঁ!···হাসি যাচ্ছে, আমরাও চলে যাব ঐ সঙ্গে। পোড়া গ্রামে আর আসছি নে। নির্মল একেশ্বর হয়ে থাকুক চাটুজ্জে মশায়। ওর ইস্কুলই চলুক। চেয়ার-বেঞ্চি যা গড়া হয়েছে, দিয়ে দেবেন ওর ইস্কুলে।

গলা ধরে এল। আঁচলের প্রান্তে তিনি মুখ ঢাকলেন।

২৭

নির্মলের কাছে নয়—প্রসন্ন পণ্ডিতের পাঁচিলের উপর অমূল্য চুপচাপ বসে।

চারিদিক নিঃসাড় হয়ে গেল, মানুষের সাড়শব্দ নেই—তখন ভিতরে লাফিয়ে পড়ল।

অতি-সাবধানে সে কপাট নাড়ে। আশ্চর্য—খিল দেওয়া নেই তো! এত সহজে ঢুকতে পারবে, সে স্বপ্নেও ভাবে নি।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কাঠের সিন্দুক পেল। পণ্ডিতের যথাসর্বস্ব এর মধ্যে। মলয় বলেছে, পরীক্ষার খাতাও সিন্দুকে পুরেছেন। প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে। এই তো এক মহাসমস্যা, যেন সাতরাজার ধন মাণিক এনে রেখেছেন—তালার এমনি আয়তন। এ তালা সহজে ভাঙা যাবে না। নিঃশব্দ পায়ে বেরিয়ে রান্নাঘর থেকে একগাছা বেড়ি নিয়ে এল। তার একটা অংশ তালার ফাঁকে ঢুকিয়ে সামান্য একটু চাপ দিয়েছে, কটকট বিষম আওয়াজ উঠল।

ও-প্রান্ত থেকে পণ্ডিতের কণ্ঠ—কে রে ওখানে?

অমূল্য কাঠের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল। ভয় করছে না মোটেই। বুড়ো মানুষ একলা একটি প্রাণী—পাড়া-প্রতিবেশীও নিকটে নেই। একখানা হাত চেপে ধরলে নড়তে পারবেন না তিনি—একবার তাড়া দিয়ে উঠলে থরথর কাঁপবেন, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুবে না।

পণ্ডিত কাতর কণ্ঠে বলেন, কে রে? কে আছিস বাবা, একটু জল গড়িয়ে দে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যায়, জল দিয়ে প্রাণ বাঁচা।

অমূল্য সরে পড়বে কিনা ভাবছে।

পণ্ডিত আবার বললেন, আলো জাল্, কে এসেছিস? সন্ধ্যে ধরানো হয় নি এখনো। দেশলাই এই শিয়রে। সর্বাঙ্গে ব্যথা—পাশ ফিরে শুতে পারছি নে।

আলো জালতে জালতে অমূল্য বলে, আপনার অসুখ হয়েছে শুনে দেখতে এলাম পণ্ডিত মশায়।

মলয় বলল? ইস্কুল থেকে ফিরেই এসেছিল একবার। তখন জর আসছে। সেই শুয়ে পড়লাম, আর উঠি নি। বড় ভাল ছেলে মলয়—ওর ভাল হবে।

প্রদীপের আলোয় অমূল্য শিউরে উঠল পণ্ডিতের চেহারা দেখে। মুখ ফুলে উঠেছে, চোখ লাল। হাঁসফাঁস করছেন তিনি জরের জালায়।

অমূল্য জল গড়িয়ে আনল। পণ্ডিত উঠতে পারলেন না, সন্তর্পণে অমূল্য জল ঢেলে দিল তাঁর মুখে। কষ বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে পড়ল।

প্রসন্ন বললেন, গা জ্বালা করছে। বাতাস কর্ একটু।

হাতপাখা নিয়ে অমূল্য বাতাস করে। উসখুস করছে। দরজার দিকে তাকায় —এ আবার কি মুশকিলে পড়ল!

প্রসন্ন বলেন, চারদিকে মা-শীতলার অনুগ্রহ। দেখ তো—ঠাহর করে দেখ—সেই রকম কিছু দেখতে পাস কিনা।

অমূল্য প্রদীপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। ম্লান আলোয় বসন্তর নিদর্শন কিছু চোখে পড়ে না।

পণ্ডিত বললেন, সকালবেলা এসে দেখে যাস বাবা একবার। বামাচরণ ছোঁড়া ঝাঁটপাট দিত—সে-ও আসে না। মাইনে-পত্তোর পাচ্ছে না—আসবেই বা কেন?

ইতিমধ্যে অমূল্য মতলব ঠিক করে ফেলেছে। পণ্ডিত ঘুমিয়ে পড়লে সেই সময় তালা খোলার উপায় করতে হবে। চলে গেলে আর হবে না। অসুখের মধ্যে নির্গোলে কাজ হাসিল করা যাবে।

বলল, আপনার যা অবস্থা—আমি থেকে যাই পণ্ডিত মশায়। রাত্তিরে আবার যদি জলতেষ্টা পেয়ে বসে, কিংবা কোন-কিছুর দরকার হয়—

প্রসন্ন বললেন, তা হলে তো বড্ড ভাল হয়। এখানে পড়ে থাকলে কেউ কিছু বলবে না তোকে?

অমূল্যর কণ্ঠস্বর হাহাকারের মতো শোনাল। বলে, কে আছে আমার পণ্ডিত মশায়? কেউ কিছু বলবে, তেমন ভাগ্য করে এসেছি কি আমি?

এসেই অমূল্য লক্ষ্য করেছে, সিন্দুকের চাবি প্রসন্নর পৈতেয় বাঁধা। রাত গভীর হল। অনেকক্ষণ প্রসন্নর সাড়া নেই। সুযোগ বুঝে অমূল্য আস্তে আস্তে উঠল।

হাত বাড়িয়ে পৈতে থেকে চাবি খুলে নেবার চেষ্টা করছে। তন্দ্রা ভেঙে পণ্ডিত বললেন, অমূল্য? কি রে, কি করছিস? ঘুমোস নি তুই এখনো?

অমূল্য বলে, ঘুম আসে না পণ্ডিত মশায়। কি আর করি—আপনার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি একটুখানি। উপস্থিত-বুদ্ধির জন্য মনে মনে নিজেকে তারিফ করে। ঐ কথারই জের ধরে মৃদু কোমলভাবে পণ্ডিতের অস্থিসার বুকের উপর সে হাত বুলাতে লাগল। প্রসন্ন চোখ বুঁজে রইলেন। তারপর গভীর কণ্ঠে বললেন, ভাল হবে তোর বাবা, আমি আশীর্বাদ করছি।

কিছুক্ষণ কাটল। পণ্ডিত আবার বলেন, আলোটা জাল্ দিকি আর একবার। গা-হাত-পা বড্ড জালা করছে।

অমূল্য আবার প্রদীপ জ্বালল। আলোর সামনে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বললেন, মায়ের অনুগ্রহ হয়েছে—কোন সন্দেহ নেই।

অমূল্যর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন। অমূল্য বিচলিত হল।

শুতে যা তুই বাবা। বরঞ্চ চলে যা তুই। রোগটা ছোঁয়াচে।

বলতে বলতে বুড়োর কোটরগত চোখদুটো জলে ভরে গেল। বললেন, এমন করে আমার বুকে হাত বুলিয়ে কেউ কোনদিন দেয় নি বাবা।

অমূল্য কথা বলল না। হাতও তার চলছে না আর প্রসন্নর বুকের উপর। চুপচাপ বসে আছে।

পণ্ডিত ঘুমিয়ে পড়লেন। আলো নিভিয়ে ছায়ান্ধকারে অমূল্য বসে আছে তেমনি। নড়াচড়ার শক্তি যেন তার লোপ পেয়েছে।

পরদিন প্রহরখানেক বেলায় প্রসন্নর হুঁস হল। সর্বাঙ্গে গুটি বেরিয়েছে। চেহারা ভয়াবহ। অমূল্য কি করবে ভেবে পায় না।

চিঁ-চিঁ গলায় প্রসন্ন বললেন, একটু যদি বার্লি ফুটিয়ে আনতে পারিস কোনখান থেকে। কাল সকালবেলা চাট্টি ভাতে-ভাত খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম, সেই থেকে পেটে আর কিছু পড়ে নি। ক্ষিধেয় ভিরমি লাগছে।

কোথায় কাকে এখন খোশামোদ করতে যাবে—অমূল্য উনুন ধরিয়ে অপটু হস্তে অনেক কষ্টে বার্লি রেঁধে নিয়ে এল। শোঁ-শোঁ করে চুমুক দিয়ে প্রসন্ন খেয়ে ফেললেন সমস্তটা। খাওয়ার পর একটু সুস্থ হলেন।

ভোগান্তি আছে বুঝতে পারছি—দু-দশ দিনে সেরে উঠবার ব্যাধি এ নয়। নতুন মাস্টারনী কি বিষ-নজরে দেখেছে—চাকরি তো অর্ধেক খেয়ে বসে আছে। রোগে যত না হোক—ওর আতঙ্কেই সোয়াস্তি পাচ্ছি নে।

থেমে একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে বলতে লাগলেন, শরীর খারাপ বলে খাতা নিতে চাচ্ছিলাম না। তার উত্তরে কি বলল জানিস? বয়স হয়েছে—খারাপ শরীর নিয়ে চাকরিই বা করেন কেন? যেন ওঁর চাকরি করি আমি! চাকরি করব না—আমার কি ছেলেপুলে নাতিপুতি আছে যে বসে বসে খাওয়াবে?

অমূল্য আজ বড় একাত্মতা অনুভব করছে পণ্ডিতের সঙ্গে। একই দশা দু-জনের। সংসারে তাদের কেউ নেই। অমূল্যর তবু বয়সটা আছে, টনটনে উপোস দিয়ে একবেলা পড়ে থাকলেও কিছু হয় না—পণ্ডিত তারও চেয়ে নিঃসহায়।

প্রসন্ন বলছিলেন, খাতাগুলোর কি করি—সেই এক ভাবনা। নিতে চাই নি, জোর করে গছিয়েছে। এর উপর ফিরিয়ে দিতে গেলে হাতে মাথা কেটে ফেলবে তক্ষুনি—

একটু ভেবে বললেন, তুই বাবা নির্মলকে দিয়ে আসতে পারিস? ঐ একটা ছেলের কথা মনে পড়ছে কেবল। ভাল ছেলে, বড় দরদি মন। কি দরের মানুষ! চাকরি নিয়ে সাধাসাধি করে তার আসে—বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে পারবে সে কথা? তার ইস্কুলে আমায় ডেকেছিল, সেরে উঠি তো সেখানেই যাব।

পৈতে থেকে সিন্দুকের চাবি খুলে অমূল্যর হাতে দিলেন।

নির্মলকে বুঝিয়ে বলবি আমার অবস্থা। সে যেন চট করে দেখে দেয় খাতা ক'খানা। তা সে দেবে। ভাল হোক তার, ঈশ্বর ভাল করুন।

চাবি হাতের মুঠোয় নিয়ে অমূল্য দাঁড়িয়ে আছে। তারপর বলে, আমার কাছে দিয়ে দিচ্ছেন পরীক্ষার খাতা?

কার কাছে দেবো বল্? তুই ছাড়া কে আমার আপন আছে? এই রকম রোগ জেনেও সারা রাত জেগে আমার বুকে হাত বুলোলি! বার্লি রেঁধে খাইয়ে প্রাণ বাঁচালি। আমার নিজের ছেলে হলেও এতটা করত না।

অমূল্য চলেছে, হাতে খাতার বাণ্ডিল। ঘুরপথে চলেছে—কারও যাতে নজরে না পড়ে। তবু তাই ঘটল। বাঁশতলায় মলয়।

হাসিমুখে মলয় বলে, বাণ্ডিলসুদ্ধ বের করে এনেছ? বাহাদুর ছেলে! আরও মক্কেল জুটেছে বুঝি? অঙ্ক তো সব ছেলে খারাপ করেছে। আমার খাতাটা বদলানো হয়ে গেছে?

অমূল্য মুখে কিছু বলে না, ঘাড় নাড়ল শুধু।

তবে? খোল বাণ্ডিল—দেখি। যাচ্ছ কোথা ওদিকে? সবসুদ্ধ নিয়ে এলে—আবার ঠিক মতো রেখে আসতে পারবে তো?···নিয়ে যাচ্ছ কোথা? গাঙের ধারে? কেন, এদিকটাও তো বেশ ফাঁকা।

বাণ্ডিল দু-হাতে বুকের উপর চেপে অমূল্য দ্রুতবেগে চলেছে।

মলয় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, শুনবি নে ভাই? এত করলি, এত মার খেলি—শেষটায় সামাল দিবি নে?···মা'র কথা ভাবছি আমি কেবলই। পরীক্ষার ফল দেখলে তাঁর অবস্থা যে কি হবে—

অমূল্য থমকে দাঁড়াল। আবার ইন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ! তার অবাধ যাত্রাপথে ইন্দ্রাণী এসে দাঁড়াচ্ছেন। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপর দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে কুঠির ইস্কুলে গিয়ে উঠল।

নির্মল নেই। আর যারা ছিল, কারো সঙ্গে একটি কথা না বলে ছুতোর-ঘরে গেল। গিয়ে খিল এঁটে দিল। হাঁপাচ্ছে। কে যেন বাণ্ডিল কেড়ে নিতে আসছে তার হাত থেকে—এমনি ভাব। দরজা দিয়ে এখন একটুখানি সুস্থির হয়েছে। কেনারাম বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে ভাই?

অমূল্য বলে, মাথা ধরেছে। কেউ ডাকিস নে আমায়। ঘুমোব।

পৃথিবীর কাউকে সে বিশ্বাস করে না। পণ্ডিত মশায়ের গছিয়ে-দেওয়া খাতা নির্মলের হাতে না পৌছানো পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই।

সারাদিন এমনি কেটে গেল। অমূল্য বাইরে এল না, খেলও না কিছু। সন্ধ্যার পর নির্মলের সাড়া পেয়ে তখন দরজা খুলল। চোখ রাঙা, বড় কান্না কেঁদেছে সে। এতদিনের জীবনের কথা ভেবে ভেবে কেঁদেছে। মাথা খুঁড়ে

মরছে ভাল হবার জন্য—কিন্তু পাঁকের মধ্যে পড়ছে কেবলই, সামলাতে পারছে না—সেইজন্য কেঁদেছে।

নির্মল-দা, এই খাতার বাণ্ডিল—

নির্মল বলে, জানি। পণ্ডিত মশায়ের বাড়ি থেকেই আসছি। তাঁকে এখানে নিয়ে এসে আমরা দেখাশুনা করব, সেই ব্যবস্থা করে এলাম।

কেনারাম ও নকুলকে বলল, বাঁশের চালি তৈরি করে নে। সেই চালির উপর তুলে খুব সাবধানে নিয়ে আসবি। ঝাঁকি না লাগে। ছ-জনে তোরা চলে যা। আমি বলে এসেছি। ও-জায়গায় থাকলে বেঘোরে মারা পড়বেন।

অমূল্যর দিকে ভাল করে নজর করে নির্মল স্তম্ভিত হল।

একি চেহারা হয়েছে? খাস নি কিছু?

বাড়ি গিয়ে খাব। খাতাগুলো তুমি দেখে নাও—

নির্মল বলে, এ্যাদ্দিন আমার সঙ্গে রইলি—তোর কাছ থেকে দেখেশুনে বুঝে নিতে হবে নাকি? নাঃ—নির্মল-দাকে একেবারে অপদার্থ ভাবিস তোরা!

অমূল্য বলে, শোন নি আমার কীর্তি?

একটা তো শুনে এলাম পণ্ডিত মশায়ের কাছ থেকে। রাত জেগে সেবা করবার কথা, পথ্য রেঁধে খাওয়াবার কথা—

অমূল্য আকুল হয়ে বলে, কানে তুলে দিয়ে থাক নাকি নির্মল-দা? কালকে পরীক্ষার মধ্যে—

তা-ও শুনলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না, তাই মলয়ের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। সে সব বলেছে, সমস্ত ভাল করে শুনে এসেছি।

হু-হু করে অমূল্যর দু-চোখে জল নেমে এল।

আমার কিছু হল না নির্মল-দা। যা-কিছু শেখালে সব বিফল। মিথ্যে কথা বলেছি, ঠকিয়েছি মাস্টার-মশায়দের—

নির্মল অমূল্যকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

আমার পাঠশালা থেকে বিদ্যাসাগর উদয় হবেন, বলেছিলাম—তুই হলি সে-ই—আমার মিথ্যেবাদী বিদ্যাসাগর। তোর নির্মল-দার বুক গৌরবে আজ ফুলে উঠেছে।

২৮

ইন্দ্রাণীরাও থাকবেন না—সকলে একসঙ্গে চলে যাবেন। অশোকের যাওয়া আরও ক'দিন পিছিয়ে গেল এই জন্য।

অমলার কাছে অশোক দেমাক করে, যা বলেছিলাম—তোমাদের সবসুদ্ধ উদ্ধার করে নিয়ে তবে নড়ব এখান থেকে। তাই হল কিনা দেখ!

ইন্দ্রাণী সকল দিক শান্ত হয়ে বিবেচনা করে দেখছেন। ভালই হল—এত ভাল কল্পনাও করতে পারেন নি কেউ আগে। নবকিশোরের শেষকালে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। কাঁধের উপর ভারি দেনা, শহরে মাথা গুঁজবার এক কাঠা জায়গা করতে পারলেন না অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁতিহাটের সম্পত্তিও এক বোঝা বিশেষ—কে দেখাশোনা করবে তার কোন ঠিক নেই। সমস্ত সুরাহা হয়ে গেল হরিতোষের চেষ্টায়। হরিতোষের ঋণ ইহকালে শোধ হবে না।

ইস্কুলের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে বিষম ভুল করেছিলেন তিনি। হাসি টিকে থাকলে কাঁধের উপর দায়িত্ব চেপে থাকত। অপমান হোক—যা-ই হোক—মোটের উপর এ হল ভাল। বাইরে অবশ্য প্রকাশ নেই—কিন্তু আর তো আসছেন না তাঁতিহাটে, কোন সম্পর্কই থাকবে না আর। লোকে কি বলাবলি করল, এ সমস্ত কানে পৌছবে না কোন দিন। অপমানের জ্বালা দু-দিন বাদে জুড়িয়ে যাবে—বেমালুম ভুলে যাবেন যে, কলকাতা থেকে দূরে—অনেক দূরে দুর্গম এক গ্রাম আছে, তার নাম তাঁতিহাট। সেখানে ক'দিন গিয়ে মানুষজন মাতিয়ে এসেছিলেন।

শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়েছে সকাল থেকে, দুর্বলতা লাগছে। দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে আসছে যেন। সমস্তটা দিন প্রায় শুয়ে শুয়েই কাটালেন।

সন্ধ্যার পর আলো নিভিয়ে দিয়ে জানলায় চুপচাপ বসে ছিলেন একা। মানুষের সঙ্গ ভাল লাগছে না। এমনি সময় গাছতলায় ছায়ামূর্তি দেখে চমকে

উঠলেন। অমূল্য নিঃশব্দে রোয়াকের উপর উঠল। সেই যে পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে বেরিয়েছিল—পুরো দেড়টা দিন পথে পথে কাটিয়ে ফিরে এল।

ইন্দ্রাণী টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। মুখে যেন অগ্নিশিখা।

চোর-ছ্যাচোড়—বেরো, বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে! সিঁদ কেটেছিলি—কাউকে তা বলি নি। তামাক খেয়ে পুড়িয়ে মারছিলি বলবন্তকে—তা-ও মাপ করেছি। শেষে মলয়ের সর্বনাশ করবার জন্য লেগেছিস? ইস্কুল ভদ্রসমাজ এসব তোর জন্য নয়। চলে যা যে নরককুণ্ড থেকে এসেছিলি।

চেঁচামেচিতে অনেকে এসে পড়ল। ইন্দ্রাণী যেন উন্মাদ হয়েছেন। পায়ের স্লিপার ছুঁড়ে মারলেন। সামলাতে পারলেন না—সেই ঝোঁকে মাটিতে পড়ে গেলেন কাঁপতে কাঁপতে।

অমলা তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে এল। শুইয়ে দিল বিছানায়। চেতনা-হীনের মতো ইন্দ্রাণী পড়ে রইলেন। চোখ বুজে আছেন।

অনেকক্ষণ পরে গভীর নিশ্বাস ফেললেন একটা। মেয়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বিদায় হয়েছে উড়ো-আপদ?

হ্যাঁ মা, পুঁটলি বগলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ভবতারণ রোয়াকের দিক থেকে বলে ওঠেন, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। কাঁধের শনি এত সহজে নামে না। নির্মলের আড্ডায় আছে—ঘুরে ফিরে তাক বুঝে আবার কোটে এসে উঠবে। হুঁ-হুঁ—এমন জুত আর পাবে কোথায়?

ইন্দ্রাণী ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তাই হোক—ওরাই জমিয়ে বসে থাকুক তাঁতি-হাটে! আপদ-বালাই আমরা বিদায় হয়ে যাচ্ছি। হাসি যাচ্ছে, অশোক যাচ্ছে—সকলে আমরা একসঙ্গে চলে যাচ্ছি। আপনি চাটুজ্জে মশায় কালকেই বড় দেখে একটা পানসি ঠিক করে ফেলুন।

ভবতারণ প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে বলেন, তাই হয় কখনো? রাজ-রাজেশ্বরী মা-জননী—রাজ্যিপাট ছেড়ে আপনি যাবেন কোন্ দুঃখে? যেতে দিচ্ছে কে? যাদের যাবার তারাই যাবে—সবুর করুন একটু—সগোষ্ঠী কাঁদতে

কাঁদতে চলে যাবে। আপনি কেবল চোখ মেলে দেখে যাবেন অধমাধম সন্তানের ক্রিয়াকর্মগুলো—

বলতে বলতে দেখা গেল নির্মল আসছে। মলয়ের হাত ধরে দুটিতে ঘরে ঢুকল। ভবতারণ উঠানে নেমে হন-হন করে চললেন একদিকে। ইন্দ্রাণীও মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

নির্মল হাসতে হাসতে কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল। বলে, রাগ করে থাকতে দেবো না। যেদিকে মুখ ফেরাবেন সেই দিকে যাব।

ইন্দ্রাণী বললেন, জুতো মেরে অমূল্যকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

কথাটা নির্মল তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না।

আমাকেও তো একদিন তাড়িয়েছিলেন। শুনলাম কি? আবার এসেছি।

না—তোমাকেও বলছি, মানা করে দিও—আর যেন কোন দিন অমূল্য এ বাড়ি না ঢোকে।

কেন?

চোর, জোচ্চোর, শয়তান। মলয়ের পর্যন্ত পিছনে লেগেছে। মলয় অধঃপাতে যাচ্ছে ওর সংস্পর্শে পড়ে।

নির্মল বলে, মলয় সত্যিকার মানুষ হতে যাচ্ছে ওর দেখাদেখি।

ইন্দ্রাণী অবাক হয়ে তাকালেন।

জিজ্ঞাসা করে দেখুন। আমায় সমস্ত কথা খুলে বলেছে। মলয় অনুতপ্ত —আর কোন দিন কোন অন্যায় সে করবে না। আপনি ক্ষমা করুন। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও আপনার কাছে দরবার করতে এসেছি।

মলয় বলে, আমিই দোষ করেছি মা। আমার দোষ ঢাকতে গিয়েই—

আর সে বলতে পারে না। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে মায়ের পায়ের কাছে অন্য দিকে ফিরে বসে রইল।

নির্মল বলে, আপনার মনে আঘাত না লাগে, আপনার মাথা হেঁট না হয়, মলয়ের দোষ অমূল্য তাই ঘাড় পেতে নিল।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত শুনলেন ইন্দ্রাণী। শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। সহসা

দু-চোখে অশ্রু ফুটল। বললেন, কেন সে হতভাগা এমন করে আমার জন্য? আমার মাথা হেঁট হল, কি আমি মরে গেলাম—তার কি যায় আসে তাতে? কে আমি তার?

নির্মল বলে, স্নেহের কাঙাল—পৃথিবীতে আপন-জন কেউ তো নেই!

ইন্দ্রাণী বলতে লাগলেন, দু-দিন না খেয়ে রোগির সেবা করে ক্লান্ত আধ-মরা হয়ে এসে দাঁড়াল, জুতো মেরে তাড়ালাম। স্নেহের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলাম একেবারে! কত বড় আপনার জন আমি!

মুকুলের কথা মনে পড়ল সহসা। খেলার মাঠ থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে একদিন খুব বকেছিলেন তাকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। অভিমানী মুকুল মুখ গুঁজে পড়ে ছিল পড়ার ঘরে। দু-দিনের মধ্যে হাসে নি, খায় নি ভাল করে। সেই ম্লান মুখের ছবি বারংবার মনে ভেসে আসছে। ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠল।

আবার বললেন, অমন ডাহা মিথ্যেকথাগুলো অবাধে সে মাস্টার মশায়দের মুখের উপর বলে গেল—এ তুমি ভাল বলতে চাও নির্মল?

নির্মল বলে, সত্যনিষ্ঠা বড় জিনিস—তারও চেয়ে বড় হল হৃদয়। বেতের পর বেত পড়তে লাগল, পিঠ কেটে গিয়ে রক্ত বেরুল—অবাধে তবু সে মিথ্যা বলে গেল। অমূল্যর এত শক্তি আর এমন হৃদয়—

অভিভূত ইন্দ্রাণী উঠে বসলেন বিছানার উপর। বললেন, ইস্কুল গড়বার ইচ্ছে হয়েছিল নির্মল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই হয় না তো! বড় বড় ডিগ্রি থাকলেও হয় না—সে এই হাসিকে দিয়ে দেখলাম। ওরা বেত মেরে শুধু পিঠেই দাগ করে, মনের উপর দাগ বসাতে পারে না। রায়বাড়ি ইস্কুল হবে না। আমরা চলে যাচ্ছি, রেশারেশি করতে আসছি নে আর কখনো। মনের মতো করে সত্যিকার শিক্ষালয় তুমি গড়ে তোলো, অমূল্যর মতো এমনি সব দুর্ভাগারা যাতে মানুষ হতে পারে। সে ক্ষমতা তোমার আছে, তুমিই পারবে—

নির্মল হেসে বলে, আমায় সমর্থন করলেন একজন—এই শুধু আপনিই। যে শুনেছে, সে-ই মারমুখো হচ্ছে ডক্টর দত্তর টেলিগ্রাম পেয়েই চলে না

যাওয়ার জন্য। আপনাদের অমলা—অশোকবাবু অবধি। সবাই তাড়াতে চান গ্রাম থেকে।

ইন্দ্রাণী অপ্রতিভ হলেন একটু। বললেন, সত্যি, নিজের ভাবনায় নিজে আমি মশগুল—ওকথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বটেই তো—তুমি চলে যাচ্ছ। ভবিষ্যৎ কেন নষ্ট করবে গ্রামে পড়ে থেকে? লোকে থাকতে বলবেই বা কোন্ বিবেচনায়?

কেউ না বললেও নষ্ট যা করবার করে দিয়েছি। টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছি, আমি যাব না।

ইন্দ্রাণী স্তম্ভিত হলেন।

না ভেবে-চিন্তে হুট করে এত বড় একটা কাজ করে বসলে—

ভাবনা-চিন্তা আমার একার পক্ষে যেটুকু সম্ভব, তা করেছি বই কি! বেশি ভাবনার সময়ও ছিল না—শুভার্থী এত জুটে গেলেন যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। এখন আর কেউ হিতোপদেশ ছাড়তে যান না—অপদার্থ বোকা বলে গালিগালাজ করেন শুধু।

হেসে বলে, অর্থাৎ পুরাণো দিনে ফিরে এসেছি। গালিগালাজ শোনাই অভ্যাস হয়ে আছে এতটুকু বয়স থেকে। হঠাৎ এক টেলিগ্রাম করে ডক্টর দত্ত যা মুশকিলে ফেলেছিলেন!

ভাবো দিকি, কত বড় সম্ভাবনা ছিল ঐ কাজে! বৃহৎ দেশ উপকৃত হত—

তাঁর জন্য ঢের লোক আছে। কাজ করবেও তারা ভাল। কিন্তু তাঁতিহাটের ঐসব দুঃখী ছেলেপুলের মুখের দিকে তাকাবার ক'জন আছেন বলুন তো?

বলতে বলতে নির্মলের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। বলে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—খবরের কাগজে লিখছে বটে! স্বাধীনতা তাঁতিহাট অবধি পৌছয় নি। নতুন আশা-উদ্দীপনার পরিচয় দেখছেন কোথাও? ঐ দুর্লভ বস্তুর ভাগ আমার গ্রাম পাবে না—এটা কেমন করে সহ্য করি? ইস্কুল চালানো মানে স্বাধীনতা পৌঁছে দেবার চেষ্টা গ্রামের মানুষের মধ্যে। আমার সেই চিরকালের কাজ।

ইন্দ্রাণী স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে

দু-চোখে অশ্রু ফুটল। বললেন, কেন সে হতভাগা এমন করে আমার জন্য? আমার মাথা হেঁট হল, কি আমি মরে গেলাম—তার কি যায় আসে তাতে? কে আমি তার?

নির্মল বলে, স্নেহের কাঙাল—পৃথিবীতে আপন-জন কেউ তো নেই!

ইন্দ্রাণী বলতে লাগলেন, দু-দিন না খেয়ে রোগির সেবা করে ক্লান্ত আধ-মরা হয়ে এসে দাঁড়াল, জুতো মেরে তাড়ালাম। স্নেহের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলাম একেবারে! কত বড় আপনার জন আমি!

মুকুলের কথা মনে পড়ল সহসা। খেলার মাঠ থেকে ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে একদিন খুব বকেছিলেন তাকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন। অভিমানী মুকুল মুখ গুঁজে পড়ে ছিল পড়ার ঘরে। দু-দিনের মধ্যে হাসে নি, খায় নি ভাল করে। সেই ম্লান মুখের ছবি বারংবার মনে ভেসে আসছে। ইন্দ্রাণীর বুকের মধ্যে হু-হু করে উঠল।

আবার বললেন, অমন ডাহা মিথ্যেকথাগুলো অবাধে সে মাস্টার মশায়দের মুখের উপর বলে গেল—এ তুমি ভাল বলতে চাও নির্মল?

নির্মল বলে, সত্যনিষ্ঠা বড় জিনিস—তারও চেয়ে বড় হল হৃদয়। বেতের পর বেত পড়তে লাগল, পিঠ কেটে গিয়ে রক্ত বেরুল—অবাধে তবু সে মিথ্যা বলে গেল। অমূল্যর এত শক্তি আর এমন হৃদয়—

অভিভূত ইন্দ্রাণী উঠে বসলেন বিছানার উপর। বললেন, ইস্কুল গড়বার ইচ্ছে হয়েছিল নির্মল। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই হয় না তো! বড় বড় ডিগ্রি থাকলেও হয় না—সে এই হাসিকে দিয়ে দেখলাম। ওরা বেত মেরে শুধু পিঠেই দাগ করে, মনের উপর দাগ বসাতে পারে না। রায়বাড়ি ইস্কুল হবে না। আমরা চলে যাচ্ছি, রেশারেশি করতে আসছি নে আর কখনো। মনের মতো করে সত্যিকার শিক্ষালয় তুমি গড়ে তোলো, অমূল্যর মতো এমনি সব দুর্ভাগারা যাতে মানুষ হতে পারে। সে ক্ষমতা তোমার আছে, তুমিই পারবে—

নির্মল হেসে বলে, আমায় সমর্থন করলেন একজন—এই শুধু আপনিই। য শুনেছে, সে-ই মারমুখো হচ্ছে ডক্টর দত্তর টেলিগ্রাম পেয়েই চলে না

যাওয়ার জন্য। আপনাদের অমলা—অশোকবাবু অবধি। সবাই তাড়াতে চান গ্রাম থেকে।

ইন্দ্রাণী অপ্রতিভ হলেন একটু। বললেন, সত্যি, নিজের ভাবনায় নিজে আমি মশগুল—ওকথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বটেই তো—তুমি চলে যাচ্ছ। ভবিষ্যৎ কেন নষ্ট করবে গ্রামে পড়ে থেকে? লোকে থাকতে বলবেই বা কোন্ বিবেচনায়?

কেউ না বললেও নষ্ট যা করবার করে দিয়েছি। টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছি, আমি যাব না।

ইন্দ্রাণী স্তম্ভিত হলেন।

না ভেবে-চিন্তে হুট করে এত বড় একটা কাজ করে বসলে—

ভাবনা-চিন্তা আমার একার পক্ষে যেটুকু সম্ভব, তা করেছি বই কি! বেশি ভাবনার সময়ও ছিল না—শুভার্থী এত জুটে গেলেন যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম। এখন আর কেউ হিতোপদেশ ছাড়তে যান না—অপদার্থ বোকা বলে গালিগালাজ করেন শুধু।

হেসে বলে, অর্থাৎ পুরাণো দিনে ফিরে এসেছি। গালিগালাজ শোনাই অভ্যাস হয়ে আছে এতটুকু বয়স থেকে। হঠাৎ এক টেলিগ্রাম করে ডক্টর দত্ত যা মুশকিলে ফেলেছিলেন!

ভাবো দিকি, কত বড় সম্ভাবনা ছিল ঐ কাজে! বৃহৎ দেশ উপকৃত হত—তাঁর জন্য ঢের লোক আছে। কাজ করবেও তারা ভাল। কিন্তু তাঁতিহাটের ঐসব দুঃখী ছেলেপুলের মুখের দিকে তাকাবার ক'জন আছেন বলুন তো?

বলতে বলতে নির্মলের কণ্ঠস্বর গভীর হয়ে উঠল। বলে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—খবরের কাগজে লিখছে বটে! স্বাধীনতা তাঁতিহাট অবধি পৌঁছয় নি। নতুন আশা-উদ্দীপনার পরিচয় দেখছেন কোথাও? ঐ দুর্লভ বস্তুর ভাগ আমার গ্রাম পাবে না—এটা কেমন করে সহ্য করি? ইস্কুল চালানো মানে স্বাধীনতা পৌঁছে দেবার চেষ্টা গ্রামের মানুষের মধ্যে। আমার সেই চিরকালের কাজ।

ইন্দ্রাণী স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। তাকিয়ে তাকিয়ে

এই সর্বত্যাগী মানুষটির মনের তলা অবধি দেখে নিলেন যেন। বললেন, তোমার মায়ের গয়না নিয়েছ ইস্কুলের কাজের জন্য। রত্নগর্ভা ভাগ্যবতী তিনি। আমারও কতকগুলো গয়না পড়ে আছে। কিছু টাকাও পেয়ে যাচ্ছি শিগগির—বলে আবার সামলে নিলেন।

তোমার মায়ের ভাগ্য সকলের হবে কেন? না-না—টাকার লোভ আমি দেখাচ্ছি নে। কোন লোভে আটকানো যায় না তোমাদের—

নির্মল বলে, টাকা দেবেন বই কি! নিশ্চয় দেবেন। টাকা না পেলে চলবে কিসে?

হাসি-ভরা মুখে যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে ইন্দ্রাণী বললেন, মলয়ের ভারও নাও তুমি। তোমার কাছে ও থাকবে। আমার অমূল্যকে যেমন করেছ, ওকেও তেমনি মানুষ করে তোল—এই আমি তোমার হাতে ধরে বলছি।

সত্যি সত্যি নির্মলের হাত জড়িয়ে ধরলেন। এ তাঁর কি হল! শরীর ভাল নয়—মনের স্থৈর্যও একেবারে হারিয়ে ফেললেন যে!

শেষ রাত্রে মানুষের কোলাহলে ইন্দ্রাণীর ঘুম ভেঙে গেল।

আগুন, আগুন!

সন্ত্রস্ত হয়ে বাইরে এলেন তিনি। সকলেই বেরিয়েছে। দক্ষিণের আকাশ আলোয়-আলো হয়ে গেছে। লেলিহান শিখা দেখা যাচ্ছে এত দূর থেকেও।

হায়, হায়, হায়! কার সর্বনাশ হচ্ছে রে!

গ্রামের ঘুম ছুটে গেছে। ভয়ার্ত লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে রাস্তায়। হরিপদ আসছে—সে বেরিয়েছিল খবর নিতে।

কুঠির ইস্কুল পুড়ছে মা-ঠাকরুন। বলবন্তরা গেল কোথায়—বালতি-ঘড়া-ঘটির জোগাড় রাখুক। কিছু বলা যায় না—আগুন ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছোটে। গ্রামকে-গ্রাম সাফ হয়ে যায় ব্রহ্মার কোপে। সেবারে কি হল—পাঁচপোতায় বিপিন সা'র বাড়ি গান করতে গিয়েছি, লুচি ভাজছে গোয়ালের পাশে উনুন খুঁড়ে—

২৯

গেল, গেল—সব যে গেল !

ছেলেরা আছে। বুনোপাড়ার মেয়েপুরুষ প্রায় সবাই এসে পড়েছে। কালো কালো দেহগুলির উপর ক্ষণে ক্ষণে আগুনের আভা পড়ে প্রেতমূর্তির মতো দেখাচ্ছে।

আশ্চর্য শঙ্করীবালা ! এই রাত্রে একলা ছুটে এসেছেন। পরম কুলীন সিদ্ধান্ত-ঘরের মেয়ে বলে চিনবার জো নেই প্রলয়ক্ষণের ছুটাছুটির মধ্যে। বয়স হয়েছে—তা-ই বা বলবে কে ? যেন মত্ত হস্তীর বল তাঁর গায়ে। কাঁখে একটা আর হাতে আর একটা—এই নিয়ে দৌড়চ্ছেন সাহেবদীঘি ; এক সঙ্গে দু-কলসি করে জল আনছেন। এক জোড়া নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন তখনই আর এক জোড়া নিয়ে। হাড়োকে তাড়া দিয়ে উঠলেন, দাঁড়িয়ে কি করিস ? কলসি আর না থাকে, ছুটে যা আমাদের বাড়ি। উঠোনে রান্নাঘরে মেটে-কলসি পিতলের কলসি যা যেখানে পাস নিয়ে আয়।

মইও এনেছে, কিন্তু লাগানোর কায়দা হচ্ছে না। যেখানে যেভাবে সম্ভব জল-ঢালাঢালি করছে। পরিশ্রমে ও আগুনের তাপে ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে সকলের গা দিয়ে। কিন্তু হলে কি হবে ? আগুন লেগেছে সব ক'টা ঘরে এক সঙ্গে—সামলাবে কোন্ দিকে ? জলেরও অসুবিধা। যেতে হচ্ছে সেই সাহেবদীঘির গর্ভে এক হাঁটু পাঁক ভেঙে। নদী থেকেও আনছে, কিন্তু নদী আরও দূর।

অমূল্য আর্তনাদ করে ওঠে, তাঁতঘরের চাল ভেঙে পড়ল রে !

নির্মল আশ্চর্য শান্ত বিষম সর্বনাশের মধ্যে। বলে, ভেঙে পড়বেই—এ তো জানা কথা। মালপত্র আর যদি কিছু বাঁচাতে পার, তাই দেখ।

ছুটল অনেকে। কিছু কিছু জিনিষ বেরুল। মড়-মড় করে আড়া ভেঙে সমস্ত ঘরটাই পড়ে গেল মাটিতে।

হঠাৎ ওদিকে আগুনের মধ্যে থেকে প্রসন্নর চিৎকার এল, অমূল্য রে! পণ্ডিত মশায়। বেরুতে পরেন নি। কারো খেয়াল হয় নি—কি সর্বনাশ!

কেউ কিছু বলবার আগেই অমূল্য পাগলের মতো ছুটে অগ্নিবেষ্টনীতে ঢুকে পড়ল। বেরিয়ে এল অনতিপরে প্রসন্নকে কাঁধে নিয়ে। প্রসন্ন পুড়েছেন, কিন্তু অবস্থা অমূল্যর মতো ভয়াবহ নয়। প্রসন্নকে নামিয়ে দিয়েই সে মাটিতে পড়ে গেল। কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করছে।

মা, মা, ওমা, মাগো!

কলসি ফেলে শঙ্করীবালা কাছে চলে এলেন।

ছেলে যে যায়! হাত-পা কোলে করে বসে থেকো না—নারকেল-তেল মাখিয়ে দাও, জ্বলুনি কমবে।...আনো, দাও আমার কাছে। এইটুকু তেলে কি হবে গো—আর নেই?

পূবদিক ফরসা হয়েছে। ইন্দ্রাণীরা এলেন। অমূল্যর চেহারা দেখে ইন্দ্রাণী কেঁদে ফেললেন।

আহা-হা! অমূল্য রে—

শঙ্করীবালা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, যাও—যাও। মায়া দেখাতে হবে না। ডাকাত! আমি জানি নে ভেবেছ? কীর্তিকলাপ সমস্ত জানি—

হাতে নারকেল-তেলের বোতল ছিল, উঁচিয়ে ধরলেন। সে ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ইন্দ্রাণী পিছিয়ে গেলেন দু-পা।

অশ্রান্ত বেগে গালিগালাজ চলেছে।

আমার বাড়ি টিন-ভরতি কেরাসিন। তখন বুঝতে পারি নি। কেমন করে বুঝব? সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি—কোন কালে কেউ শুনেছে হেন কাণ্ড? এ যদি মরে যায়, সবসুদ্ধ ফাঁসি দেওয়াব। ফাঁসি দেওয়াব, ফাঁসি দেওয়াব, ফাঁসি দেওয়াব—এই তিন সত্যি করলাম। সোয়ামি হলে কি হয়—তাকেও ছাড়ব না, নিজে সাক্ষি দেবো আমি। ছুঁতে এসো না—খবরদার বলছি। আর মেনিমুখো নির্মলটা...বলি, এত যে বোমা ছোঁড়াছুড়ি করেছিলি—উঠোনে এখন খ্যাংরাগাছিও রাখিস নি? থাকলে বিষ ঝেড়ে দিতাম।

আশ্চর্য হয়ে সহসা দেখলেন, অর্ধ-অচেতন অমূল্য একখানা হাত তুলে ধরেছে ইন্দ্রাণীর দিকে। থরথর করে কাঁপছে হাতখানা। আর কোন বাধা মানলেন না ইন্দ্রাণী, কোন অপমান গায়ে মাখলেন না। ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিলেন তার মাথা। এত ছটফট করছিল, সব যেন জুড়িয়ে গেল এক মুহূর্তে! শান্ত হয়ে সে ইন্দ্রাণীর কোলের উপর চোখ বুজল।

শঙ্করীবালা অগ্নিদৃষ্টিতে ইন্দ্রাণীর দিকে তাকালেন। সে মুখে কি দেখলেন, কে জানে—সন্তানহীনা বন্ধ্যা রমণীর চোখের আগুন নিভে আসে ধীরে ধীরে। মুখ ফিরিয়ে তিনি বাড়ি ছুটলেন বেশি নারিকেল-তেল সংগ্রহের জন্য।

সোনাকুঠুরিতে বড় পালঙ্কের উপর অমূল্যকে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রাণী বাঁ-হাতের উপর থুতনি রেখে ম্লান দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তার দিকে। দগ্ধ বিকৃত ভয়ঙ্কর সে মুখ। প্রাণে যদিই বা বাঁচে, চোখের দৃষ্টি থাকবে না, অন্ধ হয়ে যাবে—এই কথা বলছে সকলে। মহকুমা-শহর থেকে ডাক্তার আনা হয়েছে, তিনিও ভরসা দিচ্ছেন না বিশেষ কিছু। একা শঙ্করীবালা কেবল প্রতিবাদ করে বেড়াচ্ছেন।

রেখে দাও মুখপোড়াদের কথা। নিজেদের যা মনোগত ইচ্ছে, তাই ওরা বলছে। ছোঁড়াটা একটু মাথা গুঁজে সোয়াস্তিতে ছিল—খাচ্ছিল, পরছিল—কেউ তো ভাল চোখে দেখত না এসব! আবার ভাল হবে দেখো—আমি বলছি—যেমন ছিল তেমনি হবে। এমন কত হয়েছে! এই বুড়ো বয়স অবধি নিজের চোখে এমন কত দেখলাম! রুগির বিছানায় অমন মুখ শুকনো করে থাকতে নেই—অকল্যাণ হয়। উঠে নাওয়া-খাওয়া করোগে তুমি।

ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে চেয়ে বলছেন শঙ্করীবালা। তাঁকে প্রবোধ দিচ্ছেন। অমূল্যর সর্বাঙ্গে অতি যত্নে মলম লাগাচ্ছেন। নিজে যেচে এসেছেন রায়বাড়ি। সরস্বতী-পূজো উপলক্ষে এসে নিন্দে-মন্দ করে গিয়েছিলেন—আর এই। অমূল্যর বিছানার পাশে শঙ্করীবালা ও ইন্দ্রাণীর ভাব হয়ে গেছে।

ইন্দ্রাণী বললেন, একটুখানি জিরোও তুমি দিদি। আমায় কিছু করতে দাও। রাত্রি জাগবে, দিনেও একটুখানি বসবে না—মারা পড়বে যে এই ধকলে!

মহাপাপের প্রাচিত্তির হচ্ছে—নইলে যে নরকে ঠাসবে ওনারে নিয়ে। উঃ, নির্দোষ ভালমানুষ—ওদের এমনি হাল করছে—একটু যদি সন্দ করতাম আগে! টিনসুদ্ধ কেরাসিন ওনার মাথায় ঢেলে দিতাম।

অমূল্য জ্বরে হাসফাস করছে, তিনদিন আজ একভাবে আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে। খাওয়া-দাওয়া নেই—কাতরানিও শোনা যায় না বড়-একটা। সহসা সর্বদেহ আকুঞ্চিত হয়ে উঠল একবার—সে পাশ ফিরল। পিঠের উপর সেদিনকার বেতের দাগগুলো নীলবর্ণ হয়ে আছে। আগুনের ছাঁকা পিঠে তেমন লাগে নি। ইন্দ্রাণী সজল চোখে হাত বুলাতে লাগলেন—হাত দিয়ে ঢেকে রাখতে চান বুঝি দাগগুলো।

অমূল্য জড়িত কণ্ঠে বলে, মা, মাগো—

ইন্দ্রাণী উচ্ছ্বসিত হলেন।

জ্ঞান ফিরেছে, 'মা' বলছে। 'মা' বলে ডাকতে লজ্জা করছে না আজ আমার বাছার।

ডাক্তার বাইরে ছিলেন, খবর শুনে তাড়াতাড়ি চলে এলেন। ইন্দ্রাণী ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, ডাক্তারবাবু, যত টাকা লাগে—যেমনভাবে হোক—ছেলে বাঁচিয়ে দিন।

রোগি পরীক্ষা করে ডাক্তার গম্ভীরভাবে তাঁর মুখে তাকালেন। দৃষ্টির মধ্যে জবাব পাওয়া গেল।

ইন্দ্রাণী হাহাকার করে ওঠেন, ওরে অমূল্য, চোখ মেল্। তুই আমার মুকুল—পথের ধূলো থেকে আবার কোলে এসেছিস। আর আমি মারব না বাবা, আর কক্ষণো তাড়িয়ে দেবো না।

অমূল্য আবার কথা বলে ওঠে। ক্লান্ত স্বরে বলল, বড্ড ঘুম আসছে মা, আমি ঘুমোই—

*   *   *

নির্মল কাজটা কিছুতে নিল না। অতএব ডক্টর দত্তর মনোনয়ন অশোকই পাচ্ছে এবার নিঃসন্দেহ। তবু তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার দরকার—মাঝখানে আবার একজন কেউ ঢুকে না পড়ে।

হরিতোষ চিঠির পর চিঠি দিচ্ছেন—রীতিমত বিরক্ত হয়েছেন এতদিন তাঁতিহাটে পড়ে থাকবার জন্য।

ইন্দ্রাণীও তাড়া দিচ্ছেন; নানা হাঙ্গামায় দেরি হয়ে গেল বাবা—আর নয়, এক্ষুণি চলে যাওয়া উচিত।

নির্মল অমলাকে বলে, গামছা তুটো ফেরত দিয়ে যাবেন কিন্তু যাবার আগে।

আমার জিনিষ। দাম দিয়ে কেনা।

নির্মল বলে, কাজে লাগবে না তো! লোকে দেখে হাসবে।

অমলা গভীর কণ্ঠে বলে, লোকে অবাক হয়ে দেখবে—আপনি হেন মানুষও নিজের হাতে তাঁত বোনেন! এ তো জাঁক করে দেখাবার জিনিষ।

কেমন বুনেছি—সেটাও দেখবে নিশ্চয়।

দোষ বুননের নয়—সূতোর। কোথাও সরু, কোথাও মোটা—পাক হয় নি পুরোপুরি—ছিঁড়বেই তো অমন সূতো! আমার কাটা সূতোয় বুনে দেখবেন—এক খেইও ছিঁড়বে না।

পাচ্ছি কোথা আপনার সূতো? ক'দিন বাদেই তো কলকাতা গিয়ে উঠছেন।

আশ্চর্য কথা বলল অমলা।

না—আমরা যাচ্ছি নে তো!

তাই বটে! দেখা গেল, যে-সমস্ত গাঁটরি বাঁধা হয়েছিল—দরকার পড়লেই ইন্দ্রাণীর নির্দেশক্রমে খোলা হচ্ছে তার একটা-তুটো।

কুঠির জঙ্গল কাটতে লোক লেগে গেছে আবার। নূতন করে ঘর তোলবার তোড়জোড় হচ্ছে। নবকিশোরের শেষের দিনগুলোর কথা ইন্দ্রাণীর বড় মনে পড়ে। তাঁতিহাট ছেড়ে গিয়ে ভাল করেন নি—হঠাৎ কি লোভে পেয়ে বসল, টাকার

পিছনে নিরর্থক ছুটে বেড়ালেন, কিছু করতে পারলেন না— এমনি ধরনের কথা বলতেন প্রায়ই। মানুষের বাস্তবিক প্রয়োজন কতটুকু, খুব বেশি অর্থশালী হয়ে সার্থকতাই বা কি? পৃথিবীতে মানুষের জায়গা আছে, কিন্তু মানুষের এত লোভের জায়গা কোথায়? ইন্দ্রাণী কানেই শুনে যেতেন, কিন্তু তাঁর মন স্পর্শ করত না। শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়লেই জল-জঙ্গলের দেশ, সাপ-বাঘ ও ম্যালেরিয়ার আস্তান —এমনি ধরনের একটা অনিশ্চিত আতঙ্ক দীর্ঘদিনের অপরিচয়ে মন জুড়ে বসেছিল। এখানে এসে পড়ে এই ক-মাসে আবার সমস্ত আবার নূতন করে চিনলেন।

অশোক সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা যাচ্ছেন না কাকিমা?

ইন্দ্রাণী বলেন, এক সঙ্গে যাওয়া হবে, তাই তো ঠিক ছিল। কিন্তু কত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল! ক'টা ঘর তুলে ইস্কুলের কতকটা বন্দোবস্ত না করে যাই কেমন করে?

আপনার যাওয়াও কিন্তু বড্ড জরুরি। এমন সুযোগটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ইন্দ্রাণী বিমর্ষ মুখে সমর্থন করলেন অশোকের কথা।

হতে পারে কেন—হবেই। ভণ্ডুল করে দেবার কত মানুষ রয়েছে! সে কথাও চিঠিতে চিঠিতে অনবরত লিখছেন তো তোমার বাবা।

একটু থেমে আবার বলেন, লজ্জার আমার পার নেই। কত কষ্ট করে বর্ধনকে জুটিয়ে নিয়ে এলেন—এ সুযোগ হেলায় হারাচ্ছি। যাকে বলে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা—তাই করছি আমি। কিন্তু এই যে কাণ্ড হয়ে গেল, উপায় কি বলো এখন? চাটুজ্জে-গিন্নি বলেছিলেন, স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন তিনি। আমার পাপ তা হলে কত বড় ভেবে দেখ। প্রায়শ্চিত্ত তার তেমনি হবে তো!

নিশ্বাস ফেলে অশোক বলে, সবাই থেকে যাচ্ছেন—একা-একা আমায় যেতে হবে—

ইন্দ্রাণী বললেন, একলা কেন—হাসি যাচ্ছে তোমার সঙ্গে। ও থাকবে না, থেকে জুত হবে না এখানে।

এই লেখকের—

জল-জঙ্গল 'একখানি উপন্যাস। দুর্গম বাদা অঞ্চলের বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অপূর্ব জীবন-যাপন পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া উপন্যাসের গল্পাংশ গড়িয়া উঠিয়াছে এবং বাদাবনের অধিবাসি-সুলভ প্রেম ও প্রতিহিংসা, দয়া ও দৌরাত্ম্য, উপকার ও উপদ্রব-প্রবণ বিপরীতমুখী ঘটনাসমূহের ঘাতপ্রতিঘাতে কাহিনী এমন জমিয়া উঠিয়াছে যে, বিস্ময় ও ব্যাকুলতার আবেগে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শেষ অবধি পড়িয়া যাইতে হয়, সমাপ্তিতে পৌঁছাইবার পূর্বে মধ্যপথে কোথাও থামিয়া দাঁড়াইবার ছেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সভ্য জগৎ হইতে দূরে অবস্থিত এই জলময় ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে বিচিত্র লীলা দিবারাত্র অভিনীত হইতেছে, ছন্নছাড়া যে অপূর্ব জীবন-চাঞ্চল্য স্পন্দিত হইতেছে, তাহার আলোড়ন আমাদের গৃহ-পালিত পোষ-মানা নগর-জীবনের গাত্রে আসিয়া আহত হয় এবং মুহূর্তে সচেতন করিয়া তোলে বিচিত্র পটভূমিকায় হিল্লোলিত এমন এক উদ্দাম জীবন-প্রবাহ সম্বন্ধে—যাহার পরিচয় লেখকের নখদর্পণে, যাহার প্রতিচ্ছবি গ্রন্থটির পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে। স্কটল্যাণ্ডের জলাভূমি-অঞ্চলের বিচিত্র জীবনকাহিনী অবলম্বনে লিখিত যে কোন প্রথম শ্রেণীর বিলাতী নভেলের ইহা সমপর্যায়ে স্থাপিত হইবার যোগ্য। অচেনা ও অজানা রহস্য-রাজ্যের প্রথম পথপ্রদর্শকরূপে আলোচ্য উপন্যাসখানি পাঠকসমাজে সমাদৃত ও সম্বর্ধিত হইবে'—আনন্দবাজার। চার টাকা।

সৈনিক ৬ষ্ঠ সং। 'বলিষ্ঠ আশাবাদ, নবযুগের দৃষ্টিভঙ্গি, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ 'সৈনিক' উপন্যাসখানিকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে অনন্যমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে'—যুগান্তর। 'এই বইখানি একাধারে ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন'—দেশ। সাড়ে তিন টাকা।

বাঁশের কেল্লা ২য় সং। 'জাতীয় প্রতিরোধ-আন্দোলনের গৌরবময় পটভূমিকায় আলোচ্য উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। খ্যাতিমান সাহিত্যিকের মধুক্ষরা লেখনীর মুখে নীলবিদ্রোহ, সশস্ত্র অভিযান, লবণ-সত্যাগ্রহ ও আগষ্ট বিপ্লবের অশ্রুসিক্ত অধ্যায়গুলি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।...মর্মচেরা আত্মদানের বিস্মৃত-প্রায় বিচিত্র কাহিনী, সংগ্রাম ও সংগঠনের ভুলে-যাওয়া ইতিহাস চলচ্চিত্রের মতোই একে একে

ছায়া ফেলিয়া যায় মনে। ইতিহাসের সেই ঝরাপাতা কুড়াইয়া সাহিত্যের রসে ভিজাইয়া লেখক জাতির জীবন-প্রবাহকে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন'—যুগান্তর। 'The novel unfolds the epic-story of India's struggle for freedom which during the hundred and filty years of British rule shook out of their peaceful slumber the quiet little villages all over the country··· What Monoj Babu has given us, is a work of fiction—the literary excellence of which is of a high order. But when history fails, fiction has to step in to bridge the gulf. Episodes which are apparently unconnected have been welded into an integrated whole with masterly skill and the resultant gripping narrative is a brilliant first-rate novel. The author of BHULI NAI to use a clinches has added one more feather to his cap'—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড। দুই টাকা বার আনা।

ভুলি নাই ২২শ সং। আধুনিক কালের সর্বাধিক বিক্রীত উপন্যাস। এই বইয়ের চিত্ররূপও অসামান্য সাফল্যলাভ করেছে। দুই টাকা।

ওগো বধূ সুন্দরী ২য় সং। স্নিগ্ধ-মধুর প্রেমের উপন্যাস। আগাগোড়া দুই রঙে ছাপা। বিচিত্র প্রচ্ছদপট। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিসম্মত বই। দুই টাকা বারো আনা।

আগষ্ট, ১৯৪২ ৩য় সং। আগষ্ট বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত বাংলা-সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় সুবৃহৎ উপন্যাস। 'If the call given by the Congress in Bombay in August 1942 had electrified the nation, the movement or the people's rebellion in which the reaction took shape had fired the imagination of the artists. This is one of those things of beauty which inspired imagination and has since created for the entertainment and upliftment of men. Monoj Babu has caught the spirit of the August rebellion and has also added to it something of his own. In this volume he has told a few of the human stories which the flame, smoke and blood had enngulfed at the time and which he has knit together in an integrated whole'—হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড। চারি টাকা।

শত্রুপক্ষের মেয়ে ২য় সং। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবেশ। খরস্রোত বসতিবিরল চরের উপর দুর্ধর্ষ মানুষের জীবন-চিত্র। 'Sj. Monoj Bose has a striking manner of reproducing atmosphere—of bringing to the readers' mind the vast alluvial streches, the mighty rivers in spate, fearless spirits in the passion for fight and the

ways of human heart that beat the same through different ages and times—অমৃতবাজার। সাড়ে তিন টাকা।

যুগান্তর ২য় সং। 'শত্রুপক্ষের মেয়ে' উপন্যাসের কিশোর-সংস্করণ। রসসমৃদ্ধ অপরূপ পরিবেশ। ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলে দেবার সর্বাংশে উপযোগী। দুই টাকা।

মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প ২য় সং। বাছাই-করা গল্পের সংকলন। একখানি বইয়ের ভিতর দিয়েই মনোজ বসুর সৃষ্টির সমগ্র রূপটি প্রস্ফুটনের চেষ্টা হয়েছে। লেখকের জীবনকথা, ছবি এবং অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের রসসমৃদ্ধ ভূমিকা বইটিকে অনন্যসাধারণ মর্যাদা দিয়েছে। পাঁচ টাকা।

খদ্যোত ২য় সং। 'ছোট গল্প বলিতে যাহা বোঝায়, এগুলি ঠিক তাহাই। ছোট এবং গল্প দুইই। প্লটের চমৎকার বিস্ময়। রস চরম ঘনীভূত। দীপ্তি হীরকের, খদ্যোতের মিটিমিটি নহে। ছোট গল্পের ক্ষেত্রে এত ছোট করিয়া গল্প জমাইবার এই বিস্ময়কর কুশলতার প্রতিদ্বন্দ্বী-সংখ্যা বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ। গল্পলেখক মনোজ বসুকে বুঝিতে হইলে এ বইখানি অবশ্যপাঠ্য'—যুগান্তর। দুই টাকা।

দুঃখ-নিশার শেষে ৩য় সং। 'বর্তমান গল্পসংগ্রহে মনোজ বসুর আধুনিক দৃষ্টির চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হইল'—শনিবারের চিঠি। 'Will be gratefully remembered as herbinger of a new intellectual order'—অমৃতবাজার। দুই টাকা।

উলু ২য় সং। 'যে কয়েকটি গল্প আছে তাহার অধিকাংশই মর্মান্তিকরূপে ট্র্যাজিক। মানুষের জীবনের বৃহত্তর ট্র্যাজেডি যাহা সদরে ঘটিয়া থাকে তাহা আমাদের মনে বেদনা জাগায়, কিন্তু ছোটখাটো ট্র্যাজেডি যাহা একটি অখ্যাত মানুষকে বা তাহার পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটে তাহার রূপ আমাদিগকে অভিভূত করে। উলু এই রকম অভিভূত-করা ট্র্যাজেডি গল্প। মনোজবাবুর গল্পের সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহাদের কাছে বইখানি অবশ্যই অভ্যর্থনা পাইবে'—যুগান্তর। দুই টাকা চারি আনা।

একদা নিশীথকালে শোভন সচিত্র ৪র্থ সংস্করণ। উপহারের শ্রেষ্ঠ রুচিবান বই। 'হালকা লেখাতেও মনোজ বসুর ক্ষমতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইবেন'—শনিবারের চিঠি। দুই টাকা।

কাচের আকাশ 'গল্প বলায় মনোজবাবুর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলোচ্য পুস্তকের সব গল্পগুলিতে পরিস্ফুট। পড়তে পড়তে মনে হয় কে যেন সামনে বসে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, বড় মিষ্টি। ওস্তাদ বাজিয়ে অনেকে হতে পারেন, কিন্তু 'হাত মিষ্টি' সবার ভাগ্যে হয় না। লিখতে অনেকে পারেন, কিন্তু মনোজবাবুর মত এমন সহজে মনকে ছোঁবার ক্ষমতা বোধ হয় কম লেখকের আছে'—দেশ। দুই টাকা।

দেবী কিশোরী ২য় সং বেরিয়েছে। নানা গোলযোগে এই বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ দশ বৎসরাধিক কাল ছাপা সম্ভব হয় নি। দুই টাকা।

নরবাঁধ ৪র্থ সং। 'একালের আরেকজন শক্তিমান কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত মনোজ বসু—তাঁহার 'মাথুর' নামক বড় গল্পটিতে এই বাল্য-প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন বাস্তব অনুযায়ী, তেমনই কাব্য-রসে সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক ট্রাজেডী এখানে বাস্তব জীবনেই সেই বৈষ্ণব ভাব-সম্মেলনের অপরূপ কমেডিতে পরিণত হইয়াছে। সে যেমন মধুর, তেমনই নির্ম্মল। কোন ভয় নাই, অকল্যাণের অভিশাপ নাই।...বস্তুত বাংলা সাহিত্যে ইহার জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিয়া রাখিতে চাই যে এ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন কেবল ঐ দুইটির জন্য (আরেকটির নাম 'নরবাঁধ') বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের চত্বরে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আসন অতি অল্প কয়েকজনই দাবী করিতে—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, বঙ্গদর্শন। দুই টাকা।

পৃথিবী কাদের ? ৩য় সং। নবযুগের বলিষ্ঠতম গল্প। 'It is departure in the fiction literature of the Province'—অমৃতবাজার। দেড় টাকা।

বনমর্ম্মর ৪র্থ সং। 'যে retrospect, চিন্তার গভীরতা এবং মনের বেদনা-বোধ থাকিলে লেখা লেখা চিরন্তানের পর্য্যায়ে গিয়া পৌঁছায়, তাহা মনোজ বসুর আছে'—পরিচয়। 'পাড়াগাঁয়ের নদী-মাঠ-বনের ছবি প্রবাসী বাঙালীকে homesick করে তুলবে'—প্রবাসী। 'সরল অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর জীবনের অতি-সাধারণ জীবন-যাত্রার অতি তুচ্ছ ঘটনাবলী ও অতি সামান্য অনুভূতিগুলি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে'—বিচিত্রা। আড়াই টাকা।